Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নবীজীর সীরাত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রোকসানা বেগম

রোলঃ 21500856227

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নবীজীর সীরাত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রোকসানা বেগম

রোলঃ 21500856227

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " নবীজীর সীরাত " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে রোকসানা বেগম, আইডিঃ 21500856227 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " নবীজীর সীরাত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Roksana Begum

(স্বাক্ষর)

রোকসানা বেগম

আইডিঃ 21500856227

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা 1

সীরাহ: সংজ্ঞাও প্রয়োজনীয়তা 5

প্রাক ইসলামিক আরব 11

ইবরাহীম (আঃ) এর কাহিনী 11

যমযম কূপের উদ্ভব 11

মক্কায় জনবসতি স্থাপন 13

মক্কার সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস 14

কুরাইশ বংশের উৎপত্তি 14

আব্দুল মুত্তালিব এর নেতৃত্ব লাভ 15

আরবের তৎকালীন ধর্মীয় পটভূমি 18

আরবে শির্কের উদ্ভব 18

ইহুদী মতবাদের প্রচলন 20

খ্রিস্টধর্মের আগমন 21

আসহাবুল উখদুদের গল্প 21

আবরাহার বাহিনী ও 'হাতির বছর' 25

রাসুল (সাঃ)-এর জন্ম ও প্রাক-নবুওয়তি জীবনের চল্লিশ বছর 27

পৃথিবীতে রাসুল (সাঃ) এর আগমন 27

বিবি হালিমার তত্ত্বাবধানে শিশু মুহাম্মাদ (সাঃ)-র লালন পালন 27

মা আমিনার ইন্তেকাল ও দাদা আব্দুল মুত্তালিবের অভিভাবকত্ব 29

চাচা আবু তালিবের তত্ত্বাবধানে বালক মুহাম্মাদ (সাঃ) 30

বাল্যকাল ও যৌবনকালের কিছু ঘটনা 30

হিলফুল ফুজুল গঠন 31

খাদিজা (রাঃ)-র সাথে বিয়ে 32

উম্মুল মুমিনীনগণ 33

কাবাঘর পুনঃনির্মাণ এবং বিবাদের মীমাংসা 36

নবুয়ত লাভ 38

ইসলামের প্রচার কাজ 40

গোপন দাওয়াত 40

প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার 41

মুসলিমদের প্রতি কাফের-মুশফিকদের অন্যায় অত্যাচার 43

নবীজিকে হত্যার ষড়যন্ত্র 46

নামাজ পড়তে বাধা দেওয়ার দুঃসাহস 46

আবিসিনিয়ায় হিজরত 47

শিয়াবে আবু তালিবের অন্তরিণ অবস্থা 50

শোক- তাপ দুঃখ- বেদনার বছর 51

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তায়েফ গমন 52

ইসরা ও মিরাজ এর ঘটন 54

ইসরা ও মিরাজ এর সময়কাল 54

ইসরার ঘটনা 55

মদীনায় ইসলাম বিস্তারের সূচনা 56

আকাবার 57

মুসলমানদের মদীনায় হিজরত করার অনুমতি 59

মদীনায় হিজরতকারী মুসলমানদের বিবরন 59

রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর মাদানী জীবন 60

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হিজরাত 60

মদীনায় উপস্থিতি 65

মদীনাতে ভাষন দান এবং চুক্তি সম্পাদন 69

আযানের সূচনা 74

হিজরতের তারিখ	75
সারিয়া ও গাজওয়া	76
মুজাহিদ বাহিনী গঠন	76
জিহাদ ফরজ হওয়ার ধাপসমূহ	76
গাজওয়া এবং সারিয়ার পার্থক্য	77
গাজওয়াতুল বুওয়াত	77
গাজওয়াতুল উশাইরা	78
গাজওয়ায়ে সাফওয়ান	78
সারিয়া সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস	78
সারিয়ায়ে নাখলা বা সারিয়ায়ে আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ	78
কেবলা পরিবর্তন	79
বদর যুদ্ধ	79
ইহুদিদের বেয়াদবি রাসুল (সাঃ)- এর সাথে	85
আলী (রাঃ) ও ফাতিমা (রাঃ)-এর বিয়ে	85
গাযওয়া বনু কাইনুকা বা কাইনুকা অভিযান	86
গাজওয়ায় কুদর	86
গাজওয়ায়ে সাওয়ীক	86
গাফতান যুদ্ধ	86
হাফসা (রাঃ) ও যায়নাব (রাঃ)-এর সঙ্গে বিবাহ	87
সারিয়াতু যায়েদ ইবনে হারিসা	87
উহুদ যুদ্ধ	87
গাজওয়ায়ে হামরাউল আসাদ	91
আর রাজীর মর্মান্তিক ঘটনা	92
বীরে মাউনার ঘটনা	93
যায়নাব বিনতে হুজাইমা ও উম্মু সালামার সাথে বিবাহ	93
বদর দ্বিতীয় যুদ্ধ	93

খন্দকযুদ্ধ বা গাজওয়ায়ে আহযাব 94
বনু আল মুস্তালিক এর যুদ্ধ 95
রাসুল (সা)- এর সাথে জুয়াইরিয়ার বিয়ে 95
খালিদ বিন ওয়ালিদের ইসলাম গ্রহণ 96
বিভিন্ন রাষ্ট্রের দাওয়াতি পত্র 96
খাইবারের যুদ্ধ 97
সাফিয়া (রাঃ)-এর সাথে বিয়ে 97
বাইয়াতুর রিদওয়ান 97
শান্তিচুক্তি বা হুদায়বিয়ার সন্ধি 98
জিরানা থেকে রাসুল (সাঃ)-র উমরা পালন 102
মায়মুনা বিনতে হারিস (রাঃ)-র সাথে বিবাহ বন্ধন 103
মুতাহ যুদ্ধ ও মুতাহ যুদ্ধের কারণ 103
মক্কা বিজয় 104
হুনাইনের যুদ্ধ 107
তাবুক যুদ্ধ 107
মসজিদে যিরারে অগ্নিসংযোগ 108
বিদায় হজ্জ 109
রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর রোগ সংক্রান্ত অবশিষ্ট বিবরণ 111
রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-র কাফন দাফন 114
তথ্যসূত্র 118

ভূমিকা

لَهُم الطَّيِّبَات وَيُحَرِّم عَلَيْهِم الْخَبَائِث وَيَضَع عَنْهُم إِصْرَهُم وَالْأَغْلَال الَّتِي كَانَت
عَلَيْهِم فَالَّذِين آمَنُوا بِه وَعَزَّرُوه وَنَصَرُوه وَاتَّبَعُوا النُّور الَّذِي أُنزِل مَعَه أُولَٰئِك هُم
الْمُفْلِحُون ○ قُل يَا أَيُّهَا النَّاس إِنِّي رَسُول اللَّه إِلَيْكُم جَمِيعًا الَّذِي لَه مُلْك السَّمَاوَات
وَالْأَرْض لَا إِلَٰه إِلَّا هُو يُحْيِي وَيُمِيت فَآمِنُوا بِاللَّه وَرَسُولِه النَّبِي الْأُمِّي الَّذِي يُؤْمِن
بِاللَّه وَكَلِمَاتِه وَاتَّبِعُوه لَعَلَّكُم تَهْتَدُون ○ (سورة الأعراف ١٥٧ ، ١٥٩ :

“সেসমস্ত লোক, যারা আনুগত্য অবলম্বন করে এ রসূলের, যিনি উম্মী নবী, যাঁর সম্পর্কে তারা নিজেদের কাছে রক্ষিত তওরাত ও ইঞ্জিলে লেখা দেখতে পায়, তিনি তাদেরকে নির্দেশ দেন সৎকর্মের, বারণ করেন অসৎকর্ম থেকে; তাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু হালাল ঘোষনা করেন ও নিষিদ্ধ করেন হারাম বস্তুসমূহ এবং তাদের উপর থেকে সে বোঝা নামিয়ে দেন এবং বন্দীত্ব অপসারণ করেন যা তাদের উপর বিদ্যমান ছিল। সুতরাং যেসব লোক তাঁর উপর ঈমান এনেছে, তাঁর সাহচর্য অবলম্বন করেছে, তাঁকে সাহায্য করেছে এবং সে নূরের অনুসরণ করেছে যা তাঁর সাথে অবতীর্ণ করা হয়েছে, শুধুমাত্র তারাই নিজেদের উদ্দেশ্য সফলতা অর্জন করতে পেরেছে। বলে দাও, হে মানব মন্ডলী। তোমাদের সবার প্রতি আমি আল্লাহ প্রেরিত রসূল, সমগ্র আসমান ও যমীনে তাঁর রাজত্ব। একমাত্র তাঁকে ছাড়া আর কারো উপাসনা নয়। তিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন। সুতরাং তোমরা সবাই বিশ্বাস স্থাপন করো আল্লাহর উপর, তাঁর প্রেরিত উম্মী নবীর উপর, যিনি বিশ্বাস রাখেন আল্লাহর এবং তাঁর সমস্ত কালামের উপর। তাঁর অনুসরণ কর যাতে সরল পথপ্রাপ্ত হতে পার।” [সুরা আল আ’রাফ: ১৫৭-১৫৮]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে সূচিত হয় মানব ইতিহাসের একটি সম্পূর্ণ নতুন ও অভিনব অধ্যায়। যার আরেকটি নজির মানবতা কখনোই দেখেনি। এ যুগটি সুচিত হয় তেপান্তর ও শুষ্ক পাহাড় ঘেরা আরবের একটি ছোট্ট নগরী মক্কায়। আল্লাহর ইবাদত করার জন্য মক্কা নগরীতে একটি ঘর নির্মাণ করা হয়েছে। সে ঘরটি জুড়ে এমন অসংখ্য প্রতিমা ভাস্কর্য ছবি যত্র-তত্র পড়ে আছে। আরববাসীরা আল্লাহর পাশাপাশি এগুলোরও পূজা করত। তাদের কাছে পথনির্দেশনার জন্য কোন আসমানী গ্রন্থ ছিল না। ছোট কি বড়, শাসক কি শাসিত - প্রত্যেকেই মনে করত, জীবনে সুখ-শান্তি পেতে হলে কাড়ি-কাড়ি ধন দৌলত কামাই করতে হবে। জুয়া, মদ, যৌনসম্ভোগ আর এগুলো বগলদাবা করার জন্য অন্যকে শোষণ, অন্যায়-আচরণ, প্রতারণা, মিথ্যা ও দুর্বল অসহায়দের উপর অত্যাচার বইয়ে দেয়া ছিল সে সময়কার নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। তারা নৈতিকতার ক্ষেত্রে এতটাই অধঃপতিত ছিল যে স্রেফ বংশগৌরব ও খাদ্যসংকটের অগ্রিম আশঙ্কায় তারা মেয়ে শিশুদের জীবন্ত সমাহিত করত। পুরো আরব উপদ্বীপের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত এমন গোত্রগুলো বসবাস করত, যারা সর্বক্ষণ পরস্পর লড়াই-যুদ্ধ, কলহ-বিবাদ করে বেড়াত। কারো জীবন, সম্পদ ও ইজ্জতের নিরাপত্তা ছিল না। সেখানে কোন প্রশাসন ছিল না, কোন রাজ্য ছিল না, কোন প্রতিষ্ঠান ছিল না। ফরিয়াদ, হাহাকার জানানো যাবে বা একটুখানি সহমর্মিতা পাওয়া যাবে, এমন কোন আশ্রয়স্থলও ছিল না।

মক্কা নগরীতে অল্প কজন মানুষ ছিলেন, যারা জন্মগত সৎ মানসিকতার কারণে সাধারণ লোকদের মতো পাপ-পঙ্কিলতার স্রোতে নিজেদের ভাসিয়ে দেননি। তারা ভালো মন্দের ব্যবধান জানতেন। এদের মধ্যে একজন ছিলেন আশেপাশের পুরো সমাজ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি ছিলেন অরাজকতা, অত্যাচার, প্রবৃত্তির দাসত্ব, ধোকা, প্রতারণা ও মিথ্যার এই সমুদ্রসমান পঙ্কিলতার মাঝে আত্মনিয়ন্ত্রণ, নিঃস্বার্থমনা, ন্যয়-নিষ্ঠা, দয়া, সততা, বিশ্বস্ততা, সচ্চরিত্রের এক জীবন্ত উদাহরণ। তাঁর আচরণ, অভ্যাস, বৈশিষ্ট্য, কথা ও কর্মকাণ্ড দেখে পুরো সমাজ মুগ্ধ চোখে শ্রদ্ধা করত হৃদয় থেকে। সবার ভালোবাসা ও সস্নেহ আন্তরিকতার নদী গুলো কেমন যেন তাঁর দুয়ারে এসে আসন গেড়ে থেমে যেত। তিনি কখনোই মানুষের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা কে পুঁজি করে নিজের জন্য কোন ধরনের আর্থিক মুনাফা লুটার খায়েশ করেননি। এগুলোকে উপজীব্য করে তিনি কোন শীর্ষস্থানীয় পদ-পদবীও বাগিয়ে নেননি। তাঁর ব্যক্তিত্ব, তাঁর সম্পদ ও তাঁর পবিত্র আচরণ সবসময় অন্যদের কল্যাণে আত্মনিবেদিত ছিল। সেই মহান ব্যক্তি, যুগের সেই বিরল সন্তানের নাম মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব - রাসূলুল্লাহ (সাঃ)।

হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) র জীবনের প্রথম চল্লিশটি বছর এমন ভাবে কেটেছে যে সবাই তাঁকে সম্মান ও শ্রদ্ধার চোখেই দেখতো। এভাবে তিনি নাগরিক জীবন অতিবাহিত করেন। এরপরই তাঁর জীবনে উঁকি দেয় সম্পূর্ণ নতুন এক অভিজ্ঞতা যার কল্পনা তিনি ইতিপূর্বের জীবনে কখনোই করেননি। জীবনের সেই পরিবর্তনটি তখনই ঘটে যখন সাইয়্যেদুনা জিবরিল (আঃ) তাঁর কাছে আসমানী প্রত্যাদেশ ওহী নিয়ে আগমন করে। যারা আগমনের মাধ্যমে তিনি নবুয়াত লাভ করেন।

নবুওয়াত লাভের পর তিনি নিজের আত্মীয়-স্বজন, শহরের প্রতিবেশী থেকে শুরু করে সবাইকে আহ্বান জানা - আসুন আমরা আমাদের চিন্তাধারা, বিশ্বাস, আচরণ, উপাসনা, অভ্যাস, বৈশিষ্ট্য, ওঠা-বসা, ভোজন-পান, জীবনযাপন, লেনদেন, আদান-প্রদান, আত্মীয়তা, বিনিময় প্রদান মোটকথা সমগ্র জীবনকে নতুন করে সাজিয়ে তুলি। যে মহান স্রষ্টা আমাদের সৃষ্টি করেছেন, তাঁর নির্দেশিত পথের উপর আমরা আমাদের পূর্ণ জীবন গড়ে তুলি। তাঁর এই বার্তা ছিল গোটা মানব সম্প্রদায়ের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ বিপ্লবের আহ্বান।

এত বড় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সম্পন্ন করতে হবে, অথচ এই মহান আহ্বানকারীর কাছে আল্লাহর সত্য পয়গাম ও নিজের ব্যক্তিত্বের অনুপম চরিত্রমাধুরী ছাড়া অন্য কোন পাথেয় বা সম্বল ছিল না। কোন অথরিটি নেই, সহায়তাকারী নেই, ক্ষমতা নেই, সৈন্য-সামন্ত নেই। এমনকি নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনগুলো পূরণ করার স্বপ্ন দেখাবে, এমন জনাকীর্ণ জনবলও সঙ্গে ছিল না। সঙ্গে ছিল কয়েকজন দুর্বল মানুষ, যারা তাঁর বার্তাগুলো সত্য মনে করে গ্রহণ করেছিলেন এবং সত্যপ্রচারের মেহনতে সঙ্গ দিতে রাজি হয়েছিলেন।

মক্কা নগরীতে সম্পদ, প্রাচুর্য, বাণিজ্যিক স্বার্থ ও প্রাচীন ধর্মীয় শ্রেষ্ঠত্বের উপর ভর করে একটি অদৃশ্য প্রশাসন গড়ে উঠেছিল। সেই প্রশাসনের সঙ্গে যাদের সম্পর্ক, তাদের ছোট-বড় কেউ কখনো কল্পনা করেনি যে, তাদের একটি নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে। নতুন আহ্বান তাদের কানে পড়তেই তারা বুঝে ফেলল, তাদের সিংহাসনের পায়া নড়বড় করছে। তারা তাদের প্রতিষ্ঠিত জীবনের জন্য আতঙ্ক হয়ে ওঠা এই আহ্বান যেকোন মূল্যে ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নিল। এতদিনের প্রচলিত বন্দোবস্ত টিকিয়ে রাখার স্বার্থে তারা যেকোন অন্যায়-অবিচার করতেও দ্বিধা

করত না। এই মহান আহ্বানকারী রাসুল (সা:) এক বছর-দুবছর নয়, তেরোটি বছর তাদের সেই অবিচার-অনাচার মুখ বুজে সহ্য করেছেন। এই দীর্ঘ সময় তিনি অতিবাহিত করেছেন একনিষ্ঠ সঙ্গীদের সন্ধান ও তাদের প্রশিক্ষণ এবং মাথা গোঁজার মতো একটি নিরাপদ ঠিকানা খুঁজে বের করার মহতী উদ্যোগ বাস্তবায়নের নিরবিচ্ছিন্ন সাধনায়।

কিছুদিন পর তিনি মদিনা নগরীতে একটি আশ্রয় খুঁজে পান। যদিও এ ঠিকানাটি তখনো পরিপূর্ণ নিরাপদ ছিল না। মদিনায় চলে আসার পরও তাঁকে পূর্ণ দশ বছর মক্কাবাসী, বরং পুরো আরববাসীদের সম্মিলিত বাহিনী থেকে নিজেদের আত্মরক্ষার কাজেই লিপ্ত থাকতে হয়েছে। এমন নয় যে, এ সময় তিনি নিজের ও সঙ্গীদের আত্মরক্ষার কাজেই নিমগ্ন ছিলেন; বরং এ দীর্ঘ সময়ে তিনি সেখানে একটি আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং সত্যের বার্তা গ্রহণকারীদের একটি সত্য বিশ্বাসের উপর গড়ে তুলেছেন। এতদিন যারা ছোট ছোট অজুহাতে একে অপরের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে নেমে পড়তো, তাদেরই তিনি একটি শক্তিশালী উম্মাহ হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হন। এসময় তিনি ব্যক্তি গড়েছেন, প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছেন, এমন একটি আদর্শ সমাজ গড়েছেন, যার প্রত্যেক সদস্য আল্লাহর সঙ্গে সুন্দর সম্পর্ক ধরে রাখে এবং মানুষ হয়ে অন্য মানুষের প্রতি এমন কল্যাণকামী সম্পর্ক লালন করে, যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নিঃশেষ হয় না। বরং প্রজন্মের পর প্রজন্ম হয়ে অগ্রসর হতে থাকে। সময়ের দীর্ঘ পরিক্রমায় সেই সমাজে যদি কখনো ভ্রুক্ষেপহীনতা, চৈন্তিক উদাসীনতা ও আমলগত বক্রতার কারণে সম্পর্কের অবনতি ঘটেও যায়; তবুও সেই সমাজের মাঝে এমন অন্তর্গত শক্তি ও যোগ্যতা রয়েছে, যা পুরো উম্মাহকে নতুন করে উদ্দীপ্ত হয়ে কর্মক্ষম করে তুলতে সক্ষম হবে।

এই মহৎ উদ্দেশ্য পূরণের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো নিয়ামক ভূমিকা পালন করেছে তা হল ১. চিরন্তন সত্য প্রকাশকারী একটি ব্যাপক অর্থবহ কিতাব। ২. মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর অবয়বে এমন এক ব্যক্তিত্ব, যিনি সেই কিতাবের প্রতিটি শব্দের উপর পুরোপুরি আমল করে একটি পরিপূর্ণ উদাহরণ পেশ করেন। ৩. এর বাইরে সরাসরি রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর হাতে দীক্ষাপ্রাপ্ত একটি সংক্ষিপ্ত জামাত ভূমিকা রেখেছে, যার অধিকাংশ সদস্য ছিলেন রাখাল, বাজারে বাজারে ঘুরে ঘুরে পণ্য বিক্রিকারী ছোট ব্যবসায়ী, কাঠুরে, ছোট-খাটো মালি, কৃষক, মজদুর, সবজিচাষী, গোলাম বা স্বাধীনতাপ্রাপ্ত গোলাম।

এই ছোট্ট জামাতটি যখন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)র কাছে দীক্ষা লাভ করেন, তখন তাদের একেকজন হয়ে ওঠেন সফল গভর্নর, তৎকালীন পৃথিবীর বিশাল বিশাল সাম্রাজ্যকে শোচনীয় ভাবে পরাস্তকারী সিপাহসালার, ন্যায়নিষ্ঠ বিচারক, নতুন কীর্তি স্থাপনকারী কূটনীতিবিদ, সার্বক্ষণিক কর্মচাঞ্চল্যে উদ্দীপ্ত কর্মসৈনিক, বাণিজ্যের ময়দানে বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দেওয়া সফল ব্যবসায়ী, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিস্ময়কর প্রতিভাবান স্কলার ও সাফল্যে বিস্ময়কর স্বাক্ষর স্থাপনকারী শিক্ষক। একটি সভ্য সমাজ করার পূর্ণ যোগ্যতা নিয়ে তাদের এই আবির্ভাব সত্যি বিস্ময়কর। নৈতিকতা বজায় রেখে প্রতিভা বিকাশের যেকোন ময়দানে সাফল্য লাভ করা যায়, এমন নজির তারা পৃথিবীকে দেখাতে সক্ষম হয়েছিলেন। আল্লাহর কিতাবের প্রতিটি বিধান তারা এমনভাবে পালন করে দেখিয়েছিলেন যে, কোথাও অস্পষ্টতা নেই, জটিলতা নেই, বিচ্যুতির অবকাশ নেই। কর্মের প্রতিটি পথ পূর্ণ স্পষ্ট, লক্ষ্য সুস্থির ও আলোকিত।

এই দশ বছরের চেষ্টা-সাধনার পরিণতিতে পুরো আরব উপদ্বীপের বাউন্ডুলে, সহিংস লড়াকু ও কলহপ্রবণ গোত্রগুলো খুব দ্রুত একের পর এক এসে নতুন ধর্মের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে।

ইসলামের সুবিশাল কীর্তি সামনে চলে আসায় তাদের পক্ষে আর নিজেদের পূর্ব বিশ্বাস ও জীবনপদ্ধতির ওপর অবিচল থাকার সুযোগ ছিল না। যার কারণে তারা তা ছেড়ে এক উম্মাহর স্রোতে নিজেদের সম্পৃক্ত করে।
তাদের এক উম্মাহ হয়ে আবির্ভূত হওয়ার পথ কখনোই মসৃন ছিল না। বারবার সীমাহীন কঠিন জটিলতা ও সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছে। কিন্তু নবী করীম (সাঃ) এর পূর্ণ আদর্শের শতভাগ অনুসরণকারী নেতৃবর্গের ইস্পাতকঠিন দৃঢ়তার ফলে এই উম্মাহ ইরতিদাদের মতো ভয়ঙ্কর অভ্যন্তরীণ ফিতনা পূর্ণ সাফল্যের সঙ্গে দমন করতে পেরেছে। বিশ বছরেরও কম মুদ্দতে এই উম্মাহ তৎকালীন পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী ও সুসংহত সাম্রাজ্যগুলোর উপর নিজ শ্রেষ্ঠত্বের মোহর এঁকে দিতে সক্ষম হয়। তাদের এই বিজয় ও শ্রেষ্ঠত্ব কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। শ্রেষ্ঠত্বের সেই সোনালী দিনগুলোতে এই উম্মাহ গোটা বিশ্ববাসীর জন্য কল্যাণকামনা, ন্যায়নিষ্ঠা ও সভ্যতার অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে সক্ষম হয়। তারা এ কথা প্রমাণিত করতে সমর্থ হয়েছিল যে, তাদের অধীনে রয়েছে গোটা মানবতার কল্যাণ ও সফলতার পূর্ণ নিশ্চয়তা। মক্কার তের বছরের জীবনে এই উম্মাহ যেভাবে জুলুম-অত্যাচার ও নিপীড়ন সহ্য করেছে, এরপর মাত্র দশ বছরের ভেতর পুরো আরবের অধিবাসীগণ যেভাবে এই উম্মার ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছে, এরপর পরবর্তী পনেরো বছরের সংক্ষিপ্ত সময়সীমায় যেভাবে এই উম্মাহর হাতে তৎকালীন পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি ক্ষমতাধর দুটি রাষ্ট্র পরাজিত হয়ে নিজ অস্তিত্ব খুইয়ে এই দ্বীনের স্রোতে নিজেদের উজাড় করে অন্তর্ভুক্ত করেছে, তা নিঃসন্দেহে পৃথিবীর ইতিহাসে বিস্ময়কর ঘটনা প্রবাহ। যে বিস্ময়ের কথা শুনলে এখনো মানব বুদ্ধি চমকে ওঠে। ঈমানী রেখার দু'ধারে যেই ভিন্ন দুটি সম্প্রদায়ের বাস অর্থাৎ মুসলিম ও অমুসলিম - উভয়েই আলোচিত বৈপ্লবিক পরিবর্তনের প্রতিটি মুহূর্ত পাখির চোখে গবেষণা ও অনুসন্ধান করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, মানবেতিহাসের সবচেয়ে বিস্ময়কর ও মুগ্ধকর এই পরিবর্তনের একটাই উপলক্ষ ও একটাই কারণ। আর তা হল মুহাম্মাদুর (সাঃ) র পবিত্র ব্যক্তিত্ব। যা কিছু করেছে তাঁর অবদানেই ঘটেছে। এ কারণেই দেখা যায় বাতিলের যত আক্রোশ, যত ক্ষোভ, যত বৈরিতা, তা শুধু সেই মহামানবের প্রতি। তাঁর ব্যক্তিত্ব, তাঁর কর্মকাণ্ড ও তাঁর সাধনাই ওদের সকল শত্রুতা ও বিদ্বেষের একমাত্র টার্গেট। এর বিপরীতে যারা সত্য-সুন্দর ও আলোর পক্ষে তাদের আবেগমথিত ভালোবাসা ও গভীর অনুরাগের পুরোটা জুড়ে আছেন হযরত মুহাম্মাদুর (সাঃ)। তাদের জীবনের যত সৌন্দর্য তা এই মহামানবের জীবন থেকেই আহরিত।
এ কথা সবাই নির্দ্বিধায় স্বীকার করে যে, পুরো মানবেতিহাসে রাসূল (সাঃ) একমাত্র ব্যক্তি, যার শুধু জীবদ্দশাতেই নয়; মৃত্যুর পরও, প্রতিটি দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর জীবনের প্রতিটি প্রান্ত পাখির চোখে অধ্যয়ন করা হয়েছে। তাঁর জীবনে যতগুলো ঘটনা ঘটেছে, তিনি যেসব কথা বলেছেন, তিনি যে কাজগুলো করেছেন, এমনকি অন্যদের যেসব কথা ও কাজের উপর তিনি সম্মতি বা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, তা পৃথিবীবাসী খুবই সুক্ষ্মদৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করেছে। বিভিন্ন লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সামনে রেখে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে সেগুলোর উপর চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করা হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা হল, মানব জীবনের সবগুলো ক্ষেত্রে তার মহৎ জীবন থেকে পথনির্দেশনা নেয়া হয়েছে, হচ্ছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত নেওয়া হবে।

সীরাহ: সংজ্ঞাও প্রয়োজনীয়তা

سيرة (সীরাত) এর মূল বর্ণ হচ্ছে س،ي،ر। যার শাব্দিক অর্থ চলা, দূরত্ব অতিক্রম করা। سيرة শব্দের বহুবচন হলো, سير। আরবিতে سير মানে হাটা, কেউ যখন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় হেটে যায় তখন আরবিতে বলা হয় سيرة فلان।

সীরাত অথবা সীরাহ বলতে এমন একটি পদ বুঝায় যার উপর একজন ব্যক্তি তার জীবন ভর হেঁটে চলে। হান্স ডিকশনারিতে (Dictionary of Modern Written Arabic by Hans Wehr) সীরাহর যেসব অর্থ দেওয়া হয়েছে তা হল: আচার-ব্যবহার, চালচলন, মনোভাব, জীবনযাত্রার ধরন, সামাজিক অবস্থা, প্রতিক্রিয়া, কাজকর্মের ধরন ও জীবনী - এই সবগুলোই সীরাহর অন্তর্ভুক্ত। সীরাহ বলতে শুধুমাত্র মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবনী বোঝায় না, বরং তা দ্বারা যেকোনো ব্যক্তির জীবনীকেই বোঝানো হয়। কিন্তু মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবনীর সাথে সীরাহ শব্দটি এত বেশি ব্যবহার করা হয়েছে যে, সীরাহ বলতে অধিকাংশ সময় নবীজি মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবনীকেই বুঝানো হয়।

নিম্নে সীরাহ অধ্যয়ন করার গুরুত্ব উল্লেখ করা হলঃ

১. ইসলামের ইতিহাস জানা

রসুল (সাঃ) এর জীবনকে ঘিরেই ইসলামের ইতিহাস। তাঁর জীবন অধ্যয়নের মাধ্যমে ইসলামের আসল ইতিহাস জানা যাবে, অর্থাৎ তার পুরো জীবন কাল হলো ইসলামের ইতিহাস জানার একটি উপযুক্ত মাধ্যম। তার জীবনের বিভিন্ন ঘটনা ও পরিস্থিতি গুলো জানা বর্তমান সময়ের দাওয়াতী কাজের জন্য খুবই জরুরী। রাসূল (সাঃ) এর সীরাহর অধ্যয়ন তাই নিছক একজন ব্যক্তির জীবন নিয়ে আলোচনা নয় বরং রসূল (সাঃ) এর সীরাহ হলো মুসলিম জাতির ইতিহাস, দ্বীন ইসলামের ইতিহাস।

দুনিয়াতেই জান্নাতের সুখবর প্রাপ্ত ১০ জন আশরা-ই-মুবাশশারাহর একজন হলেন সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ)। তার পুত্র মুহাম্মদ ইবনে সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) বলেন, 'আমাদের পিতা (সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর পরিচালিত যুদ্ধ সম্পর্কে আমাদেরকে শিক্ষা দিতেন, তিনি আমাদেরকে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর সীরাহ পড়ানোর সময় বলতেন, এগুলো তোমাদের বাপ দাদাদের ঐতিহ্য, কাজেই এগুলো নিয়ে পড়াশোনা কর।' তারা সীরাহকে মাগাজি বলে অভিহিত করতেন, মাগাজি মানে যুদ্ধ। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) তার জীবনের শেষ ভাগের প্রায় পুরোটা সময় বিভিন্ন যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন, তাই তারা মাগাজী বলতে তার পুরো জীবনকেই নির্দেশ করতেন।

আলী ইবন আবি তালিব (রাঃ) এর নাতি আলী ইবন হুসাইন ইবন আলী ইবন আবি তালিব বলেছেন ' আমাদেরকে যেভাবে কোরআন শেখানো হয়েছিল ঠিক সেভাবেই রসুলুল্লাহ (সঃ) এর জীবনী পড়ানো হয়েছিল।' অর্থাৎ সীরাহ তাদের কাছে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে কুরআন অধ্যয়ন করার পিছনে তারা যেভাবে সময় দিতেন সীরাহর পিছনেও ঠিক একইভাবে সময় দিতেন। সীরাহ অধ্যয়ন করা কেন এতটা গুরুত্বপূর্ণ, তা একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায়। কুরআন থেকে মুসা (আঃ) বা ঈসা (আঃ) এর জীবন সম্বন্ধে যতটা বিস্তারিত জানা যায়, ততটা রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর জীবন সম্বন্ধে জানা যায় না। তাই রাসুল (সাঃ) এর জীবনের বিভিন্ন ঘটনা

সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে অবশ্যই তার সীরাহর কাছে ফিরে যেতে হবে।

২. রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর প্রতি ভালোবাসা

সীরাহ অধ্যয়ন করার একটা অন্যতম কারণ হলো অন্তরে মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি এক গভীর ভালোবাসা গড়ে তোলা। নবীজি (সাঃ) কে ভালোবাসা হলো ইবাদত। দ্বীনের একটি বড় অংশ জুড়ে আছে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর প্রতি ভালোবাসা।

عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

[صحيح] - [متفق عليه] - [صحيح البخاري: ١٥]

আনাস রাদিল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “তোমাদের মধ্যে কেউ (পূর্ণ) মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার কাছে তার পিতা, তার সন্তান-সন্ততি এবং অন্যান্য সকল মানুষ হতে প্রিয়তম হই।”

[সহীহ] - [মুত্তাফাকুন আলাইহি (বুখারী ও মুসলিম)।] - [সহীহ বুখারী - 15]

অর্থাৎ রসূলুল্লাহ (সাঃ) কে সবকিছুর চেয়ে বেশি ভালোবাসা না পারা পর্যন্ত পরিপূর্ণ মুমিন হওয়া যাবে না। সুতরাং মুহাম্মদ (সাঃ) কে ভালোবাসা হলো ইসলামের একটি অংশ।

ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) ছিলেন খুবই সৎ ও স্পষ্টভাষী একজন মানুষ। তিনি যা বলার তা সরাসরি বলে ফেলতেন। একদিন তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কাছে গিয়ে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ), আমি নিজেকে সবচাইতে বেশি ভালোবাসি, আমি নিজেকে ছাড়া অন্য সবকিছুর চাইতে আপনাকে বেশি ভালোবাসি।' রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন 'যতক্ষণ না আমাকে ভালবাসতে পারবে', এর মানে হল যতক্ষণ না আমাকে নিজের চেয়েও বেশি ভালবাসবে ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি পরিপূর্ণ ঈমান অর্জন করতে পারবে না। এরপর ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বললেন, 'হে রাসূলুল্লাহ (সাঃ), তাহলে আমি আপনাকে আমার নিজের চেয়েও বেশি ভালোবাসি।' রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, 'এখন তুমি পরিপূর্ণ ঈমান অর্জন করেছ।'

এই উম্মত মুহাম্মদ (সাঃ) কে ভালোবাসে। যে কোন মুসলিমকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে সে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে ভালোবাসে কিনা তাহলে সে নিশ্চয়ই উত্তর দেবে 'হ্যাঁ, বাসি।'

কিন্তু কারো সম্পর্কে ভালোভাবে না জেনে, তাকে মনের গভীর থেকে, আন্তরিকভাবে ভালোবাসা যায় না। কাউকে ভালোবাসতে হলে তার সম্পর্কে জানা চাই। আর নবী (সাঃ) এর ক্ষেত্রে এটি বিশেষভাবে সত্য, কেননা তিনি এমন একজন মানুষ যার সম্পর্কে যত জানা হয়, ততই তার ব্যক্তিত্ব পাঠককে মুগ্ধ করে এবং তাঁর প্রতি ভালবাসাও তৈরি হয়। যদিও বর্তমানে অধিকাংশ মুসলিমরা তাঁর সম্বন্ধে অল্পবিস্তর জেনেই তাঁকে ভালবাসে, তারপরও তাঁর সম্পর্কে ভালোভাবে না জানা পর্যন্ত তাঁর প্রতি গভীর ভালোবাসা জন্ম নেবে না। তাই দেখা যায় যে সাহাবা (রাঃ) রা রাসূল (সাঃ) কে যত বেশি জানতেন, তারা তত বেশি তাঁর সান্নিধ্য পেতে চাইতেন এবং তাঁকে তত বেশি ভালোবাসতেন।

قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (سورة التوبة: ٢٤)

“বল, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান-যাকে তোমরা পছন্দ কর-আল্লাহ, তাঁর রসূল ও তাঁর রাহে জেহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা

কর, আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত, আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।" (সুরা তওবাহ-২৪)

এই আয়াতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুসলিমদের ভালোবাসার সর্বোচ্চ হকদার হলেন আল্লাহ তায়ালা, তার রাসুল (সাঃ) এবং তার রাস্তায় জিহাদ করা। পিতা, পুত্র, ভাই, নিজ গোত্র, ধনসম্পদ সবকিছুর চেয়ে এই তিনটি বিষয় অধিক প্রিয় হতে হবে। প্রতিটি মুসলিমের কাছে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) ও ইসলাম সব কিছুর চেয়ে প্রিয় হওয়া উচিত।

৩. সর্বোত্তম আদর্শের অনুসরণ

ইবন হাজার বলেছেন, "কেউ যদি আখেরাতের জীবনে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হতে চায়, দুনিয়ার জীবনে প্রজ্ঞা হাসিল করতে চায়, জীবনের সঠিক উদ্দেশ্য বুঝতে চায় এবং নিজের মাঝে প্রকৃত নৈতিকতা ও উন্নত চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ দেখতে চায়, তবে সে যেন রসূল (সাঃ) এর পথ অনুসরণ করে।" মুহাম্মদ (সাঃ) এর ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ আখলাক। তাঁর মাঝে যাবতীয় অসাধারণ গুণাবলীর অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছিল। তাই তাঁর সীরাহ অধ্যয়ন করার মাধ্যমে তাঁকে আরো বেশি করে অনুসরণ করা সম্ভব হবে।

৪. কুরআনকে অনুধাবন

কুরআনে এমন কিছু আয়াত রয়েছে যেগুলো ওহি নাযিল হওয়ার সময়কার পরিবেশ পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল নয়। যেমন আখিরাত সম্পর্কিত আয়াত সমূহ। পরিবেশ পরিচিতির যাই থাকুক না কেন এই আয়াতগুলো সবসময় স্বতন্ত্র থাকে। আবার কুরআনে এমন কিছু আয়াত রয়েছে যেগুলো অবতীর্ণ হয়েছিল রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সময় সংঘটিত কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করে। তাই দেখা যায় যে কিছু আয়াত কোন ঘটনার পূর্বে নাযিল হয়েছে অথবা ঘটনা ঘটনার সময় নাযিল হয়েছে কিংবা ঘটনা ঘটার পরে নাজিল হয়েছে। সীরাহ এসব ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দেয়। এর মাধ্যমে কোন ঘটনার প্রেক্ষাপটে কোন আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে - তা সীরাহ থেকে জানা যায়। যেমন সূরা আল-আযহাবের অধিকাংশ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে আল-আযহাব বা খন্দকের যুদ্ধকে কেন্দ্র করে। আবার সূরা আলে ইমরানে এমন কিছু আয়াত রয়েছে যা রসূলাল্লাহ (সাঃ)র সময় সংগঠিত একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হয়েছে। সূরা আলে ইমরানের একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে মুসলিম ও খ্রিস্টানদের মধ্যকার কিছু কথোপকথন। মূলত নাযরান থেকে আগত খ্রিস্টান প্রতিনিধির দলের সাথে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) র কথোপকথনে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে সমর্থন যোগানোর জন্য এই আয়াত সমূহ নাযিল হয়। আর আলে ইমরানের পরবর্তী অংশে গাজওয়ায়ে উহুদ অর্থাৎ উহুদের যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু এই যুদ্ধের বিস্তারিত বর্ণনা এই সূরাতে দেওয়া হয়নি। একমাত্র সীরাহ অধ্যয়ন করার মাধ্যমে আয়াতগুলোকে যথাযথ পরিস্থিতির নিরিখে বোঝা সম্ভব।

৫. মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবন ইসলামী আন্দোলনের সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নবুয়তের জীবন বিভিন্ন প্রয়োজন মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হয়েছে। প্রথমে তিনি গোপন দাওয়াহ কার্যক্রম পরিচালনা করেছিলেন। এরপর তিনি প্রকাশ্যে দাওয়াহ দেওয়া শুরু করেন এবং পরবর্তীতে জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ পরিচালনা করেছেন। ইসলামী আন্দোলনে নিয়োজিত কর্মীদের জন্য এই পর্যায়গুলোর মাঝে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা রয়েছে। দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর গৃহীত প্রতিটি পদক্ষেপ ছিল ওহী দ্বারা নির্দেশিত। নিছক পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার লক্ষ্যে রসুলুল্লাহ (সাঃ) হুটহাট সিদ্ধান্ত নিতেন না। বরং আল্লাহ তাআলা তাঁর

রাসূল (সাঃ)কে প্রতিটি পদে সঠিক পথে পরিচালনা করেছেন। সুতরাং রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর জীবনের যা কিছু ঘটেছে তা কোন এলোমেলো আকস্মিক ঘটনাবলির সমষ্টি নয়, বরং এ সকল ঘটনা ছিল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার পরিকল্পনার অংশ, যাতে দ্বীন ইসলামকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার সময় এসব ঘটনা মুসলিম উম্মাহর জন্য দিকনির্দেশনা হিসেবে কাজ করে। সুতরাং ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যেসব ধাপ অতিক্রম করেছেন সেগুলো সম্পর্কে জ্ঞান রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একই সাথে দাওয়াতের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যেসব পর্যায় পার করেছেন সেগুলোও খেয়াল রাখতে হবে।
সীরাহর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল সীরাহ সাহাবা (রাঃ) দেরকে শিখিয়েছিল কুরআনের শিক্ষা কীভাবে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়। সীরাহ তাদেরকে ন্যায়পরায়ণতা ও মধ্যপন্থা অবলম্বনের শিক্ষা দেয়। কুরআন ও সুন্নাহ হচ্ছে মৌখিক নির্দেশ, আর সীরাহ হলো সেই নির্দেশের বাস্তব প্রতিফলন। অন্য নবীদের সীরাহ সংরক্ষিত নেই, কিন্তু মুসলিমদের কাছে কুরআন-সুন্নাহর পাশাপাশি সীরাহও সংরক্ষণ করা আছে।

৬. সীরাহ অধ্যয়ন একটি ইবাদত

সীরাহ বিনোদনের জন্য নয়, এটি একটি ইবাদত। তাই সীরাহ অধ্যয়নের জন্য আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে উত্তম প্রতিদান রয়েছে। যে জমায়েতে রাসুলুল্লাহ (সাঃ)র সীরাহ অধ্যায়ন করা হয়, সে জমায়েত আল্লাহ তাআলার ইবাদত করার জমায়েত, আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করার জমায়েত। আর যে জমায়েতে আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করা হয়, ফেরেশতারা সেই জমায়েত ঘিরে থাকেন। আল্লাহ তাআলা বলেন

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○ (سورة آل عمران - ٣١)

“বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহ ও তোমাদিগকে ভালবাসেন এবং তোমাদিগকে তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন। আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাকারী দয়ালু।“ (সুরা আলে ইমরান - ৩১)

৭. মুসলিম হিসেবে নিজেদের পরিচয় গড়ে তোলা

বর্তমান সময় বিশ্বব্যাপী একটি অপসংস্কৃতি গড়ে উঠেছে যা জোর করে সবার উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। শক্তি প্রয়োগ করে হলেও এই অপশক্তিত গ্রহনে বিশ্ববাসীকে বাধ্য করা হচ্ছে। থমাস ফ্রাইডম্যান আমেরিকার একজন বিখ্যাত লেখক, নিউইয়র্ক টাইমসে লেখালেখি করেন। তিনি বলেছেন, ' পুঁজিবাদী অর্থনীতির পেছনে রয়েছে একটি অদৃশ্য কালো হাত। ম্যাকডোনাল্ড বার্গার কে আপনার ঘরের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে চায় ম্যাকডোনাল্ড ডগলাসের জঙ্গি বিমান F-15!' অন্যভাবে বলা যায় যে, এই অপসংস্কৃতি মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রতি সহানুভূতিশীল নয়। কারো পছন্দ অপছন্দকে এই অপসংস্কৃতি কোন রকম তোয়াক্কা করে না। হয় ম্যাকডোনাল্ড বার্গার কিনে খাও, নতুবা ম্যাকডোনাল্ড ডগলাস এর জঙ্গি বিমান F-15 তোমার আকাশ সীমানায় হাজির হবে। এটি এমন একটি সংস্কৃতি যা কিনা ভিন্ন মত একদমই সহ্য করতে পারে না। এটি দুনিয়ার বুক থেকে অন্য সব মতাদর্শকে উপড়ে ফেলতে চায়। বর্তমানে বিশ্বায়নের যুগে যে ভোগবাদী সংস্কৃতি ছড়িয়ে ও চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে তা নিঃসন্দেহে পৃথিবীর মানুষের জন্য একটি অশনি সংকেত, কেননা এটি সকল সংস্কৃতি ও বিশ্বাসকে দুনিয়ার বুক থেকে উচ্ছেদ করে দিতে চায়।

ইসলাম ব্যাতীত অন্য সব মতাদর্শ আজ এই বৈশ্বিক সংস্কৃতির সামনে মুখ থুবড়ে পড়েছে। ইসলাম একটি জীবনব্যাবস্থা যা স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং দুনিয়ার সকল আদর্শকে মোকাবেলা করতে সক্ষম। দুনিয়ার সমস্ত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়ার সামর্থ্য থাকলেও কিছু মুসলিম আজ ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে কিছুটা সন্দিহান। চার পাশে ইসলামের বিধিবিধান মেনে চলার চেষ্টা করেন এমন অনেক মুসলিম রয়েছেন, কিন্তু মুসলিম হিসেবে যে একটি স্বকীয়তা বা নিজস্ব পরিচয় রয়েছে তা অধিকাংশের মাঝে অনুপস্থিত। রকস্টার বা ফুটবল খেলার সাথে একজন গড়পড়তা মুসলিমের যতটা সাদৃশ্য দেখা যায়, ততটা একজন সাহাবী (রাঃ) র সাথে দেখা যায় না। এই যুগের যুবকরা সাহাবী (রাঃ) দের সম্পর্কে যতটা না জানে, তার চেয়ে অনেক বেশি জানে খেলোয়াড়দের সম্পর্কে। এমনকি তারা নবী-রাসুলদের সম্পর্কেও তেমন কিছু জানেনা। আজকের দিনের অল্প কজন যুবকই আল্লাহ তাআলার সব নবী-রাসূলদের নাম বলতে পারবে, বা সাহাবী (রাঃ) দের নাম মনে রাখতে পারবে। কিন্তু সেই একই ব্যক্তিকে তার প্রিয় ফুটবল টিমের অথবা ক্রিকেট খেলোয়াড়দের নাম জিজ্ঞেস করা হলে দেখা যাবে সে হড়বড় করে অনেক কথা বলে ফেলছে। মুসলিমদের মাঝে আত্মপরিচয়ের যে সংকট দেখা দিয়েছে তা নিঃসন্দেহে তীব্র আকার ধারণ করেছে।

এই পরিচয়সংকট দূর করার জন্য যে সব পদক্ষেপ নেয়া জরুরী তা হল:

- ইসলামী ইতিহাসের উপর ভালো দখল থাকতে হবে। তাদের সিলেবাসে যেসব বিষয় থাকা খুব জরুরী সেগুলো হলো রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর সীরাহ, নবীদের জীবনী, সাহাবী (রাঃ) দের জীবন কাহিনী এবং সবশেষে মুসলিমদের সামগ্রিক ইতিহাস। সুতরাং প্রথম পদক্ষেপ হলো ইসলামের ইতিহাস জানার মাধ্যমে নিজেদের একটি পরিচয় গড়ে তোলা।
- সমগ্র মুসলিম জাতি এক উম্মাহ। নিজেকে পুরো মুসলিম উম্মাহর একজন সদস্য মনে করতে হবে। জাতীয়তার ভিত্তিতে মুসলিমদের একেকজনের যে পরিচয় রয়েছে তা যেন মুসলিম পরিচয় এর উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে না পারে। মুসলিমদের মধ্যে কেউ আছে কুয়েতি, আমেরিকান, ব্রিটিশ বা পাকিস্তানি; তবে জাতীয়তাবাদী পরিচয় যেন মুসলিম পরিচয়ের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ না হয়ে যায়। ইসলাম কিন্তু এই জাতীয়তাবাদী চিন্তাভাবনা দূর করার জন্যই এসেছে। মুসলিমদের আনুগত্য হলো আল্লাহতাআলা ও দ্বীন ইসলামের প্রতি। তাই সারা বিশ্বের ছড়িয়ে ছিটে থাকা মুসলিম ভাই বোনদের খোঁজ খবর রাখতে হবে।
- মুহাম্মদ (সাঃ)র রিসালাতের প্রমাণ হল তার জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনা। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সবচেয়ে বড় মু'জিজা হলো কুরআন। এছাড়া রাসূলুল্লাহ (সাঃ)র প্রমান হিসেবে আরো অনেক মু'জিজা ছিল। তবে তার জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনাসমুহই রিসেলাতের অন্যতম প্রমাণ।

যে মুহাম্মদ (সাঃ) জীবনের প্রথম চল্লিশটি বছর একজন সাধারন মানুষ হিসেবে জীবন যাপন করেছিলেন ,সেই মুহাম্মদ (সাঃ) ই পরবর্তীতে একজন রাজনৈতিক নেতা, সামরিক নেতা, ধর্মীয় নেতা, বিশাল সংসারের প্রধান, আইন প্রণেতা, শিক্ষক, ইমাম এবং আরো অনেক দায়িত্ব পালন করেছিলেন আর এসব ঘটেছিল তার জীবনের শেষ তেইশ বছরে, নিঃসন্দেহে অবিশ্বাস্য! মুহাম্মদ (সাঃ) এবং সেই মানুষটির সীরাহ নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ সীরাহ। তার মহত্ব বা মাহাত্ম্য বুঝানোর জন্য যাই বলা হোক না কেন তা আসলে কম বলা হবে। তার শ্রেষ্ঠত্ব দুনিয়ার যাবতীয় মাইলফলককে ছাপিয়ে যায়। দুনিয়াতে এ যাবৎকাল পর্যন্ত সর্বোচ্চ প্রভাবশালী ১০০ ব্যক্তিকে নিয়ে বিখ্যাত আমেরিকান লেখক মাইকেল এইচ হার্ট একটি বই লিখেছিলেন। The 100 Most

Influential People! এ উদ্দেশ্যে তিনি ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে প্রভাবশালী নেতাদের জীবনী অধ্যয়ন করেছিলেন। একজন অমুসলিম হয়েও শেষ পর্যন্ত তিনি উপলব্ধি করতে পারলেন যে, সন্দেহাতীতভাবে মুহাম্মদ (সাঃ) হলেন এ যাবতকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব। অনেকে তার এই বাছাই নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারে এই ভেবে তিনি সূচনাতে লিখেছিলেন
“আমার তৈরি করা পৃথিবীর এ জগতকালের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের তালিকার এক নম্বরে মুহাম্মদ (সাঃ) কে দেখে অনেক পাঠক অবাক হতে পারে। আমার মনোনয়ন নিয়েও অনেক প্রশ্ন উঠতে পারে। আসলে পুরো ইতিহাসে একমাত্র তিনিই হলেন এমন এক ব্যক্তি যিনি আধ্যাত্মিক এবং দুনিয়াবী - উভয় জায়গাতেই সর্বোচ্চ সফলতার ছাপ রেখেছেন।” এরপর তিনি আরো বলেছেন “দুনিয়াবী ও আধ্যাত্মিক উভয় পর্যায়ে মুহাম্মদ (সাঃ) এর অসাধারণ প্রভাব দেখে আমি তাকে মানব ইতিহাসের সবচেয়ে প্রভাবশালী নেতা হিসেবে বাছাই করেছি।”
মাইকেল হার্ট সত্যের কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। মুহাম্মদ (সাঃ) যে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব তাতে কোন সন্দেহ নেই। এরপর তিনি তার পাঠকদের কাছে এ বলে ক্ষমা চেয়েছিলেন যে “আমার কিছুই করার ছিল না।” অর্থাৎ তালিকায় মুহাম্মদ (সাঃ) এর উপরে রাখার মত আর কাউকে তিনি পাননি। যদি তাকে তার অসাধারণ ব্যক্তিত্বের যেকোনো একটি দিক দিয়ে বিচার করা হয়, যেমন, সামরিক বাহিনীর নেতা হিসেবে, তবে দেখা যায় যে, তিনি সামরিক নেতা হিসেবে সবার চেয়ে সেরা ছিলেন। আবার ধর্মীয় নেতা হিসেবেও তিনি অসাধারণ ছিলেন। কাজেই যেদিক থেকে বিচার করা হোক না কেন, যতভাবে তাঁর জীবন ব্যবচ্ছেদ করা হোক না কেন, তাঁর জীবনের যেকোনো একটি দিকই তাঁর সেরা হওয়ার জন্য যথেষ্ট। এখানে মনে রাখা জরুরী যে, সীরাহ হচ্ছে আল-মুস্তাফার জীবনী। মুস্তাফা মানে হল যাকে বাছাই করা হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁকে সবার মধ্যে থেকে বাছাই করেছেন। মুহাম্মদ (সাঃ) হলেন আল মুস্তফা আল খালক্বি। তিনি আল্লাহ তাআলার সমগ্র সৃষ্টির মধ্য থেকে নির্বাচিত।

প্রাক ইসলামিক আরব

সীরাহ লেখকগন সাধারণত নবীজি (সাঃ) এর জন্মের সময়কাল থেকে সীরাহ শুরু করেন না। বরং এই মিল্লাতের পিতা ইবরাহীম (আঃ) এর ঘটনা দিয়ে শুরু করেন। আর শুরুতেই থাকে ইবরাহীম (আঃ) কর্তৃক স্ত্রী হাজেরা (আঃ) ও পুত্র ইসমাইল (আঃ) কে মক্কায় রেখে আসার কাহিনী। এখানেও আমরা সেই রীতি অনুসরণ করব।

ইবরাহীম (আঃ) এর কাহিনী

যমযম কূপের উদ্ভব

ইবরাহীম (আঃ) তার স্ত্রী হাজেরা (আঃ) ও সদ্যজাত পুত্র ইসমাইল (আঃ) কে নিয়ে হিজাযের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তিনি তাদেরকে যে জায়গাটিতে নিয়ে যান সে জায়গাটিই এখন মক্কা নামে পরিচিত। ওই সময় মক্কা ছিল জনমানবশূন্য। তবে যে স্থানে কাবা নির্মাণ করা হয়েছিল তা সৃষ্টির শুরু থেকেই পবিত্র ছিল। ইবরাহীম (আঃ) তার স্ত্রী ও পুত্রকে অল্প কিছু পানি ও এক থলে খেজুরসহ সেই নিরিবিলি জায়গায় রেখে আসেন। তারপর কিছু না বলেই সেখান থেকে উল্টো পথে হাঁটা শুরু করেন।

হাজেরা (আঃ) বুঝতে পেরেছিলেন যে তার স্বামী তাদেরকে রেখে যাবেন, কিন্তু তিনি এটা আশা করেননি যে এরকম জনমানবহীন মরুভূমির মাঝে তিনি তাদেরকে এভাবে ফেলে চলে যাবেন। তিনি স্বামীর পিছে পিছে গিয়ে প্রশ্ন করেন, "ইবরাহীম, আপনি কি আমাদেরকে এখানে ফেলে রেখে যাচ্ছেন? এখানে না আছে কোন জনবসতি, না কোন ফল ফসল।"

ইব্রাহিম (আঃ) চুপ করে রইলেন।

তার স্ত্রী আবারও একই প্রশ্ন করলেন, ইবরাহীম (আঃ) কোন উত্তর দিলেন না। তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করা হলো। তখনো তিনি নিশ্চুপ।

হাজেরা (আঃ) প্রশ্ন করলেন, "তবে কি আল্লাহ তাআলা আপনাকে এ নির্দেশ দিয়েছেন?"

এবার উত্তর এলো "হ্যাঁ।"

হাজির (আঃ) বললেন, "তাহলে চিন্তার কোন কারণ নেই। আল্লাহ তাআলাই আমাদের দেখাশোনা করবেন। তিনি আমাদের কখনোই অবহেলা করবেন না।"

হাজার (আঃ) জানতেন যদি আল্লাহ তাআলার আদেশে ইব্রাহিম (আঃ) তাদেরকে এমন জনমানবীন অঞ্চলেও রেখে যান, তবুও দুশ্চিন্তার কিছু নেই, কেননা আল্লাহ তাআলাই এই আদেশ করেছেন। আল্লাহ তাআলার উপর তার এই বিশ্বাস আছে যে আল্লাহ তাআলাই তাকে দেখে রাখবেন। যদি সে আদেশ হয় এরকম নিরিবিলি স্থানে একাকী বসবাস করা, তবে সেখানেও আল্লাহর হেফাজতের চাদর তাদের ঘিরে রাখবে।

ইব্রাহিম (আঃ) চলে গেলেন। তিনি অনেক দূরে চলে গেলেন, তার স্ত্রী ও ছেলেকে আর দেখা যাচ্ছিল না। তখন কাবার দিকে মুখ ফিরিয়ে তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে একটি দুয়া করেন। এই চমৎকার দুয়াটি আছে কুরআনের সূরা ইবরাহীমে

رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ
النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ○ (سورة ابراهيم - ٣٨)

"হে আমাদের পালনকর্তা, আমি নিজের এক সন্তানকে তোমার পবিত্র গৃহের সন্নিকটে

চাষাবাদহীন উপত্যকায় আবাদ করেছি; হে আমাদের পালনকর্তা, যাতে তারা নামায কায়েম রাখে। অতঃপর আপনি কিছু লোকের অন্তরকে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করুন এবং তাদেরকে ফলাদি দ্বারা রুযী দান করুন, সম্ভবতঃ তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে।” (সূরা ইব্রাহীমঃ ৩৭)

ইবরাহীম (আঃ) চলে গেলেন। মা হাজেরা (আঃ) এর কাছে যে খাবার ছিল তা কিছুদিনের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল। আর ইসমাইল (আঃ) তখনো ছিলেন দুধের শিশু। হাজেরা (আঃ) তার শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছিলেন কিন্তু সেই দুধও একসময় শুকিয়ে গেল। ইসমাইল (আঃ) প্রচন্ড ক্ষুধায় কাঁদছে। সন্তানের কান্না সহ্য করতে না পেরে মা খাদ্যের খোঁজে বের হলেন। একটি পাহাড় বেয়ে উপরে উঠতে লাগলেন। এই পাহাড়ই পরে আস-সাফা নামে পরিচিত হয়েছিল। সেই পাহাড়ের উপর উঠে একবার ডানে তাকান, আবার বাঁয়ে তাকান, কিন্তু তিনি কাছাকাছি কোন মানববসতির সন্ধান পেলেন না। এরপর পাহাড় থেকে উপত্যকায় ফিরে এলেন, কাপড় গুটিয়ে এবার উঠতে লাগলেন আরেকটি পাহাড়ে, পরবর্তীতে যা আল-মারওয়া নামে পরিচিত হয়। এই পাহাড়ের চূড়ায় উঠেও ডানে-বাঁয়ে তাকাতে লাগলেন। কিন্তু এবারও কাউকে দেখতে পেলেন না।

একদিকে পুত্র ইসমাইল (আঃ) প্রচন্ড ক্ষুধায় কাতরাচ্ছে, অন্যদিকে মা হাজেরা (আঃ) কিছু পাওয়ার আশায় আস-সাফা ও আল-মারওয়া পাহাড় দুটির মাঝে ছোটাছুটি করছেন। এভাবে ইতিমধ্যে সাতবার দুই পাহাড়ে ওঠানামা করে ফেলেছেন। সপ্তম বার তিনি যখন পাহাড়ের চূড়ায় উঠলেন, তখন একটি আওয়াজ শুনতে পেলেন। আওয়াজটি কোথা থেকে এসেছে তা বোঝার জন্য আশে পাশে তাকাতে লাগলেন। হঠাৎ অবাক বিস্ময়ে আবিষ্কার করলেন যে শিশু ইসমাইল (আঃ) র পায়ের কাছ থেকে আওয়াজটি আসছে। আল্লাহ তাআলার নির্দেশে জিবরীল (আঃ) সেখানে যমযম কূপ খনন করে দিয়েছেন আর হাজের (আঃ) এই কূপের আওয়াজই শুনতে পেয়েছিলেন। প্রচন্ড খুশিতে তিনি পানির উৎসের দিকে দৌড়ে গেলেন। মরুভূমিটি শুষ্ক ছিল, তাই পানি শুকিয়ে যেতে পেরে চিন্তা করে হাজেরা (আঃ) পানি ধরে রাখার জন্য কুয়ার মত একটি জায়গা তৈরি করলেন। এ ঘটনা বর্ণনা করার সময় রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছিলেন, “ইসমাইল (আঃ) র মায়ের উপর আল্লাহ তাআলা রহম করুন। তিনি যদি এভাবেই তা ফেলে রাখতেন তাহলে সেখানে নদী প্রবাহিত হয়ে যেত।” অর্থাৎ তিনি কুয়া বানিয়ে পানি ধরে না রাখলে তাহলে তা থেকে একটি নদী প্রবাহিত হতো।

চোখের সামনে ক্ষুধায় কাতর পুত্রের কষ্ট ও কান্না দেখে নিশ্চয়ই হাজেরা (আঃ) অনেক কষ্ট পাচ্ছিলেন, তার বুক ভেঙে গিয়েছিল, হয়তোবা তিনি কাঁদছিলেনও। কিন্তু তিনি ছিলেন একজন মু'মিনাহ ও মুত্তাক্বী বান্দী। আল্লাহ আযযা ওয়াজাল তাকে পরীক্ষা করছিলেন। আল্লাহ তাআলা তার জন্য এক মহা পুরস্কার ঠিক করে রেখেছিলেন, কিন্তু হাজেরা (আঃ) তা জানতেন না। তাই তিনি নিশ্চয়ই প্রচন্ড কষ্টের মাঝে ছিলেন। হাজেরা (আঃ) র এই ঘটনা বর্ণনা করার সময় রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছিলেন, “আর এ কারণেই আমরা (হাজ্জের সময়) সাফা-মারওয়ায় উঠানামা করি।” অর্থাৎ আজ পর্যন্ত আমরা হাজেরা (আঃ) র পদাঙ্ক অনুসরণ করে এসেছি। হাজেরা (আঃ) যদি জানতে পারতেন যে এমন এক সময় আসবে যখন সারা বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মুসলিম তার পদাঙ্ক অনুসরণ করবে তাহলে তিনি মুখে এক চিলতে হাসি নিয়ে সাফা-মারওয়ায় উঠানামা করতেন।

এই ঘটনা থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। মাঝে মাঝে আল্লাহ আমাদেরকে বিশেষ কিছু

পরিস্থিতির মধ্যে ফেলে পরীক্ষা নেন, কিন্তু আমরা জানি না আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য কি ঠিক করে রেখেছেন। কোন কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হলে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, হাজেরা (আঃ) ও একসময় কষ্টকর পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে গিয়েছেন আর সেই মুহূর্তে আল্লাহ তাআলার উপর তার অগাধ বিশ্বাসের কারণে তাকে দেয়া হয়েছে এক অসাধারণ প্রতিদান।

মক্কায় জনবসতি স্থাপন

যমযম কূপ সৃষ্টি হলো, মরুভূমিতে পানির অভাব দূর হলো, আর স্বাভাবিকভাবেই শুরু হলো প্রানের সমাগম। পাখিরে কূপের চারপাশে উড়তে লাগলো। সেখানে তখন জুরহুম নামে একটি যাযাবর গোত্র ছিল। এদের আদি নিবাস ছিল ইয়েমেন, কিন্তু তারা ইয়েমেন ত্যাগ করে এখানে চলে আসে। ইয়েমেনের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, বিভিন্ন সময়ে ব্যাপকহারে লোকজন এ স্থান ছেড়ে চলে গিয়েছিল। এরকম একটি ঘটনা কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। তখন ইয়েমেনে সাবা জাতির বসবাস ছিল, তারাই প্রথমবারের মতো সেখানে একটি বাঁধ তৈরি করেছিল। যে মরুভূমিতে বৃষ্টি হয় না বললেই চলে সে মরুভূমিতেই বাঁধ দেওয়ার কারণে সারা বছর পানি সরবরাহ তৈরি হলো। পানির এই সহজলভ্যতা আরবের মাঝে এক বিশাল জাতির জন্ম দিল। কুরআনে বর্ণিত আছে, তাদের ব্যাপক সম্পদ আর চাষাবাদের কারণে তাদের ভ্রমণ করতে কোন কষ্টই হত না। কেননা, তারা বিভিন্ন জায়গা জুড়ে অনেকগুলো উপনিবেশ স্থাপন করেছিল, তাই তাদের থাকা-খাওয়ার জায়গার কোনো অভাব ছিল না। কিন্তু এই জাতির লোকেরা আল্লাহ তাআলার অবাধ্য ছিল। তাই আল্লাহ তায়ালা তাদের বাঁধ ধ্বংস করে দেন, এর ফলে পুরো এলাকা পানিতে ভেসে যায় এবং লোকজন ইয়েমেন ত্যাগ করে আশেপাশের বিভিন্ন এলাকা যেমন আন-নাজদ, আল-হিজায, ইরাক, আশ-শাম, মদীনা ইত্যাদি এলাকাসমূহে ছড়িয়ে পড়ে। জুরহুম গোত্র অবশেষে হিজাযে এসে বসতি স্থাপন করে। তবে তারা সেই প্লাবনের আগে এসেছিল নাকি পরে এসেছিল - সে সম্পর্কে আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন। মক্কা ও এর আশেপাশের এলাকা সম্পর্কে জুরহুম গোত্রের ভালো ধারণা ছিল। তারা ভালো করেই জানতো যে, ওই এলাকায় পানির কোন উৎস নেই। তাই ওই এলাকার আকাশে ব্যাপক হারে পাখিদের ঘোরাঘুরি করতে দেখে তারা অবাক হয়ে গেল। সেখানে কি ঘটছে দেখার জন্য দুইজন লোক পাঠাল। তারা ফিরে এসে জানালো যে সেখানে একটি কূপ রয়েছে। এরপর জুরহুম গোত্রের লোকেরা যমযম কূপের কাছে চলে গেল। মা হাজেরা (আঃ) র দিকে ছুড়ে দিল একটি অদ্ভুত প্রশ্ন। আর তিনিও তাদের অদ্ভুত প্রশ্নের জবাবে অদ্ভুত একটি উত্তরই দিয়েছিলেন। তারা জিজ্ঞেস করেছিল “আমরা কি এখানে বসতি স্থাপন করতে পারি? ”

জুরহুম ছিল যোদ্ধাদের গোত্র আর তারা কিনা বসতি স্থাপনের জন্য এক মহিলার অনুমতির তোয়াক্কা করছে! বিবি হাজেরা (আঃ) ছিলেন এমন একজন মহিলা যার সাথে ওই সময় একমাত্র শিশুর সন্তান ইসমাইল (আঃ) ছাড়া আর কোন পুরুষ ব্যক্তি ছিল না। তারা চাইলেই হাজেরা (আঃ) কে সেখান থেকে এক ধাক্কায় বের করে দিতে পারতো। কিন্তু তারা বেশ ভদ্রতা করে তার কাছে অনুমতি চাইল। হাজেরা (আঃ) বললেন, “ঠিক আছে তোমরা থাকতে পারো, তবে আমার একটি শর্ত আছে আর তা হলো এই কূপ আমার অধীনে থাকবে।” মজার ব্যাপার, তিনি ছিলেন একাকী মহিলা, যার তাদের সাথে পেরে ওঠার কোনো ক্ষমতাই নেই, তিনিই কিনা তাদের সাথে দর কষাকষি করছেন আর শর্ত আরোপ করছেন, যেখানে কিনা তারা চাইলেই তাকে সেখান থেকে হটিয়ে দিতে হতে পারতো। যাই হোক, জুরহুম গোত্রও তার এ শর্তে রাজি হয়ে গেল।

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “হাজেরা মনে মনে চাইছিলেন এই গোত্র এখানে বসতি স্থাপন করুক।” তিনি চাচ্ছিলেন এখানে একটি জনবসতি গড়ে উঠুক, কিন্তু এটাও চাচ্ছিলেন যেন বিষয়টি যথাযথভাবে হয়। অবশেষে জুরহুম গোত্র যমযম কূপের নিকটস্থ এলাকায় বসতি স্থাপন করে আর এই এলাকাটি পরবর্তীতে মক্কা নামে পরিচয় লাভ করে। ইসমাইল (আঃ) তাদের মাঝে বড় হয়ে উঠতে লাগলেন। জুরহুম গোত্রের ভাষা ছিল আরবি, ইসমাইল (আঃ) সেটাও রপ্ত করে ফেললেন। তার পিতা ইব্রাহিম (আঃ) ছিলেন ইরাকের অধিবাসী আর সে সময় ইরাকে অন্য ভাষা চালু ছিল। ইসমাইল (আঃ) জুরহুম গোত্রের এক মহিলাকে বিয়ে করেন আর এখান থেকে শুরু হয় রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর বংশধারা। সে সময় মক্কার রাজনৈতিক নেতৃত্ব জুরহুম গোত্রের হাতে ছিল। পরবর্তীতে ইব্রাহিম (আঃ) মক্কা এসে পুত্র ইসমাইল (আঃ) কে সাথে নিয়ে কাবাঘর নির্মাণ করেন। মক্কার ধর্মীয় নেতৃত্ব ছিল ইসমাইল (আঃ) র হাতে, আর তা যুগ যুগ ধরে তার উত্তরসূরীদের মাঝে বহাল ছিল। জুরহুর গোত্রের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা থাকলেও ধর্মীয় কর্তৃত্ব কখনোই তারা লাভ করেনি।

মক্কার সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস

কুরাইশ বংশের উৎপত্তি

জুরহুম গোত্র দীর্ঘদিন ধরে মক্কায় ছিল। ধীরে ধীরে তারা দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং ক্ষমতার অপব্যবহার শুরু করে। তখন আল্লাহ তাআলা তাদের স্থলে বনু খুযাআ গোত্রকে পাঠান। বনু খুযাআ জুরহুম গোত্রকে মক্কা থেকে বের করে দেয়। বনু খুযাআ ছিল একটি ইয়েমিনি গোত্র এবং অন্যান্য গোত্রসমুহের মতো এটিও ইয়েমেন ত্যাগ করেছিল। অবশেষে তারা হিজাযে কর্তৃত্ব স্থাপন করে। এদিকে জুরহুম মক্কা ছেড়ে যাওয়ার আগে দুটো কাজ করলো, প্রথমত, তারা যমযম কূপের মুখ বন্ধ করে এর সমস্ত চিহ্ন মুছে দিল। দ্বিতীয়ত আল-কাবার ভেতরে যে মূল্যবান সম্পদগুলো ছিল সেগুলো তারা সাথে করে নিয়ে গেল।

জুরহুম গোত্র চলে যাওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই মক্কার শাসন ক্ষমতা চলে গেল বনু খুযাআর হাতে। যদিও সে সময় ইসমাইল (আঃ) র বংশধররা সংখ্যায় অনেক গুণ বেড়ে যায় এবং অনেক গোত্রে বিভক্ত হয়ে সমগ্র আরবে ছড়িয়ে পড়ে। মক্কায় একটিমাত্র শাখা গোত্র রয়ে যায় আর শাখা গোত্রটির নাম হল কুরাইশ। অর্থাৎ ইসমাইল (আঃ) এর উদ্ভূত গোত্রগুলোর একটি হল কুরাইশ। তবে মক্কার কর্তৃত্ব তখনো কুরাইশদের হাতে নয় বরং বনু খুযাআর হাতেই ছিল। বনু খুযাআর অন্যতম নেতা ছিল আমর ইবন লুহাই আল খুযাই। আরবের ধর্মীয় পটভূমির আলোচনায় তাকে নিয়ে আলোচনা করা হবে। অন্যদিকে কুরাইশদের নেতা ছিল কুসাই ইবনে কালব - সে সকল কুরাইশকে ঐক্যবদ্ধ করে বনু খুযাআর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং তাদেরকে পরাজিত করে মক্কা থেকে বের করে দেয়। প্রথমবারের মতো মক্কার রাজনৈতিক ও ধর্মীয় - উভয় নেতৃত্ব কুসাই তথা কুরাইশদের হস্তগত হয়। কুসাইর হাতে তখন কাবা ঘরের অভিভাবকত্ব চলে আসে। সে একই সাথে কাবাঘরের সিক্বায়াহ ও নিফাদার ব্যাপারে কর্তৃত্বশীল হয়। সিক্বায়াহ ও নিফাদা হল কাবায় আগত হাজীদের খাবার ও পানি পান করানোর দায়িত্ব।

এই কাজগুলো সাধারণভাবে খুব আহামরি মনে না হলেও আরবে আল্লাহ তাআলার অতিথিদেরকে আপ্যায়ন করতে পারাটা অত্যন্ত সম্মানজনক একটা ব্যাপার ছিল। এই দায়িত্ব লাভের মাধ্যমে হাজ্জ করতে আগত হাজীদের মেহমানদারির দায়িত্ব বর্তায় কুরাইশদের উপর। তৎকালীন কুরাইশদের রাজনৈতিক পরিষদ আন-নাদওয়ার কর্তৃত্বও কুসাই ইবন কালবের হাতে

ছিল। আন-নাদওয়া ছিল অনেকটা বর্তমান যুগের সংসদের মতো। তার হাতে আরো ছিল আল-লিওয়ার নিয়ন্ত্রণ। আল-লিওয়া ছিল যুদ্ধের ব্যানার, অর্থাৎ যুদ্ধ ঘোষণা দেওয়ার সকল ক্ষমতাও ছিল কুসাইয়ের হাতে। এক কথায় বলা যায় যে কুসাই ইবন কালব ছিল তৎকালীন মক্কার একচ্ছত্র অধিপতি।

কুসাই ইবন কালবের মৃত্যুর পর এসব ক্ষমতা তার সন্তানরা নিজেদের মাঝে ভাগ করে নেয়। কুসাইয়ের নাতি আমর পৈত্রিক সূত্রে হাজীদের খাবার ও পানীয় দিয়ে আপ্যায়ন করার দায়িত্ব লাভ করেন। সচরাচর শুধুমাত্র স্যুপ দিয়ে হাজীদের আপ্যায়ন করা হতো। কিন্তু আমর এ খাবারে কিছুটা নতুনত্ব আনেন। তিনি রুটি ছিড়ে স্যুপের মধ্যে ভেজানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। ফলে খাবারটির স্বাদ আরো বেড়ে গিয়েছিল। কোন কিছু ভেঙ্গে গুঁড়ো করার পদ্ধতিকে আরবিতে 'হাশম' বলা হয়। এই হাশম থেকেই তখন আমর কে হাশিম নামে ডাকা হতো। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর প্রপিতামহ। হাশিম বিয়ে করেছিলেন মদিনার এক মহিলাকে। এরপর তিনি ব্যবসার উদ্দেশ্যে ফিলিস্তিনে যান এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। গাযাতে তাকে দাফন করা হয়। এর মধ্যে তার স্ত্রী গর্ভবতী হয়ে পড়ে এবং পরবর্তীতে তিনি এক পুত্র সন্তানের জন্ম দেন। পুত্রের নাম রাখা হয়েছিল 'শায়বা'। শায়বা মানে হলো বৃদ্ধ লোক। ছোট শিশুর এরূপ অদ্ভুত নামকরণের কারণ হলো জন্ম থেকেই তার মাথার কিছু চুল ধূসর ছিল। স্বামীর মৃত্যুর পর শায়বার মা ইয়াসরিবে পিতামাতার কাছেই থেকে গিয়েছিলেন। তাই শায়বার ছোটবেলা কেটেছিল ইয়াসরিবের তার নানাবাড়িতে। আর এই ইয়াসরিবে যখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হিজরত করলেন তখন সেই ইয়াসরিবের নাম বদলে হয়ে গেল মদিনা।

আব্দুল মুত্তালিব এর নেতৃত্ব লাভ

একদিন আল-মুত্তালিব নামক এক ব্যক্তি মদিনা আসলেন। তিনি ছিলেন হাশিমের ভাই। ভাতিজা শায়বাকে মক্কায় নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি মদীনায় এসেছিলেন। তখন শায়বার বয়স ছিল প্রায় আট বছর। প্রথমে তার মা ছেলেকে ছাড়তে চাচ্ছিলেন না, কিন্তু আল-মুত্তালিব তাকে বুঝালেন যে, সে কুরাইশের সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত পরিবারের অন্যতম উত্তরাধিকারী এবং তার উচিত তার নিজ বংশ ও পরিবারের নিকটে ফিরে যাওয়া এবং সেখানে দায়িত্বসমূহ বুঝে নেওয়া - এই কথা শুনে শায়বার মা রাজি হন।

এরপর আল মুত্তালিব শায়বাকে নিয়ে মক্কায় ফিরে যান। শায়বাকে এর আগে মক্কার কেউ দেখেনি। তখনকার দিনে দাস কেনাবেচা খুব সাধারণ একটি ব্যাপার ছিল। তাই লোকজন আল-মুত্তালিব এর সাথে একটি অচেনা ছোট ছেলেটিকে দেখে ভেবেছিল যে সে বোধহয় আল-মুত্তালিবের দাস। তাই তারা শায়বাকে আব্দুল মুত্তালিব বলে ডাকতে থাকে, আর এই আব্দুল মুত্তালিবই হলেন রসূলুল্লাহ (সাঃ) র দাদা। তার আসল নাম ছিল শায়বা, কিন্তু লোকেরা মুত্তালিবের দাস ভেবে তাকে আব্দুল মুত্তালিব নামে ডাকতে শুরু করেছিল।

আব্দুল মুত্তালিবের বেশ কিছু তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা আছে। বনু জুরহুম গোত্র মক্কা ছেড়ে যাওয়ার সময় যমযম কূপের মুখ বন্ধ করে এর সব চিহ্ন মুছে দিয়েছিল, এই ঘটনার পর প্রায় তিনশ বছর পর্যন্ত যমযম কূপের অবস্থান মক্কাবাসীদের কাছে অজানা ছিল। একদিন আব্দুল মুত্তালিব একটি স্বপ্ন দেখলেন, স্বপ্নে কেউ তার কাছে সে বলতে লাগলো, “খোঁড়! তায়্যিবা!”, তায়্যিবা মানে হল পবিত্র। আব্দুল মুত্তালিব স্বপ্নের মধ্যেই সাড়া দিলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, “তায়্যিবা কি?” কিন্তু কোন উত্তর পাওয়া যায়নি। সেদিনের মতো স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়। পরের দিন রাতেও তিনি

একই রকম স্বপ্ন দেখেন, সেই একই আওয়াজ তাকে বলতে থাকে, “গর্ত কর, সেই মহার্ঘ্য!” আব্দুল মুত্তালিব বললেন, “কি সেই মহার্ঘ্য?” সে রাতেও তিনি কোন উত্তর পেলেন না। তৃতীয় রাতে সেই একই আওয়াজে তাকে বলল, “যমযম খনন কর।” আব্দুল মুত্তালিব জিজ্ঞাসা করলেন, “যমযম কি?” এবার তিনি উত্তর পেলেন। সেই কণ্ঠস্বরটি এবার বলল, “যমযম একটি কূপ যা কখনো বন্ধ হবে না বা শুকিয়ে যাবে না। এখান থেকে হাজিরা পানি পান করবে। এই কূপ রয়েছে গোবর আর রক্তের মাঝে, এর কাছেই রয়েছে সাদা পা-বিশিষ্ট কাক এবং পিঁপড়ার আবাস।”

এই দুর্বোধ্য সাংকেতিক কথাবার্তার কিছুই আব্দুল মুত্তালিব বুঝতে পারলেন না। পরের দিন সকালে তিনি যখন কাবাঘর তাওয়াফ করছিলেন তখন কাছে সেখানে তিনি গোবর ও রক্ত দেখতে পান। সেগুলো ছিল একটি জবাইকৃত উটের রক্ত আর গোবর। এরপর তিনি সেই একই জায়গায় সাদা পা-বিশিষ্ট একটি কাক এবং একটি পিঁপড়ার বাসা দেখতে পেলেন। অবশেষে তিনি বুঝতে পারলেন যে এই স্থানের কথাই তাকে স্বপ্নে জানানো হয়েছে, এখানেই তার পূর্বপুরুষের যমযম কূপ রয়েছে। এরপর তিনি পুত্র হারিসকে সঙ্গে নিয়ে খোঁড়াখুঁড়ির কাজ শুরু করে দিলেন।

যমযম কূপ আল-কাবা থেকে খুব বেশি দূরে নয়। পিতা পুত্রের এই খোঁড়াখুঁড়ি দেখে লোকজন জড়ো হয়ে যায় এবং তারা জিজ্ঞেস করল, “তোমরা কি করছ? আল-কাবার পাশে এভাবে খোঁড়াখুঁড়ি করছ কেন?” তারা তাদেরকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু আব্দুল মুত্তালিব ও তার পুত্র হারিস খনন কাজ বন্ধ না করে চালিয়ে যেতে লাগলেন। একদিকে পিতা-পুত্র খনন কাজ চালিয়ে যেতে লাগলো, আরেকদিকে লোকজনও তাদেরকে বাধা দিতে লাগলো। আব্দুল মুত্তালিবের এরকম করার কারণ তারা কোনোভাবেই বুঝতে পারছিল না। এক পর্যায়ে তারা তাকে ছেড়ে দিল। তারা ফিরে যাওয়ার সময় আব্দুল মুত্তালিবের চিৎকার শুনতে পেল। লোকেরা দৌড়ে এসে দেখতে পেলে যে আব্দুল মুত্তালিব যমযম কূপের ঢাকনা উন্মোচন করেছেন।

এরপর উপস্থিত কুরাইশের নেতারা এসে বলল যে, “হ্যাঁ হ্যাঁ, এটাই হলো আমাদের পূর্বপুরুষ ইসমাইল (আঃ) এর কূপ।” এ কথার মাধ্যমে তারা ইঙ্গিত দিতে চাইল যে এই কূপের উপর তাদের সবার অধিকার আছে, তাই এই কূপের অংশীদার তারা সবাই। কিন্তু আব্দুল মুত্তালিব বললেন, “আমিই স্বপ্নে এই কূপের খোঁজ পেয়েছি। আমিই এটাকে আবার উন্মোচন করেছি। তাই এই কূপের মালিক আমি।” কিন্তু তারা এটা মানতে চাইল না। তারা বলতে লাগলো যে তারা সবাই ইসমাইল (আঃ) র উত্তরসূরী, তাই তারা সবাই এই কূপের মালিক। এদিকে আব্দুল মুত্তালিব এই কূপের মালিকানা অন্য কারো হাতে দেবেন না বলে মনস্থির করেছেন। দুই পক্ষই তর্কাতর্কি চালিয়ে যাচ্ছিল। তাদের মাঝে যখন এই কূপ নিয়ে প্রায় যুদ্ধ বেধে যাচ্ছিল তখন কেউ একজন প্রস্তাব দিল যে, “নিজেদের মাঝে এরকম মারামারি না করে আমরা বরং বনু সাদের মহিলা জাদুকরের কাছে যাই। সে হয়তোবা আমাদের একটা সমাধান দিতে পারবে।”

বনু সাদের এই মহিলা জাদুকর দাবি করতো যে তার সাথে আত্মার যোগাযোগ আছে। কুরাইশ নেতৃবৃন্দ যমযম কূপ নিয়ে সৃষ্ট সমস্যার সমাধান পাওয়ার আশায় এই মহিলার কাছে গেল। কিন্তু সেখানে গিয়ে জানতে পারলো যে সেই মহিলা সিরিয়া চলে গিয়েছে। তখন তারা আবার আশ-শামের দিকে যাত্রা শুরু করল। যাত্রাপথে তাদের পানি শেষ হয়ে গেল। তখন তারা ছিল মরুভূমির মাঝে। সেখানে পানির কোন ব্যবস্থা ছিল না। এ অবস্থায় আব্দুল মুত্তালিব বাকি

সবাইকে বললেন, "আমাদের মৃত্যু যদি এই নির্জন মরুভূমিতেই ঠিক করা থাকে তাহলে সবার উচিত যার যার কবর খুঁড়ে ফেলা যাতে কেউ একজন মারা গেলে বাকিটা তাকে কবর দিতে পারে। তাহলে অন্তত একজন ছাড়া বাকিদের কবর হবে।" তার কথামতো সবাই যার যার কবর খুঁড়ে ফেলল এবং সেই কবরে শুয়ে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো। কিছুক্ষণ পরে আব্দুল মুত্তালিবই আবার বলে উঠলেন, "নাহ, আমাদের মত পুরুষদের এভাবে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করা মানায় না। তার চেয়ে বরং আমরা সবাই পানির খোঁজে বের হই।" তার সাথে সবাই একমত হলো এবং একেকজন পানির খোঁজে একেকদিকে বেরিয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ পরে আব্দুল মুত্তালিব পানির খোঁজ পেলেন। পানি নিয়ে সঙ্গীদের কাছে ফিরে এলে তারা বলল, "আল্লাহ তাআলা তোমাকে এই মরুভূমিতে পানির সন্ধান দিয়ে রক্ষা করেছেন এবং তিনি তোমাকে যমযম কূপ উন্মোচনের স্বপ্ন দেখিয়েছেন। এসব কিছুই একটি জিনিস নির্দেশ করে; এই কূপ তোমার জন্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একটি অনুগ্রহ আর এই কূপের মালিকানা তোমারই। আমরা আমাদের দাবি ছেড়ে দিলাম। এখন চলো, আমরা মক্কায় ফিরে যাই।"

যখন কুরাইশ নেতারা যমযম কূপের মালিকানার জন্য আব্দুল মুত্তালিবকে চাপাচাপি করছিল, তখন আব্দুল মুত্তালিবর পাশে একমাত্র পুত্র ছাড়া আর কেউ ছিলনা। এ ব্যাপারটি আব্দুল মুত্তালিবকে বেশ ভাবিয়ে তোলে, কেননা গোত্রীয় সমাজে কোন ব্যক্তির শক্তিমত্তা কেমন - তা নির্ধারিত হয় তার পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের সংখ্যাধিক্যের উপরে, যেমন যার যত ছেলে, ভাই, চাচা, কিংবা আত্মীয় - সে তত বেশি শক্তিশালী। আব্দুল মুত্তালিব তখন আল্লাহ তাআলার কাছে এই বলে দোয়া করলেন, "হে আল্লাহ, আপনি যদি আমাকে দশটি পুত্র সন্তান দেন, তাহলে আমি তাদের মধ্য থেকে একজনকে আপনার পথে কুরবানী দেব।" এরপর আল্লাহ তাআলার দয়ায় আব্দুল মুত্তালিব দশটি পুত্র ও ছয়টি কন্যা সন্তান লাভ করলেন। তখন তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে কৃত ওয়াদা পূরণ করার ব্যবস্থা নিলেন। আব্দুল মুত্তালিবসহ কুরাইশের অন্যান্য লোকেরা তাদের সবচেয়ে বড় মূর্তি হুবাল এর কাছে যায়। এই মূর্তির পাশে কিছু তীর ছিল, তীরগুলোকে তারা খুব পবিত্র বলে বিশ্বাস করত, সেগুলোর সাথে ঐশ্বরিক ব্যাপার জড়িয়ে আছে বলে তারা মনে করত। ওই তীরগুলোর গায়ে আব্দুল মুত্তালিবের সব পুত্রের নাম লেখা হয়েছিল। এরপর লটারি করা হলে প্রথমবার উঠলো আব্দুল্লার নাম, দ্বিতীয়বারেও উঠলো আব্দুল্লাহ নাম এবং তৃতীয়বারেও আব্দুল্লার নাম উঠল।

তারপর আব্দুল মুত্তালিব আব্দুল্লাহকে আল-কাবার পাশে নিয়ে গেলেন। তিনি যখন ছুরি বের করে আব্দুল্লাহকে জবাই করতে যাচ্ছিলেন তখন দৌড়ে আসলো তারই আরেক পুত্র আবু তালিব। আবু তালিব তার পিতাকে বলল, "আমরা আপনাকে কাজ করতে দিতে পারি না।" এরপর আবদুল্লাহর মাতৃসম্পর্কীয় আত্মীয়-স্বজনরা এসে বলল, "আপনি যদি এ কাজটা করেন তাহলে তা আপনার উত্তরসূরিদের জন্য করণীয় বলে গণ্য হবে", কেননা আব্দুল মুত্তালিব ছিলেন তাদের নেতা, তিনি কোনো কাজ করলে তা প্রথা হিসেবে দাঁড়িয়ে যায়। কিন্তু আব্দুল মুত্তালিব তাদের আপত্তি মানতে চাইলেন না। তিনি বললেন, "আমি আল্লাহ তাআলার কাছে যে মানত করেছি তা কোনভাবেই ভঙ্গ করতে পারবো না।" এ নিয়ে তাদের মাঝে কথা কাটাকাটি হতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত তারা যখন কোন সমাধানে পৌঁছাতে পারলো না, তখন তারা আবার সেই মহিলা জাদুকরের কাছে বিষয়টি উত্থাপন করার সিদ্ধান্ত নিল।

তারা সেই মহিলার কাছে গেল এবং সবকিছু শুনে সেই মহিলা জাদুকর বলল, "তোমরা আজকে

যাও, আগামীকাল আবার এসো। আমি এর মাঝে আমার আত্মাগুলোর সাথে এ ব্যাপারটি নিয়ে আলোচনা করব।” কুরাইশরা পরদিন তার কাছে উপস্থিত হলো। এর মাঝে মহিলা জাদুকর একটি সমাধান বের করে নিল। মহিলা তাদেরকে জিজ্ঞেস করল, “তোমরা কোন ব্যক্তির রক্তপন কিভাবে আদায় কর? ” তারা বলল, “দশটি উট দিয়ে।” তখন মহিলা বলল, “ঠিক আছে, তাহলে একপাশে দশটি উট ও অপর পাশে আব্দুল্লাহকে রেখে তীর চালনা কর; তীরটি উটের দিকে নির্দেশ করলে উটগুলোকে জবাই করবে আর আব্দুল্লাহর দিকে নির্দেশ করলে পূর্বের উটগুলোর সাথে আরও দশটি উট যোগ করবে।” কুরাইশরা এতে রাজি হল এবং মক্কায় ফিরে গেল।

মহিলা জাদুকর যা যা করতে বলেছিল কুরাইশরা ঠিক তা-ই করলো। তীর যতবার আব্দুল্লাহর দিকে নির্দেশ করছিল ততবার তারা উটের সংখ্যা বাড়াতে লাগলো। এভাবে উটের সংখ্যা বাড়াতে বাড়াতে যখন একশতে পৌঁছল তখন এটি উটের দিকে নির্দেশ করল। কুরাইশের লোকেরা আব্দুল মুত্তালিব কে বলল, “অবশেষে আমরা তোমার ছেলেকে যবাই থেকে বাঁচাতে পারলাম।” কিন্তু আব্দুল মুত্তালিব বলল, “না, এখনো শেষ হয়নি। আমরা আরেকবার লটারি করবো।” তারা আরো দুইবার একই কাজ করলো এবং প্রতিবারই নিক্ষিপ্ত তীর উট বরাবর ছিল। অবশেষে সেই এক শত উট জবাই করা হলো আর আব্দুল মুত্তালিবকে এই উটগুলোর পুরো খরচ একা বহন করতে হয়েছিল। তিনি খুবই দয়ালু ছিলেন, নিজের জন্য গোশত না রেখে সমস্ত উটের গোশত মানুষদের মাঝে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। লোকজন গোশত খেয়ে আবার সাথে করে নিয়েও যাচ্ছিল, কিন্তু তারপরও পশু-পাখিদেরকে খাওয়ানোর মতো যথেষ্ট গোশত উদ্বৃত্ত ছিল। এরপর থেকে আরবদের মাঝে এই কথাটি ব্যাপক বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিল যে আব্দুল মুত্তালিবই হলেন সেই ব্যক্তি যিনি মানুষ ও পশুদেরকে খাইয়েছিলেন, এমনকি আকাশের পাখিদেরকেও খাইয়েছিলেন। কথা সত্য প্রমাণিত হয়েছিল, তারা বলেছিল আব্দুল মুত্তালিব যে কাজ করবে, পরবর্তী আরবদের জন্য তা প্রথা হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। পরবর্তীতে দেখা যায় যে, যে আরবে রক্তপণ হিসেবে ১০টি উট দেওয়া হতো, আব্দুল মুত্তালিবের ১০০টি উট জবাই করার পর সেখানে রক্তপণের মূল্য ১০০ টি উট নির্ধারিত হয়। ইসলামেও এই নিয়মটি বহাল রাখা হয়েছে। অবশ্য এখন আর উট দিয়ে রক্তপন আদায় করা হয় না বরং ১০০ উটের মূল্য মুদ্রার সাপেক্ষে হিসাব করা হয় এবং টাকা দিয়ে তা পরিশোধ করা হয়।

আব্দুল্লাহ ও আমিনা হলেন মুহাম্মদ (সাঃ)র পিতা-মাতা। তাকে বলা হতো, 'তুমি হলে দুই যবীহের সন্তান। তারা হলেন ইসমাইল ও আব্দুল্লাহ।'

আরবের তৎকালীন ধর্মীয় পটভূমি

ইসমাইল (আঃ) ছিলেন আরবের নবী, আর ইসমাইল (আঃ) এর দাওয়াহ ছিল তাওহীদের দাওয়াহ। তাই আরবরা প্রথমত মুসলিমই ছিল, কিন্তু কালের পরিক্রমায় তারা একটা সময় এসে মুশরিক হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর আমলে আরবে মূলত তিনটি ধর্মের প্রচলন ছিল, পৌত্তলিকতা, ইহুদি ও খ্রিস্টধর্ম।

আরবে শির্কের উদ্ভব

আমর ইবন লুহাই আল খুযাই ছিল খুযাআ গোত্রের নেতা। সে ছিল বেশ উদারমনা, ক্ষমতাবান

এক ব্যক্তি। তাকে তার গোত্রের লোকেরা অনেক সম্মান করতো। তারা তাকে এতটাই সম্মান করত যে তার কথাকে আইন হিসেবে মেনে নিত। একবার আমর আশ-শামে (বর্তমান সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, লেবানন এবং জর্ডান) ব্যবসার উদ্দেশ্যে ভ্রমনে যায়। সেখানে সে কিছু মূর্তি দেখে। স্থানীয় লোকদের এগুলোর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তারা তাকে বলে, "মূর্তিগুলো আমাদের এবং আল্লাহর মধ্যে মধ্যস্থতাকারী। আমাদের একেক রকম সমস্যার জন্য আমরা এক এক মূর্তির কাছে সাহায্য চাই। তারা আমাদের হয়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে।" মূর্তিপূজার এই প্রথা আমর ইবন লুহাই আল খুযাইকে অভিভূত করে। তার মনে হল যে, এই মুহূর্তে আরবদের জন্য এমন কিছুই চাই। আরবদের এমন কাউকে দরকার যা তাদের হয়ে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করবে।

আমার ইবন লুহাই আল খুযাই আশ-শামের লোকদের কাছে একটা মূর্তি চাইলো যেন সে মূর্তিটি তার গোত্রের লোকদের কাছে নিয়ে যেতে পারে। তারা তাকে হুবাল নামের এক বিশাল মূর্তি দিল। সে হুবালের মূর্তি নিয়ে মক্কায় ফেরত গেল। হারামে গিয়ে আল কাবার ঠিক পাশে একে স্থাপন করল। তার গোত্রের লোকদেরকে বলল যে মূর্তিটি তাদের হয়ে আল্লাহর সাথে মধ্যস্থতা করবে। মক্কা ছিল আরবের কেন্দ্রবিন্দু, ধর্মীয় ব্যবস্থাপনার মধ্যস্থল। আর এ কারণে মক্কার চারপাশে এই বিদআতটি যেন দাবালনের নেয় ছড়িয়ে পড়ল। মানুষের মাঝে এই ভ্রান্ত প্রথাটি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ার আরেকটি কারণ ছিল ব্যক্তি হিসেবে সমাজে আমর ইবন লুহাই আল খুযাইয়ের গ্রহণযোগ্যতা, তাকে অন্ধভাবে অনুসরণ করতে চাওয়ার প্রবণতা। সে তার গোত্রের অন্যতম সম্মানিত ব্যক্তি ছিল। তাই সবাই তাকে অনুসরণ করতে চাইত। মূর্তি বানানো এবং তা বিভিন্ন গোত্রের কাছে বিক্রি করা মক্কার একটি ব্যবসায় রূপ নিল। বিভিন্ন গোত্র মক্কায় আসতো এবং মানুষ তাদের পছন্দের মূর্তি কিনে চলে যেত। তারা বহণযোগ্য মূর্তি বানানো শুরু করল যাতে মূর্তিগুলো নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করা যায়।

মূর্তি পূজার বিষয়ে উমার (রাঃ) র একটি ঘটনা আছে, একদিন উমারকে দেখা গেল একবার হাসছেন আবার কাঁদছেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো যে কেন তিনি এমন করছেন। তিনি বললেন, "আমি জাহেলি যুগের একটি দিনের কথা ভেবে হাসছি। সেদিন আমি ভ্রমণে বের হয়েছিলাম। হঠাৎ আমার মূর্তিপূজা করার শখ জাগলো। কিন্তু আমার মনে পড়ল যে আমি আমার মূর্তিটি ফেলে এসেছি। তাই আমি উপাসনার অন্য একটি উপায় বের করার চেষ্টা করলাম। তখন আমার সাথে ছিল কিছু খেজুর। আমি সেই খেজুরগুলো দিয়ে একটি মূর্তি বানালাম এবং সেই মূর্তির পূজা করলাম। সেই রাতে আমার অনেক খিদে পায়। তখন আমি খেজুরের তৈরী মূর্তিটি খেয়ে ফেলি।" উমার (রাঃ) পুরনো দিনগুলোর কথা মনে করছিলেন এবং অনুধাবন করছিলেন যে মূর্তি পূজারীরা কত বোকা! এভাবেই ইসলাম মানুষকে বদলে ফেলে। এটাই ইসলামের কারামত। ইসলাম মানুষকে তুচ্ছ অবস্থান থেকে অনেক উঁচু স্থানে উন্নীত করে। উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ) র ব্যাপারে আব্বাস মাহমুদ আল-আক্কাল তার বইয়ে একটি প্রশ্ন তুলেছেন
"ইসলাম ছাড়া উমার ইবনে খাত্তাব কি হতে পারতেন? " এর উত্তরে তিনি ব্যাখ্যা করেন, "তিনি তার গোত্রের প্রধান হতে পারতেন, অথবা তিনি কুরাইশ গোত্রের একজন প্রসিদ্ধ নেতা হতে পারতেন অথবা সর্বোচ্চ তিনি কুরাইশ বংশের নেতা হতেন। তবে তিনি যদি কম বয়সে মারা যেতেন, সেটাই হত তার জন্য প্রত্যাশিত ও স্বাভাবিক ঘটনা। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তিনি মদ্যপানে অভ্যস্ত ছিলেন। এই বদভ্যাসের জন্য তিনি হয়তো অল্প বয়সে অপরিচিত অবস্থায়

মারা যেতে পারতেন। কিন্তু ইসলাম তাকে ও তার অবস্থানকে বদলে দিয়েছে। ইসলাম গ্রহণের কারণে তিনি শুধু সমগ্র আরবের নেতা হননি বরং তিনি পুরো পৃথিবীর দুই তৃতীয়াংশের নেতা হয়েছিলেন। ইসলামের ইতিহাসে তিনি ছিলেন এক অসাধারণ ব্যক্তি।"

মক্কায় মূর্তিপূজা সাধারন একটি স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। বিভিন্ন উদ্দেশ্যের জন্য বিভিন্ন মূর্তি পাওয়া যেত। আল-কাবা এইসব মূর্তি দ্বারা অপবিত্র হয়ে যায়। তখন কাবা শরীফে ৩৬০ টি মূর্তি ছিল। চারদিকে শির্কের ছড়াছড়ি। একটি আমদানি করা মূর্তি থেকে শির্ক সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ল। দিনে দিনে এটি একটি ব্যবসায় রূপ নেয়। এভাবেই ইসমাইল (আঃ) এর আনিত দ্বীনের বিকৃতি ঘটে। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "আমি জাহান্নামে আমর ইবনে লুহাই আল খুযাইকে নাড়িভুঁড়ি ছ্যাঁচড়াতে ছ্যাঁচড়াতে চলতে দেখেছি। কারণ সে-ই আরবে সর্বপ্রথম মূর্তিপূজার প্রচলন করেছিল।"

ইহুদী মতবাদের প্রচলন

ইয়েমেনের রাজা তুব্বান আসআদ ব্যবসার উদ্দেশ্যে আশ-শামে গিয়েছিল। মদিনা অতিক্রম করার সময় সে তার ছেলেকে সেখানে রেখে যায় যেন সে ফিরে আসার আগ পর্যন্ত তার ছেলে মদিনায় ব্যবসা চালিয়ে নিতে পারে। কিন্তু মদিনার কিছু লোক তার ছেলেকে মেরে ফেলে। মদিনায় ফিরে এসে সে তার ছেলের মৃত্যুসংবাদ পায়। এই সংবাদ শুনে সে মদিনাকে ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নেয়, তাই সে মদিনা আক্রমণ করে। তার বিশাল সৈন্যবাহিনীকে মোকাবিলা করার মত মদিনায় তেমন শক্তিই ছিল না। তুব্বান চাইলে মদিনাকে ধুলায় মিশিয়ে দিতে পারতো, কিন্তু সে সময় হঠাৎ মদিনায় দুইজন ইহুদী পন্ডিতের আগমন ঘটে।

রোমানরা জেরুজালেম দখল করার পর ইহুদীরা উদ্বাস্তু হয়ে গিয়েছিল। তখন তাদের মধ্যে কেউ কেউ শেষ নবীর খোঁজে আরবে চলে আসে। তাদের ধর্মগ্রন্থে শেষ নবীর আগমনের কিছু লক্ষণ ছিল, তারা মদিনায় সেই লক্ষণগুলো দেখতে পায়। তাই তারা মদিনায় বসতি স্থাপন করে। সেখানে বাস করত তাদের তিনটি গোত্র - বনু কায়নুকা, বনু নাযির ও বনুক কুরায়যা। ইহুদি পন্ডিতরা তূব্বান আসআদের কাছে গিয়ে বলে, "দেখুন এই স্থানটি আল্লাহ তায়ালা সুরক্ষিত করে রেখেছেন, যদি আপনি মদিনাকে ধ্বংস করার চেষ্টা করেন তবে আল্লাহ আপনাকে ধ্বংস করে দেবেন।" তারা এ কথা সে কথা বলে শেষ পর্যন্ত তুব্বানকে বুঝাতে সক্ষম হয় যে মদিনা আক্রমণ করলে তুব্বান ভুল করবে। তাদের কথায় তুব্বান এতটাই প্রভাবিত হয় যে, সে শুধুমাত্র মদিনা আক্রমণ থেকেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং তার ইহুদি ধর্ম ভালো লেগে যায় এবং সেই ইহুদিদের ধর্ম গ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করে। এরপর সে সেই পন্ডিতদেরকে ইয়েমেনে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করে! তারা রাজি হয় এবং অবশেষে তুব্বান ইহুদী ধর্ম গ্রহণ করে।

সেই সময় হাওয়াযিন এবং কুরাইশ গোত্রের মধ্যে বিরোধ চলছিল। হাওয়াযিন গোত্রের লোকেরা মক্কা ও তুব্বান আসআদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করার প্রয়াস চালিয়ে আসছিল এবং তারা এই উদ্দেশ্য পূরণে সফলও হয়। তুব্বান মক্কা আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয়। তখন ইহুদী পণ্ডিতরা আবার তাকে বলল যে আল্লাহ তা'আলা মক্কাকেও সুরক্ষিত করে রেখেছেন। তাই মক্কায় আক্রমণ করার বদলে তুব্বানের মক্কা যাওয়া উচিত এবং কাবা শরীফ তাওয়াফ করা উচিত। তুব্বান ইহুদি পন্ডিতদের সাথে মক্কায় গিয়ে কাবা শরীফ তাওয়াফ করার জন্য অনুরোধ করে। কিন্তু তারা সেখানে যেতে অস্বীকৃতি জানায়। কারণ ইহুদি আলেমদের জন্য কাবা তাওয়াফ করা সমীচীন হবে না কেননা কাবা তখন মূর্তি দ্বারা পরিবেষ্টিত। সুতরাং তুব্বান একাই মক্কায় যায় এবং কাবা শরীফ তাওয়াফ

করে। তুব্বান সর্বপ্রথম কাবা শরীফকে চাদর দিয়ে আবৃত করে। সে প্রতি বছর একবার কাবার চাদর পরিবর্তন করত। পূর্বে তারা একটি চাদরের উপর অন্য চাদর বিছিয়ে দিত। তারা মনে করত যে, কাবার চাদর অনেক পবিত্র তাই এটি সরানো ঠিক হবে না। এই নিয়ম ততদিন বলবৎ থাকে যতদিন না অনেকগুলো চাদর কাবা শরীফের জন্য অতিরিক্ত ভারী হয়ে গিয়েছিল। অবশেষে তারা কাবার চাদর অপসারণের সিদ্ধান্ত নেয়। তুব্বান আসআদ ইহুদি পন্ডিতদের নিয়ে ইয়েমেনে চলে যায় এবং সেখানে তাদেরকে ইহুদী মতবাদ প্রচারের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা এবং উৎসাহ দেয়। বেশিরভাগ গোত্র এই মতবাদ গ্রহণ করে। সুতরাং তখনকার সময়ে দুই ধরনের ইহুদি ছিল। একদল ছিল জাতিগতভাবে ইহুদি, এরা মূলত খায়বার ও মদিনায় বসবাস করত, আরেক দল ছিল বিশ্বাসগতভাবে ইহুদি, এরা বসবাস করত ইয়েমেনে। এ থেকে বোঝা যায়, এক সময় ইহুদীরা তাদের ধর্ম প্রচার করত যা তারা এখন আর করে না। এভাবেই আরবে ইহুদী মতবাদের প্রসার ঘটেছিল।

খ্রিস্টধর্মের আগমন

ঈসা (আঃ) এর পর পর্যায়ক্রমে খ্রিস্ট ধর্মের বিভিন্ন শাখা প্রশাখার সৃষ্টি হয় এবং ধীরে ধীরে অনেক অনুসারী ধর্মচ্যুত হয়। খুব কম সংখ্যক লোকই অবশিষ্ট ছিল যারা সত্যিকার অর্থে এই ধর্মের প্রকৃত অনুসরণ করতো। পরবর্তীতে তারাই পুনরায় খ্রিস্ট ধর্ম পুনরুজ্জীবিত করতে সক্ষম হয়। ঈসা (আঃ) র ধর্মের মূল বক্তব্য ছিল বিশুদ্ধ তাওহীদ।

সেই অনুসারীদের মধ্যেই একজন একবার ইয়েমেনে যান এবং সেখানে নাযরান নামক এক এলাকায় খ্রিস্ট ধর্ম প্রচার করা শুরু করেন। সেখানে অনেক গোপনে এবং ধীরে ধীরে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের কাজ চলছিল। ততদিনে তুব্বান আসআদ মারা যায়। আর ইয়েমেনের রাজা ছিল তার ছেলে যু নাওয়াস। নতুন এই ধর্মের কথা তার কানে পৌঁছলে সে এটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে এবং এর অনুসারীদের ক্রূশবিদ্ধ করে হত্যা করে।

আসহাবুল উখদুদের গল্প

সহীহ মুসলিমে এই সংক্রান্ত একটি কাহিনী বর্ণিত আছে, গল্পটি এক রাজা ও এক কমবয়সী ছেলেকে ঘিরে। অনেক আলিম গল্পটিকে রাজা যু নাওয়াস এবং ইয়েমেনের তাওহীদবাদী খ্রিস্টানদের ঘটনা হিসেবে বর্ণনা করে থাকেন। ঘটনাটি এমন:

এক রাজা ছিল, সে জাদুবিদ্যা চর্চা করত এবং তার উপদেষ্টাও ছিল জাদুকর। কালের পরিক্রমায় একসময় জাদুকর বার্ধক্যে উপনীত হয়। সে রাজাকে বলে, “আমার তো সময় শেষ হয়ে আসছে, আমি যে কোন মুহূর্তে মারা যেতে পারি। তাই আমি একজনকে এই যাদুবিদ্যা শিখিয়ে যেতে চাই যেন আমি মারা যাওয়ার পর সে আমার অভাব পূরণ করতে পারে।” তারা জাদুকরের উত্তরসূরীর সন্ধান করতে থাকে। অতঃপর তারা এক বালককে সেই জাদুকরের ছাত্র হিসেবে মনোনীত করে। ছেলেটি খুব সকালে তার বাড়ি থেকে জাদুকরের কাছে জাদুবিদ্যা শিখতে যেত এবং রাতে নিজ বাড়িতে ফিরে যেত।

একদিনের ঘটনা, জাদুকরের বাড়ির দিকে যাওয়ার পথে ছেলেটি দেখলো একটি ইবাদতখানা, তার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সেখানে প্রার্থনার আওয়াজ শুনতে পেল। ছেলেটির কাছে এই ইবাদাত একটু অন্যরকম ঠেকল, সে ঠিক এই ধরনের ইবাদাতের সাথে পরিচিত ছিল না। সে জায়গাটি ঘুরে দেখার সিদ্ধান্ত নিল। বস্তুত, এটি ছিল তাওহীদের গির্জা। সেখানে ঈসা (আঃ) আনীত সত্য ধর্মের দাওয়াত দেওয়া হতো। সেখানে এক লোকের কাছে সে খ্রিস্টান ধর্মের

ব্যাপারে জানতে পারল এবং তা তাকে অভিভূত করল। কিন্তু ওই সময়ে তার জাদুকরের কাছ থেকে জাদু শিখার কথা ছিল। ছেলেটি বুঝতে পারছেন না সে কি করবে - এখানে থাকবে নাকি জাদুকরের কাছে চলে যাবে, গির্জার ধর্মযাজককে জিজ্ঞাসা করল যে এই ব্যাপারে তার কি করনীয়। তিনি তাকে প্রতিদিন সকালে তার কাছে এসে শিক্ষা গ্রহণের পরামর্শ দিলে এবং তারপর যাদুকরের কাছে যেতে বললেন। যদি যাদুকর দেরি করে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করে তাহলে সে যেন বলে, "আমার পিতা মাতার জন্য দেরি হয়েছে।" তিনি তাকে আরও বললেন বাড়ি ফেরার আগে সে যেন আবার গির্জা হয়ে যায়। যদি তার পিতামাতা বাড়িতে দেরি করে ফেরার কারণ জানতে চায় তাহলে সে যেন বলে যে জাদুকর তাকে দেরি করিয়ে দিয়েছে।

এভাবে সে অল্পবয়স্ক ছেলেটির দিন কাটতে লাগলো, সে জাদুকরের কাছে যাওয়ার আগে এবং বাড়ি ফেরার পথে গির্জা থেকে দীক্ষা নিয়ে যায়। একদিন একটি ঘটনা ঘটলো, এক ভয়ানক জন্তু বাজারে ঢুকে পড়ল এবং বাজারে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করল। কেউ যন্ত্রটিকে থামাতে পারছিল না। তখন ছেলেটি বলল, "হে আল্লাহ। আমি আজকে জানতে চাই যে ধর্মযোজক এবং জাদুকর, এই দুজনের মধ্যে কে সঠিক পথের উপর আছে। হে আল্লাহ। আমাকে সঠিক পথ দেখিয়ে দাও।" সবাই জন্তুটিকে হত্যা করার চেষ্টা কর কিন্তু কেউ সফল হলো না। ছেলেটি একটি পাথর হাতে নিয়ে বলল, "হে আল্লাহ। যদি গির্জার ধর্মযাজক সত্য পথের উপর থাকে তাহলে এই পাথর দ্বারা জন্তুটিকে মেরে ফেলো।"

সে সেই জন্তুটির দিকে পাথর ছুড়ে মারলো এবং জন্তুটির সাথে সাথে মারা গেল। ধর্মযাজকের কাছে গিয়ে ছেলেটি সবকিছু খুলে বলল। সবকিছু শুনে তিনি বললেন, "তুমি আজকে অনেক উঁচু পর্যায়ে উন্নীত হতে পেরেছ। এখন তোমাকে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে।"

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তায়ালার পরীক্ষা ছাড়া কেউ উঁচু মর্যাদার অধিকারী হতে পারে না। আল্লাহ তাআলা এই পৃথিবীতে পরীক্ষা করার জন্য মানুষদের পাঠিয়েছেন। আর সবাইকে তাদের নিজ নিজ যোগ্যতা অনুসারে পরীক্ষা করা হবে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হন নবীগণ। এরপর পর্যায়ক্রমে যোগ্যতা অনুসারে সবার পরীক্ষা নেওয়া হয়।"

ধর্মযাজক বালকটিকে বলেছিলেন যে, সে শীঘ্রই কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হবে তিনি আরো বললেন যে, "যখন পরীক্ষার সময় আসবে তখন তুমি আমার নাম কারো কাছে প্রকাশ করে দিও না।" তিনি ভয় পেয়ে নিজের নাম প্রকাশ করতে চাননি - বিষয়টা এমন ছিল না। যেহেতু তার দাওয়াহর পুরো কার্যক্রমটাই গোপনে পরিচালিত হচ্ছিল তাই তিনি সাবধানতা অবলম্বনের জন্য এমনটি করেছেন।

অন্যদিকে, রাজার একজন অন্ধ উপদেষ্টা ছিল। তিনি এই বালকের কাছে আরোগ্য লাভের উদ্দেশ্যে গেলেন। এই বালক ততদিনে সবার কাছে বেশ পরিচিতি লাভ করেছিল এবং সবাই তার কাছে বিভিন্ন সাহায্যের জন্য আসতো। যখন রাজার উপদেষ্টা বালকের কাছে গেল, সে বলল, "আমি নই, বরং আল্লাহ তাআলাই আপনাকে সুস্থ করে তুলতে পারবেন।" অতঃপর সে আল্লাহর সাহায্যে লোকটির অন্ধত্ব দূর করে দিলো। সুস্থ হওয়ার পর লোকটি রাজার কাছে গেলে রাজা তাকে জিজ্ঞেস করল, "কে তোমাকে সুস্থ করল?" লোকটি বলল, "আল্লাহ।" তখন রাজা বলল, "কি! আমি ছাড়া তোমার আর কি কোন রব আছে?" লোকটি উত্তর দিল, "হ্যাঁ আছে। আল্লাহ আমার রব এবং আপনারও।"

এরপর রাজা তার এই উপদেষ্টাকে অনেক অত্যাচার করলো যাতে সে ওই ব্যক্তির নাম প্রকাশ

করে যে তাকে এই শিক্ষা দিয়েছে। অনেক অত্যাচারের পর সে ছেলেটির নাম প্রকাশ করে দিল। ছেলেটিকে গ্রেপ্তার করা হল, তাকেও অনেক নির্যাতন করা হলো। সে অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে তার শিক্ষকের নাম বলে দিতে বাধ্য হল। এরপর ধরে আনা হলো বালকের দীক্ষাগুরু সেই ধর্মযাজককে। তাকে তার ধর্ম ত্যাগ করতে বলা হলো, কিন্তু তিনি রাজি হলেন না। এরপর তারা একটি করাত এনে তার মাথার ওপর রাখল এবং তাকে কেটে দু'ভাগ করে ফেলল। কিন্তু তবুও তিনি তার দ্বীন ত্যাগ করতে রাজি হননি। অদম্য সাহসিকতার এক অদ্ভুত দৃষ্টান্ত!

বাকি থাকল সেই ছেলেটি। রাজা ছেলেটিকে পাহাড়ের উপর থেকে ছুড়ে ফেলে দেওয়ার আদেশ করলো। ছেলেটি আল্লাহর কাছে দুআ করলো, "হে আল্লাহ! তুমি যেভাবে ভালো মনে কর সেভাবেই আমাকে ওদের হাত থেকে রক্ষা কর।" সে পুরোপুরিভাবে আল্লাহর উপর ভরসা করলো। তারা ছেলেটিকে নিয়ে পাহাড়ের উপরে গেল। সেখানে পৌঁছানো মাত্রই পাহাড়টি কেঁপে উঠল এবং ছেলেটি ছাড়া বাকি সব সৈন্য পাহাড় থেকে পড়ে গেল। এরপর ছেলেটি রাজার প্রাসাদে ফিরে গেল। রাজা তখন অন্য আরেকদল সৈন্যকে আদেশ দিল যে তাকে যেন গভীর সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয়। তারা নৌকা করে সমুদ্রে গেল এবং সে পুনরায় একই দোয়া করল, "হে আল্লাহ। তুমি যেভাবে ভালো মনে কর সেভাবেই আমাকে ওদের হাত থেকে রক্ষা কর।" হঠাৎ মাঝপথে নৌকাটি উল্টে গেল এবং সে ছাড়া সবাই ডুবে মারা গেল। সে আবার রাজার কাছে ফিরে গেল।

পুনরায় রাজা ছেলেটিকে মারতে চাইলো এবং সে আরও একদল সৈন্য নিয়োগ দিল। সে ছেলে তাকে বলল, "আপনি আমাকে রশি দিয়ে একটি গাছের সাথে বেঁধে সেখানে সবাইকে জড়ো করেন। তারপর আপনি আপনার তীর নিয়ে বলবেন - বিসমিল্লাহ! এই বালকের রবের নামে। এই কাজ করলে আপনি আমাকে মেরে ফেলতে পারবেন।" অর্থাৎ ছেলেটি রাজাকে বলে দিল কীভাবে তাকে মেরে ফেলতে হবে।

ফিদায়ী বা আত্মোৎসর্গমূলক হামলা বা অভিযানের বৈধতার পক্ষের বিভিন্ন দলিলের মধ্যে এই ঘটনাটি প্রমাণ হিসেবে উত্থাপন করা হয়। আল্লাহ তাআলার খাতিরে নিজের জীবন উৎসর্গ করা নিঃসন্দেহে একটি বৈধ কাজ, তবে কখন এবং কোথায় এই কাজটি করা যাবে সেই ব্যাপারে অবশ্যই কিছু বিধি-নিষেধ আছে। কারণ এই ঘটনায় দেখা যাচ্ছে ছেলেটি রাজাকে বলে দিয়েছিল যে কিভাবে তাকে মেরে ফেলা সম্ভব। ছেলেটি এই কাজ করেছে একটি মহৎ উদ্দেশ্যে।

রাজা ছেলেটির বলে দেয়া পদ্ধতি অনুসরণ করল। "বিসমিল্লাহ! এই ছেলের রবের নামে" - এই কথা বলে সর্বসমক্ষে রাজা তার দিকে তীর নিক্ষেপ করল। তীরটি সরাসরি ছেলেটির মাথায় বিঁধে যায়। ফলে সে সাথে সাথে মারা যায়। এটা দেখে ঘটনাস্থলের সবাই মুসলিম হয়ে যায়। ছেলেটি নিজের জীবন বিসর্জন দিল যেন অন্যের জীবন বাঁচতে পারে, আর বেঁচে থাকার অর্থ তো একমাত্র ইসলামের মধ্যেই নিহিত। যে জীবনে ইসলাম নেই, সেই জীবনের কোন মূল্য নেই। নিজের মৃত্যুর মাধ্যমে সে একদল মানুষকে ইসলামের দিকে আহবান করে গেল।

অতঃপর রাজার উপদেষ্টারা তাকে বলল, "হায় হায়! আপনি যা আশঙ্কা করছিলেন তাই ঘটলো।" ছেলেটিকে রাজা মেরে ফেলতে চেয়েছিল যেন তার দ্বীন মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে না পারে, অথচ এখন সবাই ছেলেটিকে মারা যেতে দেখে মুসলিম হয়ে গেল, রাজার পরিকল্পনা পুরোপুরি ব্যর্থ হল। রেগে রাজা যু নাওয়াস একটি বড় গর্ত করার জন্য তার সৈন্যদের আদেশ দেয়। তারপর সেই গর্তে কাঠ রেখে তাতে আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হয়। লোকদেরকে বলা হল তাদের

নতুন ধর্ম পরিত্যাগ করতে। যারা অস্বীকৃতি জানালো তাদের সবাইকে ধরে ধরে এই আগুনে পুড়িয়ে মারা হলো। অনেক মানুষকে সেই জ্বলন্ত আগুনে সেদিন জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। এরা আল্লাহর প্রতি তাদের বিশ্বাসকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করেছিল। তারা পিছু হটেনি, ছাড়ও দেয়নি। গল্পের শেষটা অসাধারণ! রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, “একজন মহিলা আগুনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, তার কোলে ছিল তার বাচ্চা। বাচ্চাটির জন্য সেই মুহূর্তের জন্য দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তখন সেই কোলে শিশুটি বলে ওঠে, “মা! আপনি শান্ত হোন কারণ আপনি সত্য পথে আছেন', আর এই কথা শুনে মহিলা নির্ভিক চিত্তে আগুনে ঝাঁপ দেন।” রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আরো বলেন, 'তিনজন শিশু আছে যারা (অলৌকিকভাবে) শিশু বয়সে কথা বলে উঠেছিল। এই শিশুটি তাদেরই একজন।”

সূরা আল-বুরুজে এই ঘটনা বর্ণিত আছে। তাদেরকে জীবন্ত আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল, কিন্তু বস্তুত তারা মৃত্যুর মাধ্যমে নতুন জীবন লাভ করেছে। মনে হতে পারে যে, এখানে রাজা বিজয়ী হয়েছে, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা বলছেন ভিন্ন কথা, তিনি বলেছেন,

وَالسَّمَاء ذَاتِ الْبُرُوجِ ○ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ○ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ○ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ ○ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ○ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ○ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ○ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ○ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ○ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ○ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ○ (سورة البروج - ١~١١)

“শপথ গ্রহ-নক্ষত্র শোভিত আকাশের, এবং প্রতিশ্রুত দিবসের, এবং সেই দিবসের, যে উপস্থিত হয় ও যাতে উপস্থিত হয়। অভিশপ্ত হয়েছে গর্ত ওয়ালারা অর্থাৎ, অনেক ইন্ধনের অগ্নিসংযোগকারীরা; যখন তারা তার কিনারায় বসেছিল। এবং তারা বিশ্বাসীদের সাথে যা করেছিল, তা নিরীক্ষণ করছিল। তারা তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিল শুধু এ কারণে যে, তারা প্রশংসিত, পরাক্রান্ত আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, যিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের ক্ষমতার মালিক, আল্লাহর সামনে রয়েছে সবকিছু। যারা মুমিন পুরুষ ও নারীকে নিপীড়ন করেছে, অতঃপর তওবা করেনি, তাদের জন্যে আছে জাহান্নামের শাস্তি, আর আছে দহন যন্ত্রণা, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্যে আছে জান্নাত, যার তলদেশে প্রবাহিত হয় নির্ঝরিণীসমূহ। এটাই মহাসাফল্য! ” (সূরা বুরুজ: ১~১১)

আল্লাহ তাআলা কেন এমন একদল মানুষকে বিজয়ী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন যারা আগুনে পুড়ে মারা গিয়েছে? প্রকৃত বিজয় দুনিয়াবি শক্তির বিজয় নয়, বরং প্রকৃতি বিজয়ী তারাই, যারা জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সত্য আদর্শের উপরে, নিজ বিশ্বাসের উপর অটল থাকে। জান্নাতে প্রবেশ করতে পারাই হচ্ছে বিজয়, আর তাই শহীদরা অবশ্যই বিজয়ী, যদিও তারা অত্যাচার নির্যাতনের শিকার হন বা কষ্ট ভোগ করেন।

সেদিন সব মুসলিমকে হত্যা করা হলেও তাদের মধ্যে একজন বেঁচে যান, তিনি রোমান সম্রাটের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করেন, কারণ সেই সম্রাট ছিল খ্রিস্টান। খ্রিস্টানরা তৎকালীন সময় বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত ছিল, কেননা ততদিনে রোমান খ্রিস্টানরা ত্রিতত্ববাদ ও ঈসা (আঃ) কে ঈশ্বর হিসেবে বিশ্বাস করতে শুরু করে তাদের ধর্মকে বিকৃত করে ফেলে! এই কারণে বিভিন্ন ফিরকার উদ্ভব হয়। সেই বেঁচে যাওয়া মানুষটি রোমান সম্রাটের কাছে গিয়ে তাদের অবস্থার কথা বুঝিয়ে বললেন এবং রোমান সম্রাটের কাছে সাহায্য চাইলেন। রোমান সম্রাট তখন বলল, “আমরা ইয়েমেন থেকে অনেক দূরে আছি। তবে আমি যা করতে পারি, তোমাদের অবস্থার কথা জানিয়ে

আমি আবিসিনিয়ার নাজ্জাশির কাছে সংবাদ পাঠাতে পারি, আশা করি সে তোমাদের সাহায্য করতে পারবে।" তখন আবিসিনিয়ার নাজ্জাশিও খ্রিস্টান ছিলেন। তাই রোমান সম্রাট তার কাছে খবর পাঠালো।

অতঃপর নাযাশি তার সেনাপতি আরইয়াতের নেতৃত্বে একদল সৈন্য পাঠান। তারা ইয়েমেনে আক্রমণ করে যু নাওয়াসের সাথে যুদ্ধ করে। যুদ্ধে যু নাওয়াস পরাজিত হয় এবং লোহিত সাগরে ঝাপ দিয়ে আত্মহত্যা করে। ইয়েমেনের কিছু অংশে তখন আবিসিনিয়ার শাসন শুরু হয়। প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যে তারা এই আক্রমণ পরিচালনা করে কারণ ইয়েমেনের ইহুদিরা খ্রিস্টানদের হত্যা করেছিল। আরইয়াত কিছুদিনের জন্য ইয়েমেন শাসন করে। এমন সময় আরইয়াতের এক সেনাপতি তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসে এবং এই বিদ্রোহের ফলে ইয়েমেনে বসবাসরত আবিসিনিয়ানরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে যায়। একদল ছিল আরইয়াতের পক্ষে এবং অন্য দল ছিল বিদ্রোহী সেনাপতি আবরাহার পক্ষে। দল দুটি পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে।

আরইয়াত আবরাহাকে বলে, "আমরা যদি দুই দল মিলে যুদ্ধ করি তাহলে ইয়েমেনের লোকেরা আমাদের হাত থেকে ইয়েমেন ছিনিয়ে নেবে। কেমন হয় যদি শুধু আমরা দুজন একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি?" আবরাহা রাজি হয়, কিন্তু সে একটি চক্রান্ত করে। সে গোপনে তার কয়েকজন দেহরক্ষীর সাথে আরইয়াতের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করল যে, যদি তারা আবরাহাকে হারতে দেখে তবে তারা যেন তাকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসে। বর্ণনামতে আরইয়াত ছিল লম্বা এবং সুঠাম দেহের অধিকারী। অন্যদিকে আবরাহা ছিল খাটো এবং স্থূলকায়। তারা যখন একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিল তখন চারপাশে অনেক মানুষ যুদ্ধ দেখছিল। যুদ্ধের প্রথমেই আরইয়াত আবরাহাকে আক্রমণ করে এবং একপর্যায়ে তার নাক কেটে ফেলে। এমন অবস্থায় আবরাহার একজন রক্ষী এগিয়ে এসে আরইয়াতকে মেরে ফেলে। এভাবেই আবরাহা ইয়েমেনের শাসন ক্ষমতা দখল করে।

আবরাহার বাহিনী ও 'হাতির বছর'

আবরাহা ইয়েমেন দখল করে নিয়ে সেখানে শাসন করা শুরু করে। সে সবাইকে খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত করতে চাচ্ছিল। কাবাঘরের প্রতি আরবদের বিশেষ দুর্বলতা ছিল, তাই সে এই দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে কাবার অনুরূপ 'আল-কালিস' নামের একটি চমৎকার গির্জা নির্মাণ করে। কাবার সাথে প্রতিযোগিতা করার উদ্দেশ্যে এই গির্জা বানানো হয়েছিল। কিন্তু এই কাজটি আরব গোত্রগুলোর পছন্দ হয়নি। একদিন রাতের অন্ধকারে একজন গির্জায় গিয়ে মলত্যাগ করে এবং গির্জার দেওয়ালে মল ছুঁড়ে নোংরা করে পালিয়ে যায়। এই ঘটনায় আবরাহা প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়। সে কাবা আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয়। আবরাহা তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে মক্কার দিকে অভিযান শুরু করে। কিন্তু পথিমধ্যে তাকে কিছু বাধার সম্মুখীন হতে হয়। নুফাইল নামের একজন গোত্রনেতা তার বিরোধিতা করে তাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু সে আবরাহার কাছে হেরে যায় এবং যুদ্ধবন্দী হয়।

আবরাহা আত-তাইফে পৌঁছানোর পর সেখানকার লোকেরা তাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা করে, কেননা কুরাইশদের সাথে তাইফবাসীর শত্রুতা ছিল। তাইফের এক লোক আবরাহার বাহিনীকে পথ দেখানোর জন্য রাজি হয়, কিন্তু তাইফ থেকে বের হওয়ার সাথে সাথে সে মারা যায়।

আবরাহা আরবের সিমান্ত পর্যন্ত পৌঁছালো। সেখানে একটি চারণভূমিতে কিছু মেষ এবং উট চড়ছিল। আবরাহা সেগুলো দখল করে নেয়। এই মেষ এবং উটগুলো ছিল রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর দাদা আব্দুল মুত্তালিবের।

আব্দুল মুত্তালিব আবরাহার সাথে দেখা করতে গেলেন। অন্যদিকে আব্দুল মুত্তালিব ছিলেন নুফাইলের বন্ধু। নুফাইল আবরাহার কাছে বন্দী ছিলেন। বন্দী অবস্থাতেই নুফাইলের সাথে উনাইস নামের এক ব্যক্তির বন্ধুত্ব হয়। উনাইস ছিল আবরাহার বাহিনীর হস্তিচালক। আব্দুল মুত্তালিব নুফাইলের সাথে দেখা করে তাকে বলেন যে তিনি আবরাহার সাথে দেখা করতে এসেছেন। নুফাইল উনাইসের সাথে কথা বলে আবরাহার সাথে আব্দুল মুত্তালিবের দেখা করার বন্দোবস্ত করে দেন। উনাইস আবরাহার সাথে আব্দুল মুত্তালিবের সাক্ষাৎ করিয়ে দেয়। আবরাহা তাকে সাদরে অভ্যর্থনা জানায়।

বর্ণনানুসারে আব্দুল মুত্তালিব ছিলেন সুপুরুষ এবং ব্যক্তিত্বের অধিকারী, তাকে দেখে যে কোন মানুষের মনে শ্রদ্ধার উদ্রেক ঘটবে। আব্দুল মুত্তালিব কে দেখার সাথে সাথেই আবরাহা খুব সম্মানের সাথে তাকে স্বাগত জানায়, যদিও তখনও আব্দুল মুত্তালিবের সাথে আবরাহার কথা হয়নি। আবরাহা ছিল রাজা, তার সাথে কেউ দেখা করতে আসলে সে অনেক উঁচু একটি সিংহাসনে বসত এবং বাকিরা নিচে তার পায়ের কাছে বসত। কিন্তু সে আব্দুল মুত্তালিবকে দেখার পর তাকে পায়ের কাছে বসানো পছন্দ করলো না। সে চাইলে আব্দুল মুত্তালিব কে তার সিংহাসনে বসার জন্য বলতে পারতো, কিন্তু তা না করে আবরাহা আব্দুল মুত্তালিবের সাথে মেঝেতে বসলো এবং তার দোভাষীর মাধ্যমে জানতে চাইল যে তিনি কি চান।

কোন রাখঢাক না রেখে আব্দুল মুত্তালিব দোভাষীকে সরাসরি বললেন, 'আবরাহা আমার দুশ উট লুট করেছে। আমি তা ফেরত নিতে এসেছি।'

- প্রথম দেখায় তোমার প্রতি আমার যে শ্রদ্ধা জাগ্রত হয়েছিল তা নষ্ট হয়ে গেছে। আমি এসেছি তোমার এবং তোমার পূর্বপুরুষদের লাঞ্ছিত করতে, তোমাদের দেশ ধ্বংস করতে। আমি তোমাদের পূর্বপুরুষদের বানানো আল-কাবা ভেঙে দিতে চাই। আর তুমি কিনা এসেছো আমার কাছে উট চাইতে?

- এই উটের মালিক আমি, তাই আমি আমার উট নিয়ে যেতে এসেছি। কাবা ঘরের মালিক স্বয়ং আল্লাহ তাআলা। তাই আল্লাহই এর রক্ষণাবেক্ষণ করবেন।

অতঃপর আবরাহা আব্দুল মুত্তালিব এর উট ফিরিয়ে দেওয়ার আদেশ দিল। আব্দুল মুত্তালিব মক্কায় ফিরে গেলেন আর তার গোত্রের লোকদের বললেন, "আবরাহা সাথে যুদ্ধ করো না, মক্কা থেকে পালিয়ে যাও।" আব্দুল মুত্তালিব পরিষ্কারভাবে সবাইকে পরিস্থিতির কথা জানিয়ে দিলেন। সবাই মক্কা ছেড়ে পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নেয়। আব্দুল মুত্তালিব সবার শেষে মক্কা ত্যাগ করেন। যাবার পূর্বে তিনি কাবার চাদর জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে আল্লাহর নিকট দোয়া করেন যেন আল্লাহ তাআলা তার ঘরকে রক্ষা করেন। তারপর তিনিও মক্কা থেকে চলে যান।

আবরাহা তার সৈন্যদলকে কাবার অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার আদেশ দেয় কিন্তু হাতিগুলো কিছুতেই সামনে এগোচ্ছিল না। হাতি চালকরা তাদের হাতিগুলো অন্য কোন দিকে চালনা করলে হাতিগুলো সেদিকে দৌড়ে যেত। কিন্তু তাদেরকে মক্কার দিকে ঠেলা হলে তারা সেখানেই বসে পড়তো। এটা ছিল আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কারামত। বলা হয়ে থাকে উনাইস নামের সেই লোকটি হাতির কানের কাছে গিয়ে বলেছিল, "এটা আল্লাহর ঘর, একে আক্রমণ করোনা"

- এই বলে সে পালিয়ে গিয়েছিল। যাই হোক, কোন না কোন কারণে হাতিগুলো কাবার দিকে এগোচ্ছিল না।

তারা হাতি গুলোকে মারতে লাগলো, তাদের বল্লম দিয়ে খোঁচা দিয়ে রক্তাক্ত করে ফেলল কিন্তু তবুও হাতিগুলো কাবার দিকে এক চুল পরিমাণ নড়লো না। অবশেষে তারা হাতিগুলোকে পিছনে ফেলে সামনে এগোনোর সিদ্ধান্ত নেয়। আল্লাহ তাআলা এবার তার সৈন্যবাহিনী পাঠালেন। যেকোনো কিছুই আল্লাহর সৈন্য হতে পারে; পানি, বাতাস, জীব-জন্তু। আল্লাহ তাআলা এবার সৈন্য হিসেবে প্রেরণ করলেন একদল পাখি। সবগুলো পাখি পায়ে একটি করে পাথরের নুড়ি নিয়ে আবরাহার বাহিনীর দিকে উড়ে গেল এবং পাথর ছুড়ে তারা নিমেষেই আবরাহার বাহিনীকে ধ্বংস করে ফেলল। সূরা আল-ফীলে এই ঘটনা বর্ণিত আছে।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) র জন্মের বছরে এই ঘটনা ঘটেছিল। তাই তার জন্মের বছরকে 'হাতির বছর' বলা হয়।

রাসুল (সাঃ)-এর জন্ম ও প্রাক-নবুওয়তি জীবনের চল্লিশ বছর

পৃথিবীতে রাসুল (সাঃ) এর আগমন

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) মক্কার বিখ্যাত বনু হাশিম গোত্রে নয় রবিউল আউয়াল সোমবার সুবহে সাদিকে জন্মগ্রহণ করেন। সেই বছরটি ছিল বাদশা নওশেরওয়ার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার ৪০তম বছর। নবীজি (সাঃ) বলেছেন,"যখন আমার জন্ম হয়েছিল, তখন আমার শরীর থেকে এক বিশেষ আলো বের হয়েছিল-যাতে শাম-দেশের অট্টালিকা সমূহ আলোকিত হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর জন্মের সময় বেশ কিছু ঘটনা নবুয়তের পূর্বাভাস হিসেবে প্রকাশিত হয় যেমন : কিসরার প্রাসাদের সৌধ চূড়াগুলো ভেঙ্গে পড়ে যায়। প্রাচীন পারসিক যাজকমন্ডলীর উপাসনাগারগুলোতে যুগ যুগ ধরে প্রচলিত হয়ে আসা অগ্নিকুণ্ডগুলো নিভে যায়। বোহায়রা পাদ্রীদের সরগরম গির্জা গুলো নিস্তেজ ও নিস্প্রভ হয়ে পড়ে এবং তাদের সুখ- স্বাচ্ছন্দ বিনষ্ট হয়ে যায় । কাবা ঘরের ৩৬০ টি মূর্তি মাটিতে পড়ে যায়। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর বিবি আমিনা আব্দুল মুত্তালিবের কাছে নিজ পুত্রের জন্মগ্রহণের শুভ সংবাদ পৌঁছালে তিনি আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে নবজাতককে কোলে তুলে নিয়ে কাবাগৃহে উপস্থিত হন। তিনি আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করতে থাকেন এবং তার সার্বিক কল্যাণের জন্য দোয়া করতে থাকেন। সেই আনন্দ মধুর মুহূর্তেই তিনি তার নাম রাখেন 'মুহাম্মদ'। আরবের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী সপ্তম দিনে তার খতনা করা হয়। তার মাতার পর রসূলুল্লাহ (সাঃ) কে সর্বপ্রথম দুধ পান করিয়েছিলেন আবু লাহাবের দাসী 'শুয়াইবা'।

বিবি হালিমার তত্ত্বাবধানে শিশু মুহাম্মাদ (সাঃ)-র লালন পালন

সে সময় আরবদের মাঝে সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ প্রথা চালু ছিল। আরবরা মনে করত যেহেতু শহর নগরের পরিবেশ জনাকীর্ণ এবং রোগ ব্যাধিতে পরিপূর্ণ, তাই শহর থেকে দূরে উন্মুক্ত গ্রামীণ পরিবেশে তাদের লালন-পালন করাই উত্তম। তাই শিশুরা যাতে রোগ মুক্ত থাকতে পারে এবং বলিষ্ঠ দেহ ও মজবুত মাংসপেশির অধিকারী হয়, সেই সঙ্গে বিশুদ্ধ আরবি ভাষা শিখতে পারে, সে উদ্দেশ্যে শিশুদের বেদুইন ধাত্রীদের হাতে তুলে দেওয়া হতো।

সেই নিয়ম অনুযায়ী শিশু মুহাম্মদ (সাঃ)-কে ধাত্রী হালিমা বিনতে আবু জুবায়ের এর হাতে তুলে দেয়া হয়। হালিমার স্বামীর নাম ছিল হারিস বিন আব্দুল উজ্জা। এই দম্পতির কয়েকটি সন্তান ছিল। তাদের নাম যথাক্রমে আব্দুল্লাহ, আনিসা, হোজাফা অথবা জোযামা। হোজাফা শায়মা নামেই অধিক পরিচিত ছিলেন। এই শায়মাই রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে লালন পালনের ব্যাপারে মা হালিমাকে সাহায্য করতেন। দুধ পান করানোর সময় বিবি হালিমা শিশু মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর অলৌকিক গুণের বিভিন্ন দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে আশ্চর্য ও হতবাক হয়ে যান। বিবি হালিমার বর্ণনা সূত্রে ইতিহাসবিদ ইবনে ইসহাক বলেছেন, বিবি হালিমা এবং তার স্বামী বনু সা'দ গোত্রের একদল মহিলার সাথে অর্থের বিনিময়ে দুধ পান করাবে- এমন শিশুর সন্ধানে মক্কায় আগমন করেন। সেই সময় দুর্ভিক্ষের কারণে আরবে প্রচুর খাদ্য ও অর্থ সংকট চলছিল। বিবি হালিমা একটি সাদা মাদি গাধার পিঠে চড়ে যাচ্ছিলেন। গাধাটি ছিল খুবই দুর্বল। গাধাটি দুর্বলতা ও শক্তিহীনতার কারণে এতই ধীরে চলছিল যে, এতে কাফেলার অন্য সাথীরা অত্যন্ত বিরক্তবোধ হচ্ছিল। তার সাথে উষ্ট্রিও ছিল। কিন্তু উষ্টির ওলান থেকে এক বিন্দুও দুধ বের হচ্ছিল না । বিবি হালিমার বুকেও দুধ ছিল না। ক্ষুধার তাড়নায় শিশুরা ছটফট করছিল। এমনই এক অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে তারা মক্কায় উপস্থিত হয়। দলে এমন কোন মহিলা ছিল না - যার কাছে শিশু নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-কে দুধ পান করানোর প্রস্তাব দেওয়া হয়নি। কিন্তু বাবা নেই, মা বিধবা, দাদা বৃদ্ধ- এই শিশুকে লালন পালনের বিনিময়ে তেমন কিছুই পাওয়া যাবে না, তাই তাকে কেউ গ্রহণ করতে আগ্রহ দেখালো না। অপরদিকে বিবি হালিমার পক্ষে কোন শিশু সংগ্রহ করা সম্ভব হলো না। তাই তিনি শূন্য হাতে ফিরে যাওয়ার চেয়ে সেই এতিম শিশুকেই নিয়ে যেতে আগ্রহ দেখালেন । বিবি হালিমা এবং তার স্বামী শিশু মুহাম্মদকে নিয়ে মক্কায় তাদের অস্থায়ী বাস গৃহে ফিরে এলেন এবং তাকে কোলে তুলে নিলেন, তখন তিনি দুই সিনা তার বুকের সাথে মিলিত করে পূর্ণ পরিতৃপ্তি নিয়ে দুধ পান করলেন। তার দুধ ভাইও পূর্ণ পরিতৃপ্তি সহকারে দুধ পান করল। এরপর দুজনেই ঘুমিয়ে পড়ল । অন্যদিকে তার স্বামী উর্ষ্ট্রি দোহন করতে গিয়ে দেখেন, ওলান দুধে পরিপূর্ণ। তিনি এত বেশি পরিমাণে দুধ দোহন করলেন যে, তারা উভয়ই তৃপ্তির সাথে পান করলেন এবং শান্তিতে রাত্রি যাপন করলেন। তার স্বামী বললেন-" হালিমা, আল্লাহর শপথ! তুমি এক মহা ভাগ্যবান সন্তান লাভ করেছ।" এরপর তাদের দল মক্কা থেকে নিজ নিজ গৃহে ফেরার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলো। শিশু মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে বুকে নিয়ে সেই দুর্বল ও নিস্তেজ মাদী গাধার উপর সওয়ার হয়ে তিনিও যাত্রা শুরু করলেন। কিন্তু সেই দুর্বল গাধাটাই সকলকে পিছনে ফেলে দ্রুত বেগে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকলো। কাফেলার আর কোন গাধাই তার সাথে তাল মিলিয়ে পথ চলতে পারছিল না। মক্কা থেকে ফিরে আসার পরবর্তী সময়ে তাদের বকরিগুলো চারণভূমি থেকে ঘাস খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে বাড়িতে ফিরে আসতো। দুগ্ধবতী বকরি গুলো দোহন করে তারা পরিতৃপ্তির সাথে দুধ পান করত। অথচ অন্য লোকেরা এক ফোঁটা দুধও পেত না। তাদের পশু গুলোর ওলানে কোন দুধই থাকত না। তাদের রাখাল যে চারণ ভূমিতে পশুপাল নিয়ে যেত, অন্যান্য রাখালরাও সেই ভূমিতে যেত। কিন্তু এ সত্ত্বেও তাদের পশুগুলো ঘাসের অভাবে ক্ষুধার্ত ও অভুক্ত অবস্থায় গৃহে ফিরে আসতো। তারা প্রত্যেকটি কাজকর্মে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বরকত লাভ করতে থাকলো। এভাবে শিশু মুহাম্মদ (সাঃ) এর পুরো দুটো বছর অতিবাহিত হয়ে গেল। লালন-পালনের মেয়াদ দুই বছর পূর্ণ হওয়ায় তারা শিশু মুহাম্মদ (সাঃ)-কে তার মায়ের কাছে দিতে গেল। কিন্তু তাকে নিয়ে আসার পর থেকে

তাদের সংসারে যে সচ্ছলতা ও বরকতের সুফল ভোগ করে আসছিল,সে কারণে বিবি হালিমা মনে মনে আশা করছিলেন, তিনি যেন আরো কিছুদিন তাদের কাছে থাকেন। তার মায়ের কাছে তাদের ইচ্ছের কথা ব্যক্ত করায় এবং তাদের বারংবার অনুরোধ ও আন্তরিকতায় আশ্বস্ত হয়ে তিনি শিশু মুহাম্মদ (সাঃ)-কে পুনরায় তাদের সাথে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সম্মতি প্রদান করেন। দ্বিতীয় দফায় বনু সা'দ গোত্রে অবস্থানকালে জন্মের চতুর্থ কিংবা পঞ্চম বছরে তার বক্ষ বিদারনের ঘটনাটি ঘটে। একদিন শিশু মুহাম্মাদ যখন সঙ্গী-সাথীদের সাথে খেলাধুলা করছিলেন, এমন সময় জিব্রাইল (আঃ) উপস্থিত হন। অতঃপর শিশু মুহাম্মদ (সাঃ)-কে একটু দূরে নিয়ে চিৎ করে শুয়ে তার বক্ষ বিদীর্ণ করে হৃদপিণ্ডটি বের করে আনলেন। তারপর হৃদপিন্ডের মধ্য থেকে কিছুটা জমাট বাধা রক্ত বের করে বললেন- "শয়তানের অংশ - যা তোমার মধ্যে ছিল, তা হচ্ছে এই।" তারপর হৃদপিণ্ডটাকে একটি সোনার তস্তরীতে রেখে যমযমের পানি দিয়ে ধৌত করলেন। তারপর পুনরায় তা যথাস্থানে সন্নিবেশিত করে কাটা অংশে জোড়া লাগিয়ে দিলেন।এ সময় তার খেলার সঙ্গী- সাথীগণ দৌড়ে গিয়ে বিবি হালিমাকে বলল- মুহাহাম্মদ (সাঃ) নিহত হয়েছেন। বিবি হালিমা ও তার স্বামী একথা শুনে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও অস্থির হয়ে পড়লেন। অতঃপর তারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে শিশু মুহাম্মদের মুখ মন্ডল মালিন্য ও পেরেশানির ভাব লক্ষ্য করলেন। এই অবস্থার মধ্যে তারা শিশু মুহাম্মদ (সাঃ)-কে ঘরে এনে সেবা যত্ন করতে লাগলেন। বক্ষ বিদারণের ঘটনায় ধাত্রী মাতা হালিমা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে শিশু মুহাম্মদ (সাঃ)-কে তার মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এভাবে ছয় বছর বয়স পর্যন্ত ধাত্রী গৃহে লালিত পালিত হন।

মা আমিনার ইন্তেকাল ও দাদা আব্দুল মুত্তালিবের অভিভাবকত্ব

ধাত্রী গৃহ থেকে একমাত্র সন্তানকে ফেরত পাওয়ার পর বিবি আমিনা ইয়াসরিব গিয়ে স্বামীর কবর জিয়ারত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। অতঃপর শ্বশুর আব্দুল মুত্তালিবের ব্যবস্থাপনায় শিশু মুহাম্মাদ (সাঃ) এবং পরিচারিকা উম্মে আইমানকে সাথে নিয়ে পাঁচশত কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে মদিনায় পৌঁছালেন। সেখানে একমাস অবস্থানের পর মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। সামনে মক্কা অনেক দূরের পথ, পেছনে মদিনা স্বল্প দূরত্বে অবস্থিত। পথচলার এমনই এক পর্যায়ে বিবি আমিনা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ধীরে ধীরে তার অসুস্থতা বৃদ্ধি পেতে লাগলো। অবশেষে মা আমিনা 'আবওয়া' নামক স্থানে পরলোক গমন করেন।

মায়ের মৃত্যুর পর দাদা এতিম নাতিকে নিয়ে এলেন নবুয়ত ও রিসালাতের লীলাভূমি পবিত্র মক্কা নগরীতে। প্রিয় পুত্র আব্দুল্লাহর মৃত্যুতে আব্দুল মুত্তালিব যতটা ব্যথা অনুভব করেছিলেন, তার চেয়ে অনেক বেশি ব্যথা অনুভব করলেন পুত্রবধূ বিবি আমিনার মৃত্যুতে। কারণ, আব্দুল্লাহর মৃত্যুর পর শিশু মুহাম্মদ (সাঃ)-এর অবলম্বন ছিলেন মা আমিনা। কিন্তু মা আমিনার মৃত্যুর পর তার যে আর কোন সহায়ই রইলো না। তাই শিশু মুহাম্মদ (সাঃ)-র দুঃখ শত গুনে বৃদ্ধি পেল। অন্যদিকে এতিম শিশু মুহাম্মদ (সাঃ)-র জন্য আব্দুল মুত্তালিবের স্নেহ ভালবাসাও শতধারায় বর্ষিত হতে লাগলো। তিনি শিশু মুহাম্মদ (সাঃ)-কে প্রাণের চেয়ে অধিক ভালবাসতেন। শুধু তাই নয় ; শিশু মুহাম্মদ (সাঃ)-কে তিনি সম্মানের দৃষ্টিতেও দেখতেন। কাবা ঘরের ছায়ায় আব্দুল মুত্তালিবের জন্য বিশেষ একটি আসন বিছানো থাকতো । আব্দুল মুত্তালিব উক্ত আসনে বসতেন এবং তার সন্তানগন বসতেন সেই আসনের পার্শ্ববর্তী স্থানে। পিতার সম্মানার্থে তার কোন সন্তান উক্ত আসনে বসতেন না। কিন্তু শিশু মুহাম্মদ (সাঃ) সেখানে আগমন করলে সেই আসনেই

বসতেন। এমন অবস্থায় শিশু মুহাম্মদ (সাঃ)-র চাচাগণ তাকে হাত ধরে সেই আসন থেকে নামিয়ে দিতেন। কিন্তু আব্দুল মুত্তালিব এর উপস্থিতিতে শিশু মুহাম্মদ (সাঃ)-কে সে আসন থেকে কেউ নামাতে চাইলে তিনি বলতেন - "একে তোমরা এই আসন থেকে নামানোর চেষ্টা করো না, ওকে ছেড়ে দাও। কারণ, আল্লাহর শান কি যে তা তিনি ভালো জানেন। তবে এই শিশুকে আমার সাধারণ শিশু বলে মনে হয় না। এ হচ্ছে বিশেষ এক শিশু,এর মধ্যে রয়েছে বিশেষ এক ব্যক্তিত্বময় সত্তা। এর সবকিছুতে অদ্ভুত রকম বেশি রয়েছে।" অতঃপর শিশু মুহাম্মদ (সাঃ)-কে নিজের কাছে বসিয়ে নিতেন, তার গায়ে হাত বুলিয়ে আদর সোহাগ করতেন এবং তার হাবভাব ও কাজকর্ম দেখে আনন্দ প্রকাশ করতেন।

চাচা আবু তালিবের তত্ত্বাবধানে বালক মুহাম্মাদ (সাঃ)

মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বয়স যখন ৮ বছর ২ মাস ১০ দিন তখন দাদা আব্দুল মুত্তালিব ইন্তেকাল করেন। বালক মুহাম্মাদের এই দুঃখ-শোকের মুহূর্তে তা লাঘব করতে এগিয়ে এলেন চাচা আবু তালিব। তিনি খুশি মনে আপন কাঁধে তুলে নিলেন বালক মুহাম্মদ (সাঃ)-এর লালন-পালন ও পরিচালনার সকল দায়-দায়িত্ব। বৃদ্ধ আব্দুল মুত্তালিব মৃত্যুর পূর্বক্ষণে আবু তালিবকে সেই উপদেশই দিয়ে গিয়েছিলেন। আবু তালিব অত্যন্ত যত্ন সহকারে ভাতিজা মুহাম্মদ (সাঃ)-কে লালন পালন করতে থাকেন। আবু তালিব বালক মুহাম্মদ (সাঃ)-কে শুধু যে আপন সন্তানের মত লালন পালন করতেন তাই নয়; বরং আপন সন্তানের চেয়েও অধিক ভালবাসতেন। উপরন্ত দাদা আব্দুল মুত্তালিব- এর মত তিনিও তাকে বিভিন্নভাবে সম্মান প্রদর্শন করতেন। আল্লাহর নবী (সাঃ) আত্মীয়-স্বজনদের থেকে শৈশব, বাল্য কিংবা কৈশোরেই যে মান সম্মান লাভ করতে থাকবেন, সে ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশই থাকতে পারেনা। এটাকেও আমরা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে বিশেষ একটি ব্যবস্থা হিসেবে ধরে নিতে পারি।

বাল্যকাল ও যৌবনকালের কিছু ঘটনা

একবার আরবের লোকজন দুর্ভিক্ষের কারণে চরম আকালের সম্মুখীন হল । সকলে মিলে সিদ্ধান্ত নিল যে আল্লাহ তায়ালার দরবারে তারা দোয়া করবে। আবু তালিব মুহাম্মদ (সাঃ)-কে সাথে নিয়ে বের হলেন। সেই বালকের আশেপাশে আরো অন্যান্য বালক ছিল, কিন্তু এই বালকের মুখ থেকে যেন নূর ছিটকে পড়ছিল। আবু তালিব সেই বালককে হাত ধরে কাবা ঘরের নিকট নিয়ে গেলেন এবং কাবার দেওয়ালের সাথে পিঠ লাগিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে বললেন। সেই বালক চাচার হাতের আঙ্গুল ধরে দাঁড়িয়ে থাকলেন। সেই সময় আকাশে এক টুকরো মেঘও ছিল না । অথচ কিছুক্ষণের মধ্যেই মেঘে মেঘে আকাশ ছেয়ে গিয়ে আঁধার ঘনিয়ে এলো এবং মুষলধারায় বৃষ্টি শুরু হল। বৃষ্টির পরিমাণ এত বেশি হল যে, উপত্যকায় প্লাবনের সৃষ্টি হয়ে গেল। ফলে, শহর ও মরু অঞ্চল পুনরায় সতেজ- সজীব হয়ে উঠলো।

মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বয়স যখন বার বছর তখন তিনি ব্যবসার কাজে চাচা আবু তালিবের সাথে শাম-দেশে গমন করেন। তারপর সফরের এক পর্যায়ে বসরায় গিয়ে উপস্থিত হন। উক্ত শহরে 'জারজিস' নামক একজন খ্রিস্টান ধর্মযাজক বসবাস করতেন। তার উপাধি ছিল 'বুহায়রা'। মক্কার ব্যবসায়ী দল যখন বসরায় শিবির স্থাপন করেন, তখন বুহায়রা তাদের নিকট আগমন করেন এবং আপ্যায়ন করান। অথচ এর আগে তিনি কখনো এভাবে গির্জা থেকে বেরিয়ে কোন বাণিজ্য কাফেলার সাথে সাক্ষাৎ করেননি। তিনি কিশোর মুহাম্মাদ (সাঃ)-র চেহারা-সুরত,

আচার-আচরণ এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্য দেখে বুঝতে পারেন যে, ইনি হচ্ছেন সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত শেষ নবী। অতঃপর কিশোর মুহাম্মদ (সাঃ)-র হাত ধরে তিনি বললেন-“ইনি হচ্ছেন বিশ্ব জাহানের সরদার। আল্লাহ তাকে বিশ্ব জাহানের রহমতস্বরূপ নবী হিসেবে মনোনীত করবেন।” তিনি আবু তালিব কে বললেন- “গিরিপথের ওই প্রান্ত থেকে তোমাদের আগমন যখন ধীরে ধীরে দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল, তখন প্রত্যক্ষ করলাম যে, সেখানে এমন কোন বৃক্ষ কিংবা পাথর ছিল না যা তাকে সিজদা করেনি। এসব জিনিস নবী-রাসুল ছাড়া সৃষ্টিকুলের মধ্যে অন্য কাউকেই কখনোই সিজদা করে না। উপরন্ত মোহরে নবুওয়াত দেখেও আমি তাকে চিনতে পেরেছি। তার স্কন্দদেশের নিচে কড়িহাড্ডির পাশে "সেব" ফলের আকৃতি বিশিষ্ট একটি দাগ রয়েছে- সেটাই হচ্ছে মোহরে নবুওয়াত। আর এসব তথ্য আমি ধর্মগ্রন্থ বাইবেল থেকে জানতে পেরেছি।” তিনি আবু তালিবকে বললেন - "একে সাথে নিয়ে আর বিদেশ ভ্রমণ করবেন না । শীঘ্রই একে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যান । কারণ, এর পরিচয় জানতে পারলে ইহুদীরা তাকে হত্যা করে ফেলতে পারে।” একথা শোনার পর আবু তালিব তাঁকে দ্রুত মক্কায় ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করেন।

মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বয়স যখন পনের বছর, তখন ফুজ্জার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধের একপক্ষে ছিল কুরাইশগণ এবং তাদের মিত্র বনু কেনানা । বিপক্ষে ছিল কায়েস আয়লান। এ যুদ্ধকে 'ফুজ্জার যুদ্ধ'এজন্যই বলা হয়, এতে নিষিদ্ধ বস্তু সমূহ এবং পবিত্র মাসের পবিত্রতা লংঘন করা হয়েছে। কিশোর বয়সে মুহাম্মদ (সাঃ) এই যুদ্ধে গমন করেছিলেন। এই যুদ্ধে তিনি চাচাদের তীরের আঘাত থেকে রক্ষার কাজে নিয়োজিত ছিলেন।

হিলফুল ফুজুল গঠন

ফুজ্জার যুদ্ধের নিষ্ঠুরতা ও ভয়াবহতা বিবেকবান আরবদের দারুন ভাবে বিচলিত করে তোলে। এই যুদ্ধে কত যে প্রাণহানি ঘটে, কত শিশু এতিম হয়, কত নারী বিধবা হয়, কত মা সন্তানহারা হয় এবং কত সম্পদ ধ্বংস হয়- তা হিসাব করা মুশকিল। ভবিষ্যতে যেন আরবদের এমন অর্থহীন যুদ্ধে জড়িয়ে ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে না হয়, তার জন্য আরবদের বিশিষ্ট গোত্রপতিগণ 'আব্দুল্লাহ বিন জুদয়ান তাইমি'র ঘরে একত্রিত হয়ে আল্লাহর নামে একটি অঙ্গীকারনামা সম্পাদন করে। যে গোত্রগুলো এতে অংশগ্রহণ করে সেগুলি হচ্ছে - বনু হাশিম, বনু মুত্তালিব, বনু আসাদ বিন আব্দুল উজজা, বনু-যোহরা বিন কিলাব ও বনু তামিম বিন মুররাহ। বৈঠকে একত্রিত হয়ে সকলে যাবতীয় অন্যায়-অনাচার এবং অর্থহীন যুদ্ধ-বিগ্রহের প্রতিকার সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করে। এর পূর্বে নিয়ম ছিল গোত্রীয় কোন ব্যক্তি, আত্মীয়-স্বজন অথবা সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ কোন ব্যক্তি অন্যায় করলে স্বগোত্রের সকলকে সেই ব্যক্তিকে সমর্থন করতে হবে - তা সে যত বড় অন্যায়ই হোক না কেন। আলোচ্য পরামর্শসভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, এই জাতীয় নীতি হচ্ছে অন্যায়, অমানবিক ও অবমাননাকর। সুতরাং এ ধরনের জঘন্য নীতি আর কিছুতেই চলতে দেওয়া যেতে পারে না। তারা সবাই এ মর্মে প্রতিজ্ঞা করলেন -

ক. দেশের অশান্তি দূর করার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

খ. বিদেশি লোকদের ধনসম্পদ ও মান-সম্মান রক্ষা করার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

গ. দরিদ্র , দুর্বল ও অসহায় লোকদের সহায়তাদানে আমরা কখনোই কুণ্ঠাবোধ করব না।

ঘ. অত্যাচারী ও অনাচারীর অন্যায়-অত্যাচার থেকে দুর্বলদের রক্ষা করতে প্রাণপণ চেষ্টা করব।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এবং তার চাচা জুবায়ের বিন আব্দুল মুত্তালিব উক্ত আলোচনা সভায় যোগদান করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে যুবক মুহাম্মদ (সাঃ)-ই ছিলেন সে কল্যাণকামী চিন্তাভাবনার উদ্ভাবক এবং চাচা জুবায়ের ছিলেন প্রথম সমর্থক। তাদের উভয়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টাতেই ধীরে ধীরে সমর্থনকারী লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত আব্দুল্লাহ বিন জুদয়ানের ঘরে বিভিন্ন গোত্রপতিদের উপস্থিতি ও সম্মতি সাপেক্ষে 'অঙ্গীকারনামা' সম্পাদিত হয়। তারপর সেই অঙ্গীকারনামার ভিত্তিতে একটি সেবাসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি ছিল অন্যায় ও অনাচারের বিরুদ্ধে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকারনামা। এজন্য এই সেবা সংঘের নাম দেওয়া হয়েছিল 'হিলফুল ফুজুল' বা 'হলফ উল ফুজুল'। এই অঙ্গীকারনামার ফলে আরববাসীদের চিন্তা চেতনায় ব্যাপক পরিবর্তন আসতে থাকে। প্রথমাবস্থায় হিলফুল ফুজুলের কর্মতৎপরতা খুব ভালোভাবে চলতে থাকে। কিন্তু মুহাম্মদ (সাঃ)-র নবুওয়াত লাভের পর কুরাইশদের মধ্যে কিছুটা বিরূপ মনোভাব দেখা যায়। যার ফলে শেষ পর্যন্ত এর কার্যকারিতা স্তিমিত হয়ে যায়।

খাদিজা (রাঃ)-র সাথে বিয়ে

খাদিজা বিনতে **খুয়াইলিদ** ছিলেন তৎকালীন আরবের একজন সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্য ব্যবসায়ী মহিলা| তিনি লোকজনকে নির্দিষ্ট বেতনে ও লভ্যাংশের ভিত্তিতে ব্যবসায়ে নিয়োগ করতেন| ব্যবসায়ী গোত্র হিসেবে কুরাইশদের নাম-ডাক ছিল| রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-র সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা ও চারিত্রিক মহত্ত্বের কথা জানতে পেরে তিনি তাঁর কাছে লোক পাঠিয়ে তাঁর পণ্যসামগ্যী নিয়ে সিরিয়া যাওয়ার প্রস্তাব দিয়ে বললেন যে, এজন্য তিনি অন্যদেরকে যা দিয়ে থাকেন তার চেয়ে উত্তম সম্মানী তাঁকে দেবেন| মাইসারাহ নামক এক কিশোরকেও তাঁর সাহায্যের জন্য সঙ্গে দিতে চাইলেন| রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এই প্রস্তাব গ্রহণ করলেন এবং খাদীজার পণ্য সামগ্রী ও দাস মাইসারাহকে সাথে নিয়ে সিরিয়ায় রওয়ানা হলেন| অনতিবিলম্বে তিনি সিরিয়ায় গিয়ে পৌঁছলেন|

সিরিয়ায় পৌঁছে তিনি জনৈক ধর্মযাজকের গীর্জার নিকটবর্তী এক গাছের নীচে বিশ্রাম করলেন| ধর্মযাজক মাইসারাহকে জিজ্ঞেস করলেন, "গাছটির নীচে যিনি বিশ্রাম নিচ্ছেন তিনি কে?" মাইসারাহ বললেন,

"তিনি হারামের অধিবাসী জনৈক কুরাইশ বংশীয় ব্যক্তি|" ধর্মযাজক বললেন, "এই গাছের নীচে নবী ছাড়া আর কেউ কখনো বিশ্রাম নেয়নি!" রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর আনীত পণ্য বিক্রি করে দিলেন এবং নতুন কিছু জিনিস ক্রয় করলেন| অতঃপর তিনি মক্কা অভিমুখে রওনা হলেন| পথে যেখানেই দুপুর হয় এবং প্রচন্ড রৌদ্র ওঠে, মাইসারাহ দেখতে পায় যে, দু'জন ফিরিশতা মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে ছায়া দিয়ে রৌদ্র থেকে রক্ষা করেছে এবং তিনি উটের পিঠে সওয়ার হয়ে এগিয়ে চলেছেন| মক্কায় পৌঁছে তিনি খাদীজাকে তাঁর ক্রয় করা পণ্যদ্রব্য বুঝিয়ে দিলেন| খাদীজা ঐ মাল বিক্রি করে প্রয় দ্বিগুণ মুনাফা লাভ করলেন| মাইসারাহ খাদীজাকে যাজকের বক্তব্য ও নবী (সাঃ)-কে দুই ফিরিশতার ছায়াদানের বিষয় অবহিত করলেন| খাদীজা ছিলেন দৃঢ় ব্যক্তিত্ব সম্প ন্ন বুদ্ধিমতি ও সম্ভ্রান্ত মহিলা|

নবী (সাঃ)-র মহত্ব ও সততার সাথে পরিচিত হওয়া তার জন্য একটা অতিরিক্ত সৌভাগ্য রূপে

বিবেচিত হলো, যা নিছক আল্লাহর ইচ্ছাক্রমেই তিনি লাভ করলেন| মাইসারাহর কাছে উক্ত অলৌকিক ঘটনার কথা শুনে খাদীজা লোক পাঠিয়ে তাঁকে বললেন, "ভাই, আপনাদের গোত্রের মধ্যে আপনার যে মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান, যে আত্মীয়তার বন্ধন এবং সর্বোপরি আপনার বিশ্বস্থতা, চরিত্রমাধুর্য ও সত্যবাদিতার যে সুনাম রয়েছে, তাতে আমি মুগ্ধ এবং অভিভূত|" এই কথা বলে খাদীজা তাঁকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেন| কুরাইশদের মধ্যে খাদীজা ছিলেন সর্বাপেক্ষা অভিজাত বংশীয়া, সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্প ন্ন সম্ভ্রান্ত এবং অতিশয় ধনাঢ্য মহিলা| এ কারণে সম্ভব হলে তাঁর গোত্রের সকলেই তাঁকে বিয়ে করার অভিলাষ পোষণ করতো| রাসূলুল্লাহ (সাঃ) খাদীজার এ প্রস্তাব চাচাদেরকে জানালেন| চাচা হামযা (রাঃ) খাদীজার পিতা খুয়াইলিদ ইবনে আসাদের (ইবনে আবদুল উযযা ইবনে কুসাই ইবনে কিলাব ইবনে মুররাহ ইবনে কা'ব ইবনে লুয়াই) সাথে দেখা করে আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব দিলেন এবং বিয়ে সম্প ন্ন হলো| রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মোহরানা হিসেবে খাদীজাকে ২০ টি উট দিয়েছিলেন| তিনিই প্রথম স্ত্রী এবং তাঁর জীবদ্দশায় তিনি আর কোন বিয়ে করেননি|

খাদীজার গর্ভে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-র একমাত্র ইবরাহীম ছাড়া সব স¯ত্মান জন্মে। তাঁরা হলেন : কাসিম, তাহির তাইয়েব, যয়নব, রুকাইয়া, উম্মে কুলসুম ও ফাতিমা| কাসিমের নামানুসারে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আবুল কাসিম নামেও খ্যাত হন| কাসিম ও তাহির জাহেলিয়াতের যুগেই মারা যান| কিন্তু মেয়েরা সবাই ইসলামের আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করেন এবং ইসলাম গ্রহণ করে পিতার সাথে হিজরত করেন| বর্ণনা থেকে বুঝা যায়, তাহির ও তাইয়েব দুই ব্যক্তি| কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হলো এ দুটোই আবদুল্লাহর উপনাম| তাঁকে এই দুই নামেই ডাকা হতো| নবীজি (সাঃ)-র জীবদ্দশায় শুধুমাত্র ফাতিমা ব্যাতিত তার অন্য সকল সন্তান ইন্তেকাল করেন। ফাতিমা (রাঃ) নবী (সাঃ)-র ইন্তেকালের ছয় মাস পরে মৃত্যু বরন করেন।

উম্মুল মুমিনীনগণ

রসূল (সাঃ) এর মোট ১১ জন স্ত্রী ছিলেন। মৃত্যুর সময় পর্যন্ত ৯ জনের সাথে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন।

১. খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ (রাঃ):-

খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার জীবদ্দশায় রাসূল (সাঃ) আর কাউকে বিবাহ করেননি। হিজরতের তিন বছর আগে তার মৃত্যু হয়। তখন নবীজির বয়স ছিল ৫০ বছর।

২. সাওদা বিনতে জামআহ (রাঃ):-

তিনি সাকরান বিন আমরের স্ত্রী ছিলেন। তিনিও প্রথম পর্যায়ের মুসলমান ছিলেন এবং সাওদা (রাঃ) তার সাথে হাবসা হিজরত করেছিলেন। প্রথম স্বামী হাবসায় ইন্তেকাল করেন। তার ইদ্দত পালন শেষ হলে রাসূল (সাঃ) তাকে বিয়ে করেন।

৩. আয়িশা বিনতে আবু বকর (রাঃ):-

ছয় বছর বয়সে নবীজি (সাঃ)-র সাথে তার বিয়ে হয়। প্রথম হিজরীতে নয় বছর বয়সে তাকে নবীজি (সাঃ)-র সংসারে নিয়ে আসা হয়। তিনি একমাত্র কুমারী স্ত্রী ছিলেন। তিনি ৫৮ হিজরীতে ৬৬ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

৪. হাফসা বিনতে ওমর (রাঃ):-

তিনি ওমর (রাঃ) এর কন্যা ছিলেন। প্রথমে খুনাইস বিন হুজাফার সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল। হিজরতের পর দ্বিতীয় বা তৃতীয় বছরে নবীজী (সাঃ) র সঙ্গে তার বিবাহ হয়। তিনি ৪৫ হিজরীতে মদিনায় ইন্তেকাল করেন।

৫. যয়নাব বিনতে জাহাশ (রাঃ):-

তিনি নবীজি (সাঃ) র ফুফাতো বোন ছিলেন। প্রথমে নবীজি (সাঃ) তাকে বিয়ে দিয়েছিলেন তার পালিত পুত্র যায়েদ বিন হারেসা (রাঃ)-র সাথে। কিন্তু সেই বিয়ে টিকেনি। নবীজি (সাঃ) অনেক বোঝানোর পরও তাদের তালাক হয়ে যায়। তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নির্দেশে যয়নাব (রাঃ)-কে নবীজি (সাঃ) বিয়ে করেন। জাহিলী যুগে আরবরা পালক পুত্রকে নিজের পুত্র মনে করতেন। জাহিলী যুগের এই প্রথা আল্লাহর নির্দেশে সেই সময়ই বন্ধ হয়ে যায়। যয়নাব (রাঃ) ২০ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

৬. যয়নাব বিনতেহ খুযায়মা (রাঃ):-

তিনি তোফায়েল বিন হারিস এর স্ত্রী ছিলেন। তিনি তালাক দেয়ার পর তার ভাই ওবায়দার সঙ্গে তার বিয়ে হয় এবং ওবায়দা বদর যুদ্ধে শহীদ হয়। এরপর তৃতীয় হিজরীতে উহুদ যুদ্ধের একমাস আগে নবীজি (সাঃ)-র সঙ্গে তার বিয়ে হয়। মাত্র দুই মাস পরে তিনি ইন্তেকাল করেন।

৭. উম্মে সালামা (রাঃ):-

তার নাম ছিল হিন্দ। প্রথমে আবু সালামার সঙ্গে তার বিয়ে হয় । আবু সালামার মৃত্যুর পর নবীজি (সাঃ)-র সাথে তার চতুর্থ হিজরিতে ভিন্নমতে তৃতীয় হিজরীতে বিয়ে হয়। ৫৮ বা ৬২ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

৮. উম্মে হাবিবা বিনতে আবু সুফিয়ান (রাঃ):-

তিনি আবু সুফিয়ানের কন্যা ছিলেন। ওবায়দুল্লাহ বিন জাহাশের সাথে তার বিয়ে হয়। তাদের সংসারে সন্তানও ছিল। কিন্তু হাবশায় হিজরতের পর ওবায়দুল্লাহ ধর্ম ত্যাগ করে। উম্মে হাবিবা ঈমানের ওপর স্থির থাকেন। তখন হাবশার বাদশা নাজ্জাশীর কাছে চিঠি দিয়ে নবীজি তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন এবং তাদের বিয়ে হয়ে যায়।

৯. মায়মুনা বিনতে আল হারিস (রাঃ):-

তিনি মাসুদ বিন ওমরের স্ত্রী ছিলেন। তালাকের পর আবু রুহমের সঙ্গে বিয়ে হয় এবং

তার মৃত্যুর পর নবীজি (সাঃ)-র সাথে বিয়ে হয়।

১০. জুয়াইরিয়া বিনতে আল হারিস (রাঃ):-

বনু মোস্তালিকের সরদার হারিসের কন্যা ছিলেন তিনি। যুদ্ধবন্দী হিসেবে তাকে আনা হয়। তারপর ষষ্ঠ হিজরীতে নবীজির সঙ্গে তার বিবাহ হয়। তার বিয়ের উসিলায় তার গোত্রের সবাইকে মুক্ত করে দেয়া হয় এবং তার পিতা ইসলাম গ্রহণ করেন । তিনি ৫০ বা ৫৫ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

১১. সাফিয়া বিনতে হুওয়াই (রাঃ):-

হারুন (আঃ) এর বংশধর ছিলেন তিনি। এটা শুধু তারই বৈশিষ্ট্য যে, তিনি এক নবীর বংশধর আরেক নবীর পত্নী। তিনি কিনানা বিন আবুল হুকাইকের স্ত্রী ছিলেন। খাইবার যুদ্ধে সে নিহত হওয়ার পর নবীজি (সাঃ)-র সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনি ৫০ বা ৫২হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

এছাড়াও তার মারিয়া বিনতে কিবতিয়া এবং রায়হানা নামক দুইজন দাসী ছিল। মারিয়ার গর্ভেই নবীজির সন্তান ইব্রাহিমের জন্ম।

তাদের সাথে যেমন ছিলেন তিনি:-

তাদের সাথে নবীজির সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত মধুর ও শ্রদ্ধাপূর্ণ। অত্যন্ত দরিদ্রতার মাঝে থেকেও তারা কখনো অভিযোগ করেননি। মহানবী (সাঃ) প্রতিটি বিষয়ে তাদের সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন এবং তাদের সাথে পরামর্শ করতেন। যতই ব্যস্ততা থাকুক না কেন, তিনি স্ত্রীদেরকে যথেষ্ট পরিমাণ সময় দিতেন। প্রতিদিন সকালে তিনি সবার কাছে একে একে গিয়ে সালাম দিতেন ও দোয়া করতেন। আসরের পর থেকে মাগরিব পর্যন্ত সময় তিনি স্ত্রী ও পরিবারের জন্য বরাদ্দ রাখতেন। তিনি একদিকে তাদের সাথে মজা করতেন অন্যদিকে তাদেরকে দীনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শিক্ষা দিতেন। তিনি অনেক বেশি স্ত্রীদের প্রশংসা করতেন এবং সবচেয়ে বেশি প্রশংসা করতেন খাদিজা (রাঃ)-র। আনাস(রাঃ) থেকে বর্ণিত - যখনই আল্লাহর রাসূল (সাঃ) কোন উপহার পেতেন তিনি বলতেন,' এটি অমুকের কাছে নিয়ে যাও, কেননা সে খাদিজার বান্ধবী। এর কিছু তমুকের বাসায় নিয়ে যাও কারণ সে খাদিজাকে ভালোবাসে।' আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একবার খাদিজার বোন হালা বিনতে খুয়াইলিদ আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি চাইলেন। তার গলার স্বর খাদিজার কণ্ঠের অনুরূপ ছিল। এতে রাসূলের খাদিজার কথা মনে পড়ল। তিনি খুশিতে বলে উঠলেন, “হে আল্লাহ ! এটা যেন হালা হয়।” আয়িশা (রাঃ) ঈর্ষা অনুভব করলেন এবং বললেন, “আপনি কুরাইশের সেই বৃদ্ধা মহিলার কথা এখনো বলেন যার কিনা দাঁত পড়ে

গিয়েছিল, অনেক আগে যে কিনা মারা গিয়েছে , আল্লাহ আপনাকে উত্তম আরেকজন দিয়ে তাকে প্রতিস্থাপন করেছেন।” তার মুখের অভিব্যক্তি অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে উঠলো। তিনি বললেন, “আল্লাহ আমাকে তার চেয়ে উত্তম কাউকে দিয়ে প্রতিস্থাপন করেননি, সে আমার উপর বিশ্বাস করেছিল যখন লোকেরা অবিশ্বাস করতো, সে আমাকে তার সম্পত্তি দিয়ে শক্তি যুগিয়েছিল যখন লোকেরা আমাকে পরিত্যাগ করেছিল, তার মাধ্যমে আল্লাহ আমাকে সন্তান দিয়েছেন।” একথা শুনে আয়েশা(রাঃ) তাকে বললেন, “যিনি আপনাকে সত্য বাণী সহ পাঠিয়েছেন আমি তার কসম করে বলছি, আজকের পর আমি তার প্রশংসা ছাড়া আর কোন কথা বলবো না।”

কাবাঘর পুনঃনির্মাণ এবং বিবাদের মীমাংসা

যুবক মোহাম্মদ যখন পয়ত্রিশ বছর বয়সে পদার্পণ করেন, তখন কুরাইশগণ কাবাঘর পুনঃনির্মাণের কাজ শুরু করে। কারণ, কাবাঘরের স্থানটি চারদিকে দেয়াল দ্বারা পরি বেষ্টিত ছিল মাত্র। দেওয়ালের ওপর কোন ছাদ ছিল না। এই অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে কিছু সংখ্যাক চোর কাবা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে সেখানে রক্ষিত অনেক মূল্যবান সম্পদ ও অলংকারাদি চুরি করে নিয়ে যায়। কাবাঘর অনেক আগে নির্মিত হওয়ার কারণে দেয়াল গুলোতে ফাটল সৃষ্টি হয়ে তা যে কোন সময় ধসে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। তাছাড়া সে বছরেই মক্কা নগরী বন্যার কারণে পানির নিচে তলিয়ে যায়। এতে কাবামুখী জলধারা প্রবলবেগে প্রবাহিত হওয়ায় কাবা ঘরের দেওয়ালের মারাত্মক ক্ষতি হয় এবং ধসে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয় । তাই কুরাইশগন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল যে, কাবা ঘরের মর্যাদা অখুন্ন রাখার উদ্দেশ্যে তা পুনঃনির্মাণ করা হবে। এই উদ্দেশ্যে সকল গোত্রপতিরা একত্রিত হয়ে সম্মিলিতভাবে কতগুলো নীতি নির্ধারণ করল। তার মধ্যে অন্যতম নীতি হলো কাবাঘর নির্মাণ করতে কেবল বৈধ অর্থ-সম্পদ ব্যবহার করা হবে । বেশাবৃত্তির মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ, সুদের অর্থ এবং অন্যের হক নষ্ট করে সংগৃহীত হয়েছে- এমন কোন অর্থ নির্মাণ কাজে ব্যবহার করা যাবে না। সবাই এই সকল নীতির সঙ্গে একমত হয়ে নির্মাণ কাজ শুরুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করল। প্রত্যেক গোত্র যেন নির্মাণ কাজে অংশগ্রহণ করার সুযোগ লাভ করতে পারে, সেজন্য কোন গোত্র কোন অংশের কাজ করবে তা আগেই নির্ধারণ করা হয়েছিল। ফলে প্রত্যেক গোত্রই আলাদা আলাদা ভাবে পাথর সংগ্রহ করে রেখেছিল। নির্মাণ কাজ শুরু হলো। যখন নির্মাণকাজ কৃষ্ণপাথরের স্থানে গিয়ে পৌঁছল, তখন নতুন এক সমস্যার সৃষ্টি হল-হাজরে আসওয়াদ বা কৃষ্ণপাথরের স্থানে কে বা কোন গোত্র তা পুনঃস্থাপন করার গৌরব অর্জন করবে- তা নিয়ে। কেউ কোন ছাড় দিতে রাজি না। এ ব্যাপারে তারা রক্তারক্তি করতেও পিছপা হবে না। সবাই আতঙ্কিত, কখন যে যুদ্ধ বেধে যায়, কে জানে! এমন বিভীষিকাময় পরিস্থিতিতে বর্ষিয়ান নেতা 'আবু উমাইয়া মাখমুমি' প্রস্তাব করলো যে, আগামীকাল সকালে

যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে, তার ওপরেই এই বিবাদ মীমাংসার দায়িত্ব অর্পণ করা হোক। উপস্থিত সকলেই এই প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করল। দেখা গেল - সকল আরবের প্রিয় পাত্র ও শ্রদ্ধেয় আল-আমিনই সর্বপ্রথম মসজিদে হারামে প্রবেশ করেছেন। তার কাছে বিস্তারিত বলার পর তিনি একটি চাদর চাইলেন । তাকে চাদর দেওয়া হলে তিনি মেঝের ওপর তা বিছিয়ে দিয়ে কৃষ্ণপাথরটি চাদরের ওপর তুলে রাখলেন। তারপর গোত্রপতিদের চাদরটির চার কোনায় ধরে কৃষ্ণ পাথরটি বহন করে নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে যেতে বললেন। অতঃপর তিনি নিজে কৃষ্ণপাথরটি উঠিয়ে তা যথাস্থানে রেখে দিলেন ।এই মীমাংসা সকলেই সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নিল। অত্যন্ত সহজ, সুশৃংখল ও ন্যায়-সঙ্গত পন্থায় জ্বলন্ত একটি সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান হয়ে গেল। কাবাঘর পুনঃনির্মাণ করতে গিয়ে কুরাইশদের নিকট বৈধ টাকার ঘাটতি দেখা দিল। তাই উত্তর দিক থেকে কাবা ঘরের দৈর্ঘ্য আনুমানিক নয় ফিট পর্যন্ত কমিয়ে দেওয়া হল। এই অংশটুকুই 'হিজর' বা 'হাতিম' নামে প্রসিদ্ধ। কুরাইশগণ কাবার দরজা ভূমি থেকে উঁচু করে দিল, যেন এর মধ্য দিয়ে সেই ব্যক্তিই প্রবেশ করতে পারে - যাকে অনুমতি দেওয়া হবে। ঘরের অভ্যন্তরে ছয়টি পিলার বা স্তম্ভ নির্মাণ করা হলো এবং তার ওপর ছাদ দেওয়া হল।

নবুয়ত লাভ

মুহাম্মদ (সাঃ) যখন চল্লিশ বছরে পদার্পণ করলেন, তখন তাঁর দীর্ঘদিনের বিচার-বিবেচনা, বুদ্ধিমত্তা ও চিন্তাভাবনা- যা জনগণ এবং তার মধ্যে ব্যবধানের এক প্রাচীর সৃষ্টি করে চলেছিল- তা উন্মুক্ত হয়ে গেল। আস্তে আস্তে তিনি নির্জনতাপ্রিয় হয়ে উঠলেন। খাবার ও পানি সাথে নিয়ে মক্কা হতে দুই মাইল দূরত্বে অবস্থিত হেরা পর্বতের এক নির্জন গুহায় ধ্যানমগ্ন হতে লাগলেন। তিনি যখন সেখানে গমন করতেন তখন বিবি খাদিজাও তাঁর সাথে যেতেন এবং নিকটবর্তী কোন জায়গায় অবস্থান করতেন। এই নির্জনপ্রিয়তা ছিল প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তায়ালার ব্যবস্থাপনার একটি অংশ। এভাবেই আল্লাহ তাআলা ভবিষ্যতের এক মহতী কর্মসূচির জন্য তাকে প্রস্তুত করেছিলেন। যে আত্মার নসিবে এক মহান আসমানী নিয়ামত নির্ধারিত হয়ে গেছে, যিনি পথভ্রষ্ট মানুষকে সঠিক নির্দেশনা দিয়ে করবেন ধন্য, তাঁর জন্য সমাজ জীবনের যাবতীয় ব্যস্ততা, জীবনযাত্রা নির্বাহের ঝামেলা ও সমস্যা থেকে মুক্ত হয়ে নির্জনতা অবলম্বনের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভ করা অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। নির্জন হেরা গুহার সেই ধ্যানমগ্ন অবস্থায় তিনি আধ্যাত্মিক জগতে পরিভ্রমণ করতেন এবং লুকায়িত অদৃশ্য রহস্য সম্পর্কে চিন্তাভাবনা ও গবেষণা করতেন যাতে- আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নির্দেশ আসামাত্রই তা বাস্তবায়নে উদ্যোগী হতে পারেন। এভাবে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এবং বছরের পর বছর অতিবাহিত হতে হতে তৃতীয় বর্ষ অতিবাহিত হল, তখন আল্লাহতায়ালা মানুষের উপর রহমত বর্ষণের ইচ্ছা করলেন। মহান আল্লাহ জিব্রাইল (আঃ)-র মাধ্যমে কুরআনুল কারিমের কয়েকটি আয়াত নাজিল করে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ (সাঃ)-কে নবুয়তের মহান মর্যাদায় অভিষিক্ত করলেন। আল্লাহর দূত জিব্রাইল (আঃ) আগমন করে বললেন, 'আপনি পড়ুন ।' তিনি বললেন, 'আমি পড়তে জানি না।' জিব্রাইল (আঃ) তাকে অত্যান্ত শক্তভাবে আলিঙ্গন করলেন এবং তারপর ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'আপনি পড়ুন।' মুহাম্মদ (সাঃ) জবাব দিলেন, 'আমি পড়তে জানি না।' তারপর জিব্রাইল (আঃ) তাঁকে তৃতীয় দফায় আলিঙ্গনবদ্ধ করার পর ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'আপনি পড়ুন।'

নবুয়ত লাভের মাস ও দিন তারিখ সম্পর্কে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন মাসটি ছিল রবিউল আউয়াল, কেউ বলেন রমজানুল মোবারক, কেউ বলেন রজব। তবে মাসটি রমজানুল মোবারক হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, কারণ আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে এরশাদ করেছেনঃ

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ (سورة البقرة-١٨٥)

অর্থঃ “রমযান মাসই হল সে মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে কোরআন” (সূরা বাকারাঃ ১৮৫)

কুরানুল কারিমে আরও এরশাদ হয়েছেঃ

)১- القدر سورة (○ِإِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

অর্থঃ "আমি একে নাযিল করেছি শবে-কদরে।" (সূরা কদরঃ ১)

কুরানুল কারিমে আরও এরশাদ হয়েছেঃ

)৩ - سورة الدخان (○َإِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ ۚ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِين

অর্থঃ "আমি একে নাযিল করেছি। এক বরকতময় রাতে, নিশ্চয় আমি সতর্ককারী।" (সূরা দুখানঃ ৩)

প্রথম ওহী নাযিল হওয়ার সময় তিনি কিছুটা ভয়-ভীতির সাথে বিস্ময়াবিভূত হয়ে পড়েন। তার মানসিকতায় কিছুটা বিহবলতার ভাবও পরিলক্ষিত হতে থাকে। সে কারণেই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কিছুদিন ওহী নাযিল বন্ধ রাখেন- যাতে তিনি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার সুযোগ লাভ করেন। যখন তিনি মন- মানসিকতার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক হয়ে উঠলেন, তখন তার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেল যে, তিনি আল্লাহর 'বার্তা বাহক' বা 'রাসূল' মনোনীত হয়েছেন। সেই সঙ্গে তার কাছে যিনি ওহী নিয়ে আগমন করেছিলেন তিনি হচ্ছেন আসমানী দুত বা ওহিবাহক। এই ব্যাপারটি যখন তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল তখনই তিনি পরবর্তী ওহী নাযিলের জন্য উন্মুখ হয়ে অপেক্ষায় ছিলেন। ওহি গ্রহণের জন্য মানসিকভাবে যখন প্রস্তুত হয়ে গেলেন, তখন জিব্রাইল আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় ওহি নিয়ে আগমন করলেন।

ওহি বিভিন্নভাবে নাযিল হতো:

ক. স্বপ্নের মাধ্যমে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উপর ওহি নাযিল হয়

খ. জিব্রাইল ফেরেশতা দেখা না দিয়ে অর্থাৎ দৃষ্টির আড়ালে থেকেই রসূল (সাঃ)-এর অন্তরে ওহি প্রবেশ করিয়ে দেন।

গ. জিব্রাইল ফেরেশতা মানুষের আকৃতি ধারণ করে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সম্বোধন করতেন। অতঃপর তিনি যা কিছু বলতেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তা মুখস্থ করে নিতেন। এই অবস্থায় সাহাবীগণও জিব্রাইল ফেরেশতাকে দেখতে পেতেন।

ঘ. ওহি নাযিল হওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ঘণ্টা বাজার শব্দের মত ঢং ঢং শব্দ শুনতে পেতেন। ওহি নাযিলের এটাই ছিল সবচেয়ে কঠিন অবস্থা।

ঙ. কখনো কখনো জিব্রাইল ফেরেশতা তার স্বাভাবিক আকৃতিতে রাসূল (সাঃ)-র নিকট ওহি নিয়ে আগমন করতেন।

চ. পবিত্র মিরাজের রাতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন আকাশে অবস্থান করছিলেন , সেই

সময় আল্লাহ তায়ালা সালাত এবং অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে সরাসরি হুকুমের মাধ্যমে ওহি নাযিলের ব্যবস্থা করেছিলেন।

ছ. আল্লাহ তাআলার সাথে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-র সরাসরি কথোপকথন। যেমনটি হয়েছিল মুসা (আঃ)-র সাথে।

ইসলামের প্রচার কাজ

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-র দাওয়াতি কার্যক্রমকে সময়ের বিচারে নিম্নোক্ত ভাগে বিভক্ত করা যায়:

প্রথম ধাপ: গোপন দাওয়াত। এভাবে দাওয়াত চলে নবুওয়াত প্রাপ্তির পর থেকে তিন বছর পর্যন্ত।

দ্বিতীয় ধাপ: সামরিক অভিযান ব্যতীত প্রকাশ্য দাওয়াত। হিজরত পর্যন্ত এইভাবে দাওয়াতি কাজ চলতে থাকে।

তৃতীয় ধাপ: প্রকাশ্য দাওয়াত এবং প্রয়োজনে সামরিক অভিযানে যুক্তদের সাথে সঙ্গ দেওয়া। হুদাইবিয়ার সন্ধি পর্যন্ত এই ধারা চলতে থাকে।

চতুর্থ ধাপ: প্রকাশ্য দাওয়াত এবং দ্বীনের দাওয়াতে বাধা প্রদানকারী যে কারো বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনা ।এটাই সর্বদা চলমান ধারা। কিয়ামত পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত থাকবে।

গোপন দাওয়াত

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নবুওয়াত প্রাপ্তির পর প্রথম প্রথম গোপনে ইসলামের দাওয়াত দিতেন। তিনি নিজের প্রাণনাশের ভয়ে এমনটি করেননি; বরং তা ছিল আল্লাহ তাআলার নির্দেশের কারণ। যখন আল্লাহ তাআলা তাকে দাওয়াতের কাজ ফরজ করে দিলেন তখন সূরা মুদ্দাসসির নাযিল করলেন। যাদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-র প্রবল ধারণা ছিল যে, তারা তার কথা মনোযোগসহ শুনবেন এবং ইসলাম গ্রহণ করবেন, প্রাথমিক পর্যায়ে দাওয়াত শুধু তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখার নির্দেশ ছিল। স্বল্পসংখ্যক যুবক এবং দুর্বল কিছু মানুষ তার আহবানে সাড়া দেন। ধীরে ধীরে তার ওপর ঈমান আনা মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় । স্বাধীনদের মধ্যে হযরত আবু বকর (রাঃ), নারীদের মধ্যে হযরত খাদিজা (রাঃ) ,তরুণদের মধ্যে হযরত আলী (রাঃ) ,মুক্ত গোলামদের মধ্যে হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ) এবং গোলাম বা দাসদের মধ্যে হযরত বেলাল (রাঃ) সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন।

ইসলামের প্রচার- প্রসারের ব্যাপারে কুরাইশরা উড়ো খবর পাচ্ছিল, কিন্তু তারা সেটাকে গুরুত্ব দেয়নি। সম্ভবত তারা মুহাম্মদ (সাঃ)-কে তেমনি একজন ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ভেবেছে, যারা একত্ববাদ সংক্রান্ত আলোচনা করতেন। তবে ধর্মের পরিধি বৃদ্ধি পেতে দেখে কুরাইশরা অবশ্যই শঙ্কা অনুভব করেছে এবং তারপর থেকে তাদের সতর্ক দৃষ্টি ছিল নবীজির শিক্ষা ও তার ফলাফলের উপর।

প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার

গোপনে প্রায় তিন বছর ইসলাম প্রচারের পর আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে নির্দেশ এলঃ

وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِين (سورة الشعراء - ٢١٤)

অর্থঃ "আপনি নিকটতম আত্মীয়দেরকে সতর্ক করে দিন।" (সূরা আশ-শো'আরাঃ ২১৪)

উক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) 'বনু হাসিম' গোত্রকে নিয়ে এক সম্মেলনের আয়োজন করেন। সেই সম্মেলনে বনু মুত্তালিব বিন আবদ মানাফেরও একদল লোক উপস্থিত ছিল। সম্মেলনে উপস্থিত লোকদের সংখ্যা ছিল পঁয়তাল্লিশ জন। সম্মেলনের শুরুতেই রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-র চাচা আবু লাহাব অর্থহীন আস্ফালন শুরু করলেন। এই অর্থহীন আস্ফালনের বিপরীতে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) নীরবতা অবলম্বন করলেন এবং ওই নীরবতার মধ্য দিয়েই সম্মেলন শেষ হয়ে গেল। এরপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সর্বগোত্রের লোকজনদের একত্রিত করে দ্বিতীয় সম্মেলনের ব্যবস্থা করেন। সম্মেলনে উপস্থিত লোকদের উদ্দেশ্যে তিনি বললেন- "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য। আমি তার প্রশংসা বর্ণনা করছি এবং তারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি। তার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করছি, তার ওপরেই নির্ভর করছি এবং সাক্ষ্য প্রদান করছি, আল্লাহ ছাড়া আর কেউই উপাসনার যোগ্য নয় । তিনি একক ও অদ্বিতীয়, তার কোন অংশীদার নেই।" এবারও আবু লাহাব বিরোধিতা করলে, তার চাচা আবু তালিব আল্লাহর শপথ করে বললেন, যতক্ষণ তার দেহে প্রাণ থাকবে, তিনি মুহাম্মদ (সাঃ)-কে হেফাজত করতে থাকবেন।

রাসূল (সাঃ) যখন নিশ্চিত হলেন যে, আল্লাহর দ্বীন প্রচারের ব্যাপারে আবু তালিব তাকে সাহায্য করবেন, তখন একদিন তিনি সাফা পর্বতে আরোহন করে জনসাধারণকে উচ্চ স্বরে আহ্বান জানালেন। তারপর তিনি সকলকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহর একত্ববাদ, নিজের নবুয়তপ্রাপ্তি এবং পরকালীন জীবনের উপর বিশ্বাস স্থাপনের জন্য আহ্বান জানালেন। তিনি তাদের পাপ ও আল্লাহদ্রোহিতার ভীষণ পরিণাম এবং তার জন্য অবসম্ভাবী কঠোর দন্ডের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। এতে আবু লাহাব ক্ষিপ্ত হয়ে রাসূলুল্লাহর প্রতি অভিসম্পাত করায় আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন।

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَب (سورة المسد - ١)

অর্থঃ "আবু লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হোক এবং ধ্বংস হোক সে নিজে।" (সূরা লাহাবঃ ১)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আত্মীয়দের দাওয়াত দেওয়ার পর আল্লাহর পক্ষ থেকে আদেশ আসে

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (سورة الحجر- ٩٤)

অর্থঃ "অতএব আপনি প্রকাশ্যে শুনিয়ে দিন যা আপনাকে আদেশ করা হয় এবং মুশরিকদের পরওয়া করবেন না।"(সূরা হিজরঃ ৯৪)

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নবীজি (সাঃ)-কে আদেশ দিচ্ছেন যে, তিনি যেন প্রকাশ্যে জনসম্মুখে দাওয়াত ও তাবলীগের দায়িত্ব পালন করেন এবং লোকদেরকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানান, যাতে তারা মুসলমান হয়ে যায়। পাশাপাশি একথাও বলা হয়েছে যে, তিনি যেন দাওয়াতের পথে ধৈর্য অবলম্বন করেন এবং মূর্খ, শত্রু ও মিথ্যারোপকারীদের সামনে প্রমাণ উপস্থাপন করার পর তাদের প্রতি বিমুখতা প্রদর্শন করেন। ইসলামের প্রকাশ্য ঘোষণা করার পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-র ইসলাম প্রচারের পদ্ধতি ছিল , যেখানেই কিছু লোকের জটলা দেখতে পেতেন, তিনি সেখানে গিয়ে তাদেরকে সম্বোধন করে কথা বলতেন, কুরআন তেলাওয়াত করে শোনাতেন এবং আকর্ষণীয় রূপে ইসলামের দাওয়াত দিতেন। কিছু সৌভাগ্যবান রাসূল (সাঃ)-র কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন এবং তার আহবানে সাড়া দিতেন ।কিন্তু কিছু হতভাগা ঠাট্টা -বিদ্রুপ করতো। মুসলমানদের সংখ্যা যত বাড়তে লাগলো, ততই কাফেরদের শত্রুতা বাড়তে থাকলো। নবীজির চাচা আবু লাহাব শত্রুতার সকল সীমা অতিক্রম করে।

রাসূল (সাঃ) বহুত্ববাদের বিশ্বাস এবং মিথ্যার পর্দা উন্মোচন করে, প্রতিমার প্রকৃতি ও মর্যাদার অসারতা সম্পর্কে প্রকাশ্যে কথা বলা শুরু করলেন। এই প্রতিমাগুলোর জড়ত্ব , অসমর্থতা ও অকর্মণ্যতা সম্পর্কে যুক্তি-প্রমাণ তিনি জোরালো কণ্ঠে তুলে ধরলেন। সেই সঙ্গে যারা এদের আল্লাহ এবং নিজের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে বানিয়ে নিয়েছে, তারা যে কতটা ভ্রষ্টতার মধ্যে ডুবে রয়েছে, তাও বলতে লাগলেন। মূর্তি পূজক ও মুশরিকদের বিরুদ্ধে সত্যের এই আপোসহীন ঘোষণা যেন যুগ যুগান্তরের বহুত্ববাদী বিশ্বাসের ভিত্তিমূলে ফাটল ধরিয়ে দিল। কুরাইশগণ এই সদ্য অঙ্কুরিত একত্ববাদের মূলোৎপাটন করার জন্য উঠে পড়ে লাগলো। কারণ , তারা জানত একত্ববাদ, নবুয়ত ও পরকালীন জীবনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করার অর্থই হবে শর্তহীনভাবে মহান আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা এবং কোন আপত্তি ছাড়াই তার আদেশ নিষেধ মেনে চলা। এর অর্থ দাঁড়াবে, ধর্মীয় ব্যাপারে আরবদের ওপর মক্কাবাসী যে পৌরোহিত্য ও নেতৃত্বের মর্যাদা লাভ করে আসছিল - তা সমূলে উৎপাটিত হয়ে যাবে। দুর্বল শ্রেণীর লোকজনদের প্রতি কুরাইশরা যে অন্যায়- অত্যাচার করে এসেছে এবং সকাল সন্ধ্যা যেসব অপকর্মের সাথে সম্পৃক্ত থেকেছে, সেসব করার আর কোনো সুযোগই থাকবে না ।এজন্যই তারা এই অবস্থাকে মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। আল্লাহর একত্ববাদ এবং দ্বীন সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) যে সমস্ত কথা বললেন- কুরাইশগণ তার সত্যতা

ও যথার্থতা উপলব্ধি করলেও মাত্র একটি কারণে তা মেনে নিতে পারল না। কারণটি হচ্ছে, নিজেদের কায়েমি স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়া। অথচ আল্লাহ ও রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে অস্বীকার করা কিংবা এড়িয়ে চলার ক্ষমতাও তাদের ছিল না। এমন পরিস্থিতিতে তারা যেন কিছুটা দিশেহারা হয়ে পড়ল। কুরাইশ গোত্রের কয়েকজন নেত্রীস্থানীয় ব্যক্তি একত্রিত হয়ে আবু তালিবের নিকট পরামর্শের জন্য গেলে তিনি তাদের দাবি দাওয়ার বিষয়ে অত্যন্ত ঠান্ডা মেজাজে বিভিন্ন কথাবার্তা বলে তাদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে বিদায় করলেন। এদিকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) পূর্ণোদ্যমে প্রচারকার্য চালিয়ে যেতে থাকলেন।

রাসূল (সাঃ) এভাবে লোকদেরকে এক আল্লাহর বন্দেগীর প্রতি আহ্বান জানাচ্ছিলেন, তার ফলে মুসলমানদের ধর্মীয় সামাজিক ও স্বভাবগত অবস্থা উঁচু থেকে উঁচু হচ্ছিল। এ সময় একদিন জিব্রাইল (আঃ) অত্যন্ত সুন্দর আকৃতিতে খুশবু মেখে রাসুল (সাঃ) এর কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, “হে মুহাম্মদ , আল্লাহ্‌তালা আপনাকে সালাম জানাচ্ছেন এবং বলছেন আপনাকে মানুষ ও জিন জাতির নিকট রাসূল হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে। আপনি তাদেরকে কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুর দাওয়াত দিতে থাকুন।” রাসূল (সাঃ) আল্লাহ তাআলার এই আদেশ যে এখলাস ও দৃঢ়তার সাথে পালন করেছেন এবং যে হেকমত ও প্রজ্ঞার সাথে লোকদেরকে আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহ্বান করেছেন, তা দাওয়াত ও তাবলীগের জন্য আদর্শ দৃষ্টান্ত হয়ে গেছে।

মুসলিমদের প্রতি কাফের-মুশফিকদের অন্যায় অত্যাচার

নবুয়তের চতুর্থ বছরে যখন প্রথমবারের মতো সর্বসাধারণের কাছে ইসলামের দাওয়াত পেশ করা, হল তখন মুশরিকরা তা প্রতিহত করার কৌশল হিসেবে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন। তারা পঁচিশ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করেন, যার অধিনায়ক ছিলেন মুহাম্মদ (সাঃ) এর চাচা আবু লাহাব। সেই কমিটির সদস্যগণ যুক্তি ও পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, মুহাম্মদ (সাঃ)-কে ইসলাম প্রচার থেকে নিবৃত্ত করতে হবে। সেই সঙ্গে মুসলিমদের ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে আনতে প্রয়োজনে তারা ভয়ানক শাস্তির ব্যবস্থা করবে আর এই শাস্তির ব্যবস্থা করতে তারা কোন ধরনের দ্বিধা-সংকোচ করবে না।

মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি আবু লাহাবের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অত্যান্ত মারমুখী ও কঠোর । সে সাফা পর্বতের উপর মুহাম্মদ (সাঃ)-কে মারার জন্য পাথর খন্ড হাতে নিয়েছিল। নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে রাসূল (সাঃ)-এর দুই মেয়ের সাথে আবু লাহাব তার দুই ছেলের বিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু নবুয়তপ্রাপ্তির পর সে প্রতিহিংসাবসত তার দুই ছেলেরই বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটায়। তার পাশবিকতার আরো একটি ঘটনা হচ্ছে- মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পুত্র আব্দুল্লাহ যখন মারা যান তখন সে উল্লাসে ফেটে পড়ে। সে মক্কার প্রান্তরে দৌড়াতে দৌড়াতে এই দুঃসংবাদকে শুভ সংবাদ হিসেবে প্রচার করে। হজের মৌসুমে আবু লাহাব রাসূল (সাঃ)-কে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে বাজার ও গণ জমায়েতে তার পেছনে লেগে থাকত এবং মানুষের মাঝে

অপপ্রচার চালাত। আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামিল ছিল অত্যান্ত বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসা পরায়ণ মহিলা। এসব দুষ্কর্মে সে স্বামী থেকে পশ্চাদপদ ছিল না। সে রাসূল (সাঃ)-এর চলার পথে ও দরজায় কাঁটা ছড়িয়ে রাখতো। সেইসঙ্গে রাসুল (সাঃ)-কে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করা, কটুক্তি করা, মিথ্যা অপবাদ দেওয়া ইত্যাদি নানাবিধ জঘন্য কাজে সে লিপ্ত থাকতো। তাছাড়া মুসলমানদের বিরুদ্ধে নানাবিধ উস্কানি দিয়ে যুদ্ধের বিভীষিকা তৈরি করা ছিল তার অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এজন্যই কুরআনে তাকে লাকড়ির বোঝা বহনকারীনি বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

যেসব লোক রাসূল (সাঃ)-কে তার বাড়িতে জ্বালা-যন্ত্রনা দিত, তাদের নেতৃত্ব দিত আবু লাহাব, হাকাম বিন আবুল আস বিন উমাইয়া, উকবা বিন আবু মুয়াইত, আদি বিন হামরা সাকাফি, ইবনুল আসাদ হুযাইলি। এরা সকলেই ছিল তার প্রতিবেশী। এদের মধ্যে হাকাম বিন আবুল আস ছাড়া আর কেউই ইসলাম গ্রহণ করেনি। রাসুল (সাঃ)-এর উপর তাদের জুলুম নির্যাতনের ধরনটা ছিল এমন - তিনি যখন সালাত আদায় করতেন, তখন তাকে লক্ষ্য করে ছাগলের নাড়ি-ভুঁড়ি ও মলমূত্র নিক্ষেপ করা হতো। একবার রাসূল (সাঃ) বাইতুল্লাহর পাশে সালাত আদায় করছিলেন। এমন অবস্থায় উকবা বিন আবু মুয়িত উটের ভুড়ি নিয়ে তার পিঠের উপর চাপিয়ে দিল। এরপর তারা আনন্দ ও উত্তেজনায় পরস্পর পরস্পরের গায়ে ঢলাঢলি , জড়াজড়ি করে মাতামাতি শুরু করে দিল । মনে হল, তাদের জন্য এর চেয়ে বড় আমোদ - ফুর্তির আর কিছুই হতে পারে না। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কয়েকজনের নাম ধরে আল্লাহর দরবারে অভিযোগ পেশ করেন- তারা হলেন আবু জেহেল, উতবা বিন রাবিয়া, শায়বা বিন রাবিয়া, অলিদ বিন উতবা, উমাইয়া বিন খালফ এবং উকবা বিন আবু মুয়াইত। পরবর্তীতে তাদের সকলকেই বদর যুদ্ধে নিহত হয়ে কুয়োর মধ্যে পতিত অবস্থায় দেখা গেছে।

মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ওপর এমনিভাবে অন্যায়-অত্যাচার ও উৎপীড়ন চালিয়ে আসছিল। মক্কার সবচেয়ে প্রভাবশালী ও মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব আবু তালিবের ছত্রছায়ায় আশ্রিত থাকা সত্ত্বেও যেখানে স্বয়ং মুহাম্মদ (সাঃ)-কে এমন জুলুম নির্যাতনের শিকার হতে হচ্ছিল, সেক্ষেত্রে গরিব সাধারণ মুসলমানদের কথা তো বলাই বাহুল্য । গরিব মুসলমানদের উপর এত নিষ্ঠুরতার সাথে নির্যাতন চালানো হতো যে তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

আবু জেহেল যখন কোন সম্ভ্রান্ত বা শক্তিধর ব্যক্তির মুসলমান হওয়ার কথা শুনতো, তখন সে তাকে যাচ্ছেতাই বলে গালিগালাজ করত, অপমান-অপদস্থ করতো এবং ধন সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি করবে বলে ভয় দেখাতো। জ্ঞাতিগোষ্ঠীর কোন দুর্বল লোক যদি মুসলমান হত, তাহলে তাকে সে অত্যান্ত নির্দয়ভাবে মারধর করতো এবং অন্যদেরও মারধর করার জন্য প্ররোচিত করত।

উসমান বিন আফফান (রাঃ)-এর চাচা তাকে খেজুর পাতার চাটাইয়ের মধ্যে জড়িয়ে রেখে

নিচের থেকে আগুন লাগিয়ে ধোঁয়া দিত।

মুসয়াব বিন উমায়ের (রাঃ)-র মা যখন তার ইসলাম গ্রহণের খবর জানতে পারলো, তখন সে তার খানা-পানি বন্ধ করে দিল এবং তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিল। প্রথম জীবনে তিনি আরাম-আয়েশ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দে বড় হয়েছিলেন। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর তিনি এতই কঠিন কষ্টের সম্মুখীন হয়েছিলেন যে, সাপের গা থেকে খুলে পড়া খোলসের মতো তার গায়ের চামড়া খুলে খুলে পড়তো।

বেলাল (রাঃ) উমাইয়া বিন খালফ জুমাহির ক্রীতদাস ছিলেন। তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করায় উমাইয়া তার গলায় রশি বেঁধে দুষ্ট ছেলেদের হাতে ধরিয়ে দিত। তারা সেই রশি ধরে তাকে পথে-প্রান্তরে টেনে- হিঁচড়ে-নিয়ে বেড়াত। এমনকি টানাটানির ফলে তার গলায় রশির দাগ বসে যেত। হাত-পা বেঁধে তাকে প্রহার করত এবং প্রখর রোদে বসিয়ে রাখতো। তাকে খানা-পানি না দিয়ে ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত রাখত। দুপুর বেলা প্রখর রৌদ্রের সময় কংকর ও বালি আগুনের মত উত্তপ্ত হয়ে উঠলে, তাকে সেই উত্তপ্ত বালির উপর শুইয়ে দিয়ে বুকে পাথর চাপা দেওয়া হতো। ওই অবস্থাতেই তিনি বলতেন - 'আহাদ, আহাদ (আল্লাহ এক ,আল্লাহ এক)!' একদিন বেলাল (রাঃ) এমনতর দুঃসময় অবস্থার মধ্যে নিপতিত ছিলেন, তখন আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন । তিনি বেলাল (রাঃ)-কে এক কালো দাস এবং ২০০ দেরহাম- এর বিনিময়ে ক্রয় করে মুক্ত করে দেন।

'আম্মার বিন ইয়াসির' বনু মাখমুমের ক্রীতদাস ছিলেন। তিনি ও তার পিতা - মাতা সকলে একই সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের কারণে তাদের ওপর কিয়ামতের আজাব নেমে আসে। ইয়াসির (রাঃ)-র দুই পায়ে দুটি রশি বেঁধে দেওয়া হয় এবং রশির দুই মাথা দুটি উটের পায়ে বেঁধে দিয়ে উট দুটিকে খুব জোর কদমে বিপরীতমুখে তাড়ানো হয় এর ফলে তার দেহ দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায় এবং তৎক্ষণাৎ তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

পাষণ্ড আবু জেহেল সুমাইয়া (রাঃ)-এর গোপনাঙ্গে বর্ষা বিদ্ধ করে তাকে হত্যা করেন । মুসলিম মহিলাদের মধ্যে সুমাইয়াই ছিলেন প্রথম শহীদ।

আবু জাহেলের নেতৃত্বে মুশরিকরা আম্মার (রাঃ)-কে উত্তপ্ত বালির উপর শুইয়ে দিয়ে শাস্তি দিত।

খাব্বাব দিন আরাত (রাঃ) খুজাইমা গোত্রের উম্মে আনমার নামের এক মহিলার দাস ছিলেন। মুশরিকরা তার ওপর নানা ধরনের নির্যাতন চালাত। কখনো বা খুব শক্ত হাতে তার চুল টানাটানি করতো, কখনো বা ঘাড় ধরে মুচড়িয়ে দিত ।একসময় তাকে কাঠের জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর শুইয়ে দিয়ে তার বুকের উপর পাথর চাপা দেওয়া হয়েছিল - যাতে তিনি উঠতে না পারেন। এতে তার পৃষ্ঠদেশ পুড়ে ধবল কুষ্ঠ রোগের মত সাদা হয়ে গিয়েছিল।

নবীজিকে হত্যার ষড়যন্ত্র

একবার কুরাইশ সর্দাররা হাতিমে একত্র হয়। তারা তাদের মূর্তি লাত, উযযা, মানাত , নায়েলা ও আসাফের কসম খায় এবং সিদ্ধান্ত নেয় যে, মুহাম্মদ (সাঃ)-কে দেখামাত্র সবাই তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। তাঁকে হত্যা করার আগ পর্যন্ত কেউ পিছু হটবে না। নবী কন্যা ফাতেমা (রাঃ) এই চক্রান্তের কথা জেনে যান। তিনি কাঁদতে কাঁদতে নবীজি (সাঃ)-কে এ ব্যাপারে বললে, তিনি নিশ্চিন্ত মনে বললেন, "প্রিয় কন্যা, চিন্তা করো না। ওরা আমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।" এরপর তিনি অজু করে হারামে গেলেন। ওই পাথরহৃদয় লোকেরা তাকে দেখে চিৎকার করে বলল, "ওই তো তিনি এসে গেছেন। চলো সবাই।" কিন্তু একথা বলা মাত্রই তাদের চোখ অবনত হয়ে গেল এবং গর্দান ঝুকে গিয়ে বুকের সাথে লেগে গেল। তারা হতবাক হয়ে বসে রইল। নবীজির দিকে চোখ তুলে তাকানোরও সাহস হলো না কারো। কেউ তাঁকে হত্যার চেষ্টা করতে অগ্রসর হতে পারল না। তখন রাসূল (সাঃ) তাদের মাথার কাছে দাঁড়িয়ে মুঠি ভরে মাটি নিলেন এবং বললেন, "চেহারা সমূহ বিগড়ে যাক!" এরপর তিনি মুঠি ভর্তি মাটি তাদের দিকে নিক্ষেপ করলেন। ওই মাটি যাদের গায়ে লাগলো, এর পরিণতিতে তারা বদর যুদ্ধের দিন নিহত হয়।

রাসুল (সাঃ)-কে যখন বলা হল যে, মক্কার কুরাইশরা তাকে হত্যা করার প্রতিজ্ঞা করেছে, তখন তিনি সাফার দিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। তখন জিব্রাইল (আঃ) এসে বললেন, আল্লাহ তাআলা আসমান, জমিন ও পাহাড়কে আদেশ দিয়েছেন আপনার আনুগত্য করতে। আপনি চাইলে আসমানকে আদেশ দিতে পারেন তাদের উপর আযাব নাজিল করতে। চাইলে জমিনকে আদেশ দিতে পারেন, যেন তাদেরকে গিলে নেয়। আর চাইলে পাহাড়কে আদেশ দিতে পারেন, যেন তাদের উপর পতিত হয়ে তাদেরকে পিষে ফেলে। রাসূল (সাঃ) বললেন, "আল্লাহ তা'আলা যেন আমার উম্মতের উপর আযাব বিলম্বিত করেন। কেননা হতে পারে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাওবা ও ইস্তেগফার করার সুযোগ দিবেন।"

নামাজ পড়তে বাধা দেওয়ার দুঃসাহস

রাসূল (সাঃ) যখন বাইতুল্লাহ প্রাঙ্গনে নামাজ আদায় করতেন, তখন আবু জেহেল তাকে বাধা দিত। নবীজি (সাঃ)-কে সে ধমক দিয়ে বলতো, "মুহাম্মদ, আমি কি তোমাকে নামাজ পড়তে নিষেধ করিনি?" নবীজি (সাঃ)-ও তাকে ধমক দেন। তিনি আবু জেহেলের জামার কলার ধরে রাগান্বিত হয়ে বলেন, "তোমার জন্য ধ্বংসের উপর ধ্বংস। এরপর তোমার জন্য ধ্বংসের উপর ধ্বংস।"

আবু জেহেল একদিন কুরাইশ- সর্দারদের সামনে লাত উযযার কসম খেয়ে শপথ করেন যে, তিনি নবীজি (সাঃ)-কে সেজদারত অবস্থায় দেখলে তার ঘাড় মটকে দেবে। কিছুক্ষণ পরেই রাসূল (সাঃ) আগমন করেন এবং নামাজ আদায় করতে থাকেন । আবু জেহেল তার

মন্দ ইচ্ছা পূরণ করতে অগ্রসর হয়। কিন্তু হঠাৎই সে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পিছনে সরে আসে। সে দুই হাত বাড়িয়ে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছিল। কুরাইশ লোকেরা তার এই দুরবস্থার কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলল, "আমার ও মুহাম্মাদের মাঝে আগুনের গর্ত ও ফেরেশতাদের পাখা রয়েছে।" রাসূল (সাঃ) বলেন, "সে আমার নিকটবর্তী হলে ফেরেশতারা তার শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিঁড়ে ফেলতো।" তখন এ আয়াত নাযিল হয়ঃ

كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ ۝ أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ ۝ (سورة العلق-٦~٧)

অর্থঃ "সত্যি সত্যি মানুষ সীমালংঘন করে, এ কারণে যে, সে নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে।"(সূরা আলাকঃ ৬~৭)

আবিসিনিয়ায় হিজরত

মক্কার কাফির মুশরিকদের পক্ষ থেকে মুসলিমদের উপর অন্যায় অত্যাচার শুরু হয় নবুয়তের চতুর্থ বর্ষের মধ্যভাগে কিংবা শেষের দিক থেকে। দিন দিন জুলুম নির্যাতনের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে লাগলো। বৃদ্ধি পেতে পেতে পঞ্চম বর্ষের মধ্যভাগে তা চরম পর্যায়ে পৌঁছল এবং শেষ পর্যন্ত এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হল যে, মক্কায় মুসলিমদের টিকে থাকা একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়ল। তাই এই বিভীষিকার কবল থেকে রক্ষা পেতে তারা বিকল্প পথ খুঁজতে বাধ্য হলেন।

সেই অনিশ্চয়তা ও দুঃখ-দুর্দশার ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নাযিল হলো সূরা' কাহাফ।' এর মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে যে তিনটি ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো ছিল মুমিন বান্দাদের জন্য তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ইঙ্গিত স্বরূপ। যেমন: আসহাবে কাহাফ এর ঘটনা থেকে এই শিক্ষা পাওয়া যায় যে, যখন দীন ও ঈমান মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হয় তখন আল্লাহর অনুগ্রহের উপর ভরসা রেখে অন্যত্র হিজরত করা কর্তব্য। মুসা (আঃ) ও খিজির (আঃ) এর ঘটনাবলী থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, কোন কিছুর ফলাফল সব ক্ষেত্রেই প্রকাশ্য অবস্থান অনুযায়ী হয় না। কোন কোন ক্ষেত্রে বরং অবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীতও হয়ে থাকে। অতএব উক্ত ঘটনায় সেই কথার প্রতি সূক্ষ্মভাবে ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে যে, বর্তমান সময়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যে অন্যায় অত্যাচার করা হচ্ছে, তার ফল বৈপরীত্যের মধ্যেই সম্ভব হবে। প্রসঙ্গত এখানে জুলকারনাইন-এর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। জুলকারনাইনের ঘটনায় কয়েকটি নির্দিষ্ট বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে-

১. এই যে পৃথিবী, এর প্রকৃত মালিক হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলা। তিনি নিজ বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা তাকে উত্তরাধিকার দান করেন।

২. মানুষের যে সফলতা বা কৃতকার্যতা, এ প্রসঙ্গটির মূল সূত্র সংশ্লিষ্ট রয়েছে ঈমান বা বিশ্বাসের সাথে; কুফরি বা অবিশ্বাসের সাথে নয়।

৩. আল্লাহ তায়ালা নিজ বান্দাদের মধ্য থেকে এমন কতক ব্যক্তিকে ঈমান, আমল ও হিকমত দিয়ে থাকেন - যারা নিপীড়িত, নিগৃহীত ও নিষ্পেষিত মানুষকে জমানার ইয়াজুজ মাজুজের কবল থেকে পরিত্রাণ দিয়ে থাকেন ।

৪.আল্লাহর সৎ ও সদাচারী বান্দাই পৃথিবীর উত্তরাধিকার লাভের জন্য জন্য সর্বাধিক উপযুক্ত।

মুসলমানদের ওপর কাফির মুশরিকদের অত্যাচার নির্যাতনের মাত্রা যখন সীমা অতিক্রম করে গেল, তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তার উম্মতদের জন্য অস্থির হয়ে উঠলেন। একসময় হিজরতের কথা চিন্তাভাবনা করতে শুরু করলেন। তিনি অনেক আগে থেকেই আবিসিনিয়ার সম্রাট আসহামা নাজ্জাশীর উদারতা ও ন্যায় পরায়ণতা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। সেখানে কারো প্রতি যে অন্যায়-অত্যাচার করা হয় না - সে কথাও তিনি জানতেন। মুসলিমরা সেখানে হিজরত করলে নিরাপদে থাকা এবং নির্বিঘ্নে ধর্ম-কর্ম করার সুযোগ লাভ করবেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এ সব কিছু বিচার বিবেচনা করে সাহাবীদের আবিসিনিয়ায় হিজরতের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।

রাসুল (সাঃ)-র নির্দেশনা মোতাবেক নবুয়তের পঞ্চম বর্ষের রজব মাসে সাহাবায়ে কেরামদের বারজন পুরুষ ও চারজন মহিলার একটি দল মক্কা থেকে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। ওসমান ইবনে আফফান ছিলেন তাদের দলপতি। তার সাথে ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কন্যা রুকাইয়া। মুহাজীর দলটি রাতের অন্ধকারে সবার অলক্ষে রওনা হয়ে গেলেন নতুন গন্তব্যের উদ্দেশ্যে। কাফিররা যেন এই হিজরত সম্পর্কে কোন কিছু জানতে না পারে সেজন্য সর্বোচ্চ গোপনীয়তা অবলম্বন করা হয়। কিছুটা বিলম্বে কুরাইশরা এই হিজরত সম্পর্কে জানতে পেরে তাদের পিছু ধাওয়া করে, কিন্তু ততক্ষণে মুহাজিরগণ তাদের নাগালের বাইরে চলে যান। মুহাজীরগন সম্পূর্ণ নিরাপদ ও শান্তিতে আবিসিনিয়ায় বসবাস করতে লাগলেন।

উক্ত রমজান মাসে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার হারাম শরীফে গমন করে কুরাইশদের একটি বিরাট দলের সামনে উপস্থিত হয়েই আকস্মিকভাবে সূরা 'নাজম' পাঠ করতে শুরু করেন। তারা মন্ত্রমুগ্ধের মতো গভীর মনোযোগ সহকারে তা শুনতে লাগল; তাদের অন্তরে বিরূপ কোনো ভাবেরই উদ্রেক হলো না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন উক্ত সুরার শেষের আয়াত সমূহ পাঠ করতে থাকলেন, তখন তাদের অন্তরে কম্পন সৃষ্টি হতে লাগলো। যখন তিনি শেষের আয়াতটি পাঠ করলেন এবং সেই সঙ্গে সিজদায় গেলেন তখন আত্মসম্মোহিতের মতো সকলেই সিজদায় লুটিয়ে পড়ল। কুরআন মজিদের অলৌকিক মোহনীয়তা, মহিমাময় মাধুর্য ও স্বর্গীয় নির্দেশনা অহংকারী, আত্মাভিমানী ও উশৃংখল কুরাইশদের চৈতন্যকে এমন ভাবে প্রভাবিত করে ফেলেছিল যে, তাদের অমত কিংবা অস্বীকার করার কোন শক্তি ছিল না। কিন্তু পরক্ষণেই যখন ভাবাবিষ্ট অবস্থা থেকে তারা স্বাভাবিকতা অবস্থায় ফিরে এলো তখন উপলব্ধি করতে সক্ষম হলো যে, আল্লাহর কালামের অলৌকিকত্ব তাদের স্বকীয়তা

বিনষ্ট করে দিয়েছে- যার ফলে তারা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সিজদা করতেও বাধ্য হয়েছে। অথচ যারা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সেজদা করে, তাদের সমূলে ধ্বংস করার জন্য তারা বদ্ধপরিকর। এমনই এক অবস্থার প্রেক্ষাপটে তারা আত্মগ্লানির অনলে দগ্ধীভূত হতে থাকে। কাফির-মুশরিকদের এই শোচনীয় মানসিক অবস্থার আরো অবনতি ঘটতে থাকে, যখন অনুপস্থিত অন্যান্য মুশরিকরা বিষয়টি জানতে পেরে এই আচরণের জন্য তাদের লজ্জা দিতে এবং নিন্দা জ্ঞাপন করতে থাকে। কুরাইশ মুশরিকদের সিজদা করার খবর আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী মুসলমানদের কানেও পৌঁছল। কিন্তু সেই সংবাদের ধরন ছিল ভিন্ন। তারা খবর পেলেন যে, মক্কার কুরাইশরা মুসলমান হয়ে গিয়েছেন। এই কথা শোনা মাত্রই স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য অনেকেরই মনে ব্যাগ্রতা পরিলক্ষিত হল এবং পরবর্তি শাওয়াল মাসেই তাদের একটি দল মক্কা অভিমুখে যাত্রা করলেন। কিন্তু মক্কা থেকে যখন তারা একদিনের পথের দূরত্বে অবস্থান করছিলেন, তখন প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে জানতে পেরে তারা বুঝতে পারলেন যে, তারা ভুল করেছেন। তাই দলের কিছু সংখ্যক লোক আবিসিনিয়া অভিমুখে পুনরায় যাত্রা করলেন এবং কিছু সংখ্যাক লোক অত্যন্ত গোপনে মক্কায় প্রবেশ করলেন।

মক্কায় ফিরে আসা মুহাজিরদের ওপর বিশেষভাবে এবং অন্য মুসলমানদের উপর সাধারন ভাবে কুরাইশদের অন্যায়-অত্যাচার ও উৎপীড়নের মাত্রা আরো বহু গুণে বৃদ্ধি পেল। শুধু মুহাজীরগণই নয়; তাদের পরিবার পরিজনও এই নির্যাতনের হাত থেকে রেহাই পেল না। এর কারণ হচ্ছে, ইতিপূর্বে কুরাইশরা যখন জানতে পেরেছিল যে, আবিসিনিয়ায় মুজাহিদদের সাথে নাজ্জাশী অত্যান্ত হৃদ্যতাপূর্ণ আচরণ করছেন এবং তাদের প্রতি নানাভাবে সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে চলেছেন, তখন মনে মনে কুরাইশরা আরো ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। আর সুযোগের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। যখন মুহাজীরগণ মক্কায় ফিরে আসলো, তখন কুরাইশরা আপনা থেকেই সেই সুযোগ পেয়ে গেল।

মুসলিমদের প্রতি হিংসাপরায়ণ কুরাইশদের জুলুম - নির্যাতনের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) পরামর্শ দিলেন পুনরায় আবিসিনিয়ায় হিজরত করতে। দ্বিতীয় দফায় সর্বমোট ৮২ কিংবা ৮৩ জন পুরুষ এবং ১৮ কিংবা ১৯ জন মহিলা হিজরত করেন।

নিজেদের জান ও ঈমান রক্ষার্থে মুসলমানরা দেশত্যাগ করে আবিসিনিয়ায় হিজরত করে শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করায় কুরাইশদের দারুন গাত্রদাহ সৃষ্টি হয়ে যায়। ফলে আমর বিন আস এবং আব্দুল্লাহ বিন রাবিয়াহকে নাজ্জাশীর নিকট প্রেরণ করার জন্য দূত মনোনীত করা হয়। তারা সম্রাট নাজ্জাশী এবং খ্রিস্টান ও অগ্নিপূজকদের পুরোহিতদের জন্য বহু মূল্যবান উপঢৌকন সহ দুজন দূতকে দৌত্য-কর্ম সম্পাদনের উদ্দেশ্যে আবিসিনিয়ায় প্রেরণ করা হয়। তারা সর্বপ্রথম পুরোহিতদের দরবারে উপস্থিত হয়ে উপঢৌকন প্রদান করে। উপঢৌকন পেয়ে পাদ্রিগণ এ ব্যাপারে একমত হলো যে মুসলমানদের হাবসা হতে বহিষ্কার করার ব্যাপারে সম্রাটকে তারা সুপারিশ করবে। কুরাইশ দূতেরা সম্রাট নাজ্জাশীর দরবারে উপস্থিত

হয়ে উপঢৌকন প্রদান করে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার চেষ্টা করে। নাজ্জাশী গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত জানার প্রয়োজন অনুভব করেন। তাই তিনি তার দরবারে মুসলমানদের উপস্থিত হওয়ার জন্য আহ্বান জানালেন। মুসলমানদের এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে, জাফর (রাঃ) অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় ইসলামের মূলনীতি ও তার বিধিবিধানগুলো বর্ণনা করেন। তিনি বলেন এক অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজ জীবনে তারা যখন মানবেতর জীবন যাপন করে আসছিল , তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অনুগ্রহ করে তাদের মাঝে একজন রাসূল প্রেরণ করেন। তাঁর বংশ মর্যাদা, সততা, সহনশীলতা, সংযমশীলতা, ন্যায়নিষ্ঠা, পরোপকারিতা ইত্যাদি গুণাবলী ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তারা আগে থেকেই অবহিত ছিল। রাসূল (সাঃ) তাদেরকে বলেন যে, বিশ্বজাহানের স্রষ্টা প্রতিপালক এক আল্লাহ ছাড়া তারা আর কারো উপাসনা করবে না, তারা যেসব প্রতিমা পূজা করে এসেছে- সেসব বর্জন করতে হবে, মিথ্যা বর্জন করে সর্বদা সত্য কথা বলতে হবে, আমানতের হেফাজত করতে হবে, আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখতে হবে, পাড়া প্রতিবেশীদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে হবে, অশ্লীল অবৈধ কাজকর্ম থেকে বিরত থাকতে হবে এবং রক্তপাত পরিহার করে চলতে হবে। তাছাড়া মহিলাদের উপর নির্যাতন চালানো কিংবা মহিলাদের অহেতুক অপবাদ দেওয়া থেকে বিরত থাকার জন্য নির্দেশ দেন। সম্রাট নাজ্জাশী মুসলমানদের কাছে ঈসা (আঃ) সম্পর্কে জানতে চাইলে মুসলমানরা বলেন যে, ঈসা (আঃ) হচ্ছেন আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। তার মাতা বিবি মরিয়ম ছিলেন সতী সাধ্বী এবং আল্লাহর দৃষ্টিতে উঁচু মর্যাদার একজন নারী। আল্লাহর হুকুম এবং বিশেষ ব্যবস্থায় তিনি কুমারী মরিয়মের গর্ভে ঈসা (আঃ)-এর জন্ম হয়। সম্রাট নাজ্জাশী মুসলমানদের উত্তর শুনে খুশি হন এবং বলেন, “তোমরা নির্ভয়ে শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে আমার রাজ্যে বসবাস কর। যে কেউ তোমাদের ওপর অন্যায় করবে, তার জন্য জরিমানা ও শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা করা হবে। তোমাদের প্রতি অন্যায়-অত্যাচারের বিনিময়ে আমার হাতে কেউ সোনার পাহাড় এনে দিলেও আমি তা সহ্য করব না।” এভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়ে আনিত উপঢৌকনসহ কুরাইশ দুতগণ চরম বেইজ্জতির সাথে নাজ্জাশীর দরবার থেকে বেরিয়ে গেল এবং তার আশ্রয়ে সম্মান এর সাথে তার রাজ্যে মুসলমানরা অবস্থান করতে থাকলো।

শিয়াবে আবু তালিবের অন্তরিণ অবস্থা

মাত্র চার সপ্তাহ কিংবা তার চেয়েও কম সময়ের মধ্যে মুশরিকদের চার দফা প্রবল ঝাঁকুনি এবং ঘটনা প্রবাহে অপ্রত্যাশিত মোড় পরিবর্তনের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। প্রথম দফায় হামজা (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ, দ্বিতীয় দফায় ওমর (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ, তৃতীয় দফায় রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-র ব্যাপারে উভয়পক্ষে আংশিক গ্রহণ বর্জন নীতি সংক্রান্ত প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান, চতুর্থ দফায় বনু হাসিম ও বনু মুত্তালিবের মুসলমান ও কাফির সকলের

সম্মিলিতভাবে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সাহায্য করার অঙ্গীকার ।এসব কারণে মুশফিকরা প্রায় হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল। তাদের কাছে এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে, তারা যদি মোহাম্মাদ (সাঃ)-কে হত্যা করার জন্য অগ্রসর হয় তবে তার হেফাজতের জন্য মক্কা উপত্যকা মুশরিকদের রক্তে রঞ্জিত হয়ে যাবে। তাই হত্যা পরিকল্পনা বর্জন করে অত্যাচারের এমন এক কৌশল অবলম্বন করল, যা ছিল এ পর্যন্ত নির্যাতনের মধ্যে সবচেয়ে লোমহর্ষক। উল্লেখিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মুশরিকরা অঙ্গীকারাবদ্ধ হলো যে, বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিব এর সাথে ক্রয়-বিক্রয়, সামাজিক কার্যকলাপ, অর্থনৈতিক আদান প্রদান, কুশল বিনিময় ইত্যাদি সবকিছুই বন্ধ রাখা হবে। কেউ তাদের কন্যা গ্রহণ করতে কিংবা তাদের কন্যাদান করতে পারবে না। তাদের সাথে উঠাবসা, চলাফেরা, কথাবার্তা, মেলামেশা, বাড়িতে যাতায়াত ইত্যাদি কোন কিছুই করা চলবে না। মুশরিকরা উক্ত বর্জন বা বয়কটের দলিল স্বরূপ একটি অঙ্গীকারনামা সম্পাদন করে তা কাবার দেয়ালে ঝুলিয়ে দেয়। মুসলিমরা সকলেই আতঙ্কিত হয়ে 'শিয়াবে আবু তালিব' গিরি পর্বতে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল নবুয়তের সপ্তম বর্ষের মুহাররম মাসের শুরুতে। উক্ত বয়কটের ফলে বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবের লোকজনদের অবস্থা অত্যন্ত কঠিন ও সঙ্গীন হয়ে পড়ল । কারণ খাদ্যশস্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী যা মক্কায় আসতো- মুশরিকরা তা তাড়াহুড়া করে ক্রয় করে নিত। এ কারণে গিরি পর্বতে অবরুদ্ধদের অবস্থা অত্যান্ত করুণ হয়ে পড়ল। খাদ্যাভাবে তারা গাছের পাতা, চামড়া ইত্যাদি খেতে বাধ্য হলো। কোন সময় তাদের উপবাসেও থাকতে হতো। ক্ষুধার তাড়নায় নিষ্পাপ শিশু সন্তানগুলো এবং মহিলারা অস্থির হয়ে করুন কণ্ঠে ক্রন্দন করতে থাকতো। উক্ত সংকটময় অবস্থায় দীর্ঘ তিন বছর অতিক্রান্ত হল। এরপর নবুয়তের দশম বর্ষের মুহাররম মাসে লিখিত অঙ্গীকারনামাটি ছিন্ন করে ফেলা হয় এবং অত্যাচার উৎপীড়নের পরিসমাপ্তি ঘটানোর প্রচেষ্টা চালানো হয়। হিশাম বিন আমর জুহায়ের বিন আবু উমাইয়া মাখজুমি, হিশাম মুতয়িম বিন আদি, বোখতারি বিন হিশাম, জামআ বিন আসওয়াদ একত্রিত হয়ে অঙ্গীকারপত্রনামাটি নষ্ট করার পরামর্শ করেন। আবু জাহেল এবং লোকজনের মধ্যে বাকযুদ্ধ শেষ হলে মুতয়িম বিন আদি অঙ্গীকার পত্র খানা ছিড়ে ফেলার জন্য দাঁড়ালো। সেটা হাতে নিয়ে দেখা গেল যে , এক ধরনের কীট লেখাগুলোকে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করে দিয়েছে। তাতে শুধুমাত্র 'বিসমিকা আল্লাহুম্মা' কথাটি অবশিষ্ট রয়েছে এবং যেখানে যেখানে আল্লাহর নাম লেখা ছিল ,শুধু সেই লেখাগুলোই অবশিষ্ট রয়েছে। কীটে সেগুলো খায়নি। অতঃপর অঙ্গীকারপত্রটি ছিড়ে ফেলা হলো এবং এর ফলে বয়কেটেরও অবসান ঘটলো। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এবং অন্য সকলে শিয়াবে আবু তালিব থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন।

শোক- তাপ দুঃখ- বেদনার বছর

বার্ধক্য, দুশ্চিন্তা, অনিয়ম ইত্যাদি নানাবিধ কারণে আবু তালিব অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং একসময় মৃত্যু মুখে পতিত হন। তার মৃত্যু হয় গিরিপর্বতে অন্তঃরীণ অবস্থা শেষ হওয়ার

ছয় মাস পর নবুয়তের দশম বর্ষের রজব মাসে। আবু তালিবের মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তার নিকট আগমন করেন এবং বলেন, “চাচাজান! আপনি শুধু একবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু কালমাটি পাঠ করেন, যাতে আমি বিচার দিবসে প্রমাণ হিসেবে তা আল্লাহর দরবারে পেশ করতে পারি।” কিন্তু আবু জেহেল এবং আব্দুল্লাহ বিন উমাইয়া সেখানে উপস্থিত থাকায় এবং বারবার বলায় আবু তালিব সবশেষে যে কথাটি বলেছিলেন তা হচ্ছে, “আব্দুল মুত্তালিবের ধর্মের উপর।” রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, “সম্ভবত হাশরের দিন আমার সুপারিশ তার উপকারে আসবে এবং তাকে জাহান্নামের এক অগভীর স্থানে রাখা হবে - তা শুধু তার দুই পায়ের গিট পর্যন্ত পৌঁছাবে।”

আবু তালিবের মৃত্যুর দুই মাস পর উম্মুল মুমিনীন খাদিজাতুল কুবরা (রাঃ) ইন্তেকাল করেন । তার মৃত্যু নবুয়তের দশম বর্ষের রমজান মাসে হয়। মৃত্যু কালে তার বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বয়স ছিল ৫০ বছর। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর জীবনে খাদিজা (রাঃ) ছিলেন আল্লাহ তায়ালার এক বিশেষ নিয়ামতস্বরূপ। দীর্ঘ ২৫ বছর যাবত আল্লাহর রাসূলকে সাহচার্য দিয়ে, সেবাযত্ন দিয়ে, বিপদ-আপদে সাহস ও শক্তি জুগিয়ে, অভাব-অনটনে অর্থ-সম্পদ দিয়ে , ধ্যান ও জ্ঞানের প্রয়োজনে প্রেরণা ও পরামর্শ দিয়ে ইসলামের বীজের অঙ্কুরোদগম এবং শিশু ইসলামের লালন-পালনের ক্ষেত্রে যে অসামান্য অবদান রেখেছেন ইসলামের ইতিহাসে তার কোন তুলনা পাওয়া যায় না। খাদিজা (রাঃ) সম্পর্কে বলতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, “যে সময়ে লোকেরা আমার সাথে কুফুরি করলো, সেই সময় তিনি আমার প্রতি অটল বিশ্বাস স্থাপন করলেন। যে সময়ে লোকেরা আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল, সে সময়ে তিনি আমার সত্যবাদিতার স্বীকৃতি প্রদান করলেন। যে সময় মানুষ আমাকে বঞ্চিত করল, সে সময় তিনি আমাকে তার সম্পদে অংশীদার করলেন। আল্লাহ আমাকে তার গর্ভে সন্তানাদি প্রদান করলেন, অন্য কোন স্ত্রীর গর্ভে সন্তান দেননি।”

প্রাণপ্রিয় চাচা আবু তালিবের মৃত্যু এবং প্রানাধিক প্রিয় সহধর্মিনী খাদিজা (রাঃ)-এর মৃত্যুতে এক দিকে যেমন তার জীবনে বিস্তার লাভ করল নিদারুন শোকের ছায়া, অন্যদিকে তিনি বঞ্চিত হলেন অত্যন্ত প্রভাবশালী অভিভাবকের অভিভাবকত্ব এবং সহধর্মিনীর অনাবিল প্রেম ভালবাসা থেকে। চাচার মৃত্যুর ফলে মুশরিকদের সাহস বৃদ্ধি পেয়ে গেল বহু গুণে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এবং মুসলমানদের উপর নবোদ্যমে শুরু করল নানামুখী নির্যাতন। ফলে (সাঃ) এর জীবন হয়ে ওঠে বিষাদময় ও বিপর্যস্ত হয়ে ওঠে ।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তায়েফ গমন

নবুয়তের দশম বছর শাওয়াল মাসে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তায়েফ গমন করেছিলেন। তায়েফ মক্কা থেকে ৬০ মাইল দূরে অবস্থিত। এই দূরত্ব তিনি অতিক্রম করেছিলেন পায়ে হেঁটে। সাথে ছিল তার মুক্ত করা ক্রীতদাস জায়েদ বিন হারেস (রাঃ)। পথিমধ্যে যে গোত্রের নিকট তিনি উপস্থিত হতেন, তাদের নিকটেই ইসলামের দাওয়াত পেশ করতেন। কিন্তু তার এই

আহবানে কেউ সাড়া দেয়নি। তায়েফ গমন করে সাকিফ গোত্রের তিন নেতা - যারা সকলেই সহোদর - ছিল তাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং আল্লাহ তাআলার অনুগত্য হয়ে চলা এবং ইসলামকে সাহায্য করার জন্য তাদের নিকট দাওয়াত পেশ করেন। কিন্তু তারা তাকে অপমান করে। তাদের এমন আচরণে ও কথাবার্তায় তিনি মনঃক্ষুণ্ন হন এবং সেখান থেকে চলে আসেন। তায়েফে ১০ দিন অবস্থান করার সময় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সাথে তিনি সাক্ষাৎ করে ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন কিন্তু সকলের একই উত্তর, "তুমি আমাদের শহর থেকে চলে যাও।" ভগ্নহৃদয়ে তিনি সেখান থেকে ফিরে আসার সময় তাকে অপমানিত ও কষ্ট প্রদানের জন্য শিশু-কিশোর ও যুবকদেরকে তার পেছনে লেলিয়ে দেওয়া হয়। দুপাশে দুষ্ট লোকের ভিড় জমে যায়। তারা হাততালি, অশ্লীল কথাবার্তা বলে তাকে গালমন্দ করে ও পাথর ছুড়ে আঘাত করতে থাকে। ফলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পায়ের গোড়ালিতে ক্ষতের সৃষ্টি হয়ে পাদুকাদয় রক্তাক্ত হয়ে যায়। আঘাতে আঘাতে জর্জরিত এবং সারা দেহ রক্তাক্ত অবস্থায় পথ চলতে গিয়ে তিনি খুবই ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়েন এবং শেষ পর্যন্ত এক আঙ্গুরের বাগানে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখানে 'আদাস' নামক এক খ্রিস্টান ক্রীতদাস তার হাতে এক গোছা আঙ্গুর তুলে দিলে তিনি বিসমিল্লাহ বলে হাত বাড়িয়ে তা গ্রহণ করেন এবং খেতে শুরু করেন। কিছুক্ষণ সেখানে অবস্থানের পর তিনি মক্কার পথে যাত্রা শুরু করে 'কারনে সায়ালেব' নামক স্থানে পৌঁছালে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আদেশে জিব্রাইল (আঃ) পর্বত নিয়ন্ত্রণকারী ফেরেশতামন্ডলী সহ সেখানে আগমন করেন। আল্লাহর তরফ থেকে তারা এই অভিপ্রায় নিয়ে এসেছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যদি ইচ্ছা করেন তাহলে দুই পাহাড়কে একত্রিত করে দুরাচার তায়েফবাসীকে পিষে মারবেন। কিন্তু নবীজি (সাঃ) বলেন, "না, বরং আমার আশা, মহান আল্লাহ এদের পৃষ্ঠদেশ হতে এমন বংশধর সৃষ্টি করবেন যারা একমাত্র তার ইবাদত করবে এবং অন্য কাউকেও তার অংশীদার ভাববে না।"

অতঃপর তিনি মক্কা অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার পথে 'ওয়াদিয়ে নাখলায়' পৌঁছালে আল্লাহ তা'আলা তার নিকট জ্বীনদের একটি দলকে প্রেরণ করেন, যার উল্লেখ কুরআন মজিদের সূরা আহকাফ এবং সূরা জ্বীনে আছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-র নিকট এটাই ছিল জ্বীনদের প্রথম আগমন। এরপর থেকে তার দরবারে তাদের আগমন চলতে থাকে। জ্বীনদের আগমন ও ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারটি ছিল প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তায়ালার তরফ থেকে দ্বিতীয় সাহায্য মূলক ঘটনা, যে সাহায্য তিনি করেছিলেন তার অদৃশ্য ভান্ডার থেকে অদৃশ্য বাহিনী দ্বারা। এই সাহায্য ও সুসংবাদের মাধ্যমে তাঁকে তাঁর যত ধরনের চিন্তাভাবনা, দুঃখ কষ্ট এবং নৈরাশ্য, তায়েফবাসীদের গালিগালাজ, চাটিমারা ও পাথর নিক্ষেপের মত ব্যথা বেদনার কালো মেঘ সবকিছুই মন থেকে মুছে গেল। তিনি সংকল্পবদ্ধ হলেন, তাকে মক্কায় ফিরে যেতেই হবে এবং নতুন ভাবে ইসলামের দাওয়াত ও নবুয়তের তাবলীগ পূর্ণ উদ্যমে শুরু করতে হবে।

নবুয়তের দশম বর্ষের জিলকদ মাসে তায়েফ থেকে ফিরে আসার পর নতুন ভাবে বিভিন্ন গোষ্ঠী এবং ব্যক্তিদের দাওয়াত দেওয়া শুরু করেন। যেহেতু সময়টা ছিল হজ্জ মৌসুমের কাছাকাছি, সেহেতু বিভিন্ন অঞ্চলের লোকজনরা পায়ে হেঁটে ও যানবাহনে চড়ে হজ্জ পালনের জন্য মক্কা নগরীতে আসতে শুরু করেছিলেন । রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এই সময়টাকে দাওয়াত দানের জন্য বেশ উপযুক্ত মনে করে এক এক গোত্রের নিকট গিয়ে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন। যে সকল গোত্রের নিকট ইসলামের দাওয়াত প্রদান করা হয়, সেগুলো হল: বনু আমের বিন সাসআহ, মহারেব বিন খাসফাহ, ফাযারাহ, গাসসান, হানিফাহ, মুররাহ, সালিম, আবস, বনু নাসর, কালব, হারিস বিন কাব, আযরাহ ও হাযারিমা। যেভাবে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) গোত্র ও দলসমূহকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করেন, তেমনিভাবে ব্যক্তিগত পর্যায়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরও ইসলামের দাওয়াত প্রদান করেন।

ইসরা ও মিরাজ এর ঘটন

নবুয়তের দশম বছরে মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধানে তিনি তার চাচা ও প্রাণপ্রিয় স্ত্রীকে হারান। মানসিকভাবে তিনি অনেক বেশি কষ্টে ছিলেন। নির্যাতন ও লাঞ্ছনার শিকার হলেন তায়েফবাসীর কাছে। এই বিপর্যস্ত মুহূর্তে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় রাসূল (সাঃ)-কে তার একান্ত সান্নিধ্যে নিয়ে গিয়ে ধন্য করলেন। একমাত্র মূসা (আঃ) ছাড়া আর কোন নবী বা রাসূলের এই সৌভাগ্য হয়নি।

ইসরা:- ইসরা অর্থ রাত্রিকালীন ভ্রমণ। আল্লাহর নির্দেশে রাসূল (সাঃ) জিব্রাইল (আঃ)-এর সাথে একটি বাহনের পিঠে বসে হারাম থেকে মসজিদুল আকসা পর্যন্ত যে নৈশকালীন ভ্রমণ করেছিলেন তাকে বলা হয় ইসরা।

মিরাজ:- মিরাজ অর্থ উপরে আরোহণের মাধ্যম বা সিঁড়ি। আল্লাহ তার প্রিয় হাবিব মুহাম্মদ (সাঃ)-কে আকাশে আরোহণ করিয়ে প্রথম আকাশ থেকে শুরু করে সপ্তাকাশ ভেদ করে সিদরাতুল মুনতাহা পেরিয়ে তার নিজের কাছে ডেকে নিয়েছিলেন। একেই মিরাজ বলে।

ইসরা ও মিরাজ এর সময়কাল

ইসরা ও মিরাজের সময়কাল নিয়ে সীরাহবিদনের মধ্যে ব্যাপক মতভেদ আছে। এমনকি মাস নিয়েও বিভিন্ন মতভেদ দেখা যায়। উম্মুল মুমিনিন খাদিজা (রাঃ)-এর মৃত্যু হয়েছিল পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ হওয়ার পূর্বে। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ হয়েছে মিরাজের রাতে। সুতরাং এ থেকে এটা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, খাদিজা (রাঃ)-এর মৃত্যু হয়েছিল মিরাজের পূর্বে। তার মৃত্যু হয়েছিল নবুয়তের দশম বর্ষের রমজান মাসে। সুতরাং মিরাজের ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল তার মৃত্যুর পরে, পূর্বে নয়। আবার সূরা 'ইশরা'র বর্ণনা ভঙ্গি থেকে অনুমান করা যায় যে, এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মাক্কী জীবনের শেষ সময়ে।

ইসরার ঘটনা

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কাবা শরীফের হাতিমে শোয়া ছিলেন। এমন সময় জিব্রাইল (আঃ) সেখানে উপস্থিত হয়ে রাসূলকে যমযমের কাছে নিয়ে গেলেন। তারপর তার বক্ষ বিদীর্ণ করলেন। এমন সময় হেকমত ও ঈমানে পরিপূর্ণ একটি স্বর্ণের পেয়ালা আনয়ন করা হলো। রাসূল (সাঃ)-এর বক্ষ হতে পেট পর্যন্ত ফেড়ে যমযমের পানি দিয়ে হৃদপিণ্ড ধৌত করে তা ঈমান ও হিকমতের মাধ্যমে পরিপূর্ণ করে দেয়া হলো। অতঃপর তাকে সশরীরে বোরাকের ওপর আরোহণ করিয়ে মসজিদুল হারাম থেকে বাইতুল আকসা বা বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। বায়তুল মুকাদ্দাসে অবতরণের পর বোরাককে মসজিদের দরজার কড়ার সাথে বেঁধে রাখা হয়েছিল। সেখানে সমাগত নবী (আঃ)-গণের জামাতে ইমামতি সহকারে নবী (সাঃ) সালাত আদায় করেন। সালাত আদায়ের পর পুনরায় তাকে বোরাকে আরোহন করিয়ে পৃথিবীর নিকটতম আসমানে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে মানুষের আদি পিতা আদম (আঃ)-এর সাথে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাক্ষাৎ হয়। তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নবুয়তের স্বীকারোক্তি করলেন এবং ডান দিকে আল্লাহর নেককার বান্দাদের এবং বাম দিকে বদকার বান্দাদের আত্মা সমূহ তাকে দর্শন করালেন। এরপর দ্বিতীয় আসমানে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ইয়াহিয়া বিন জাকারিয়া (আঃ) এবং ঈসা ইবনে মরিয়ম (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ হয়। এরপর তৃতীয় আসমানে ইউসুফ (আঃ), চতুর্থ আসমানে ইদ্রিস (আঃ), পঞ্চম আসমানে হারুন বিন ইমরান (আঃ), ষষ্ঠ আসমানে মুসা বিন ইমরান (আঃ) এবং সপ্ত আসমানে ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ হয়। সকলেই তাকে মোবারকবাদ জানান এবং তার নবুয়তের স্বীকারোক্তি জ্ঞাপন করেন। এরপর গিয়ে উপস্থিত হন সিদরাতুল মুনতাহার নিকটে। এখানে জিব্রাইল (আঃ) যাত্রা বিরতি করলেন, কারণ এরপর তার যাওয়ার অনুমতি ছিল না। বোরাকের পৃষ্ঠে উপবিষ্ট হয়ে রাসূল (সাঃ) একাই চলতে থাকলেন সম্মুখপানে। চলার শেষ পর্যায়ে তিনি গিয়ে উপস্থিত হলেন বাইতুল মামুর-এর নিকট। এখানে রাসুল (সাঃ)-এর বাহন বোরাক তার যাত্রা ক্ষ্যান্ত করল। অতঃপর তিনি উপনীত হলেন অনাদি-অনন্ত, অসীম শক্তি-সামর্থ্য ও হিকমতের মালিক আল্লাহ তায়ালার সান্নিধ্যে। পর্দার এক পাশে বিশ্ব জাহানের চির উপাস্য, অদ্বিতীয় স্রষ্টা প্রতিপালক প্রভু, অন্য পাশে তার একান্ত অনুগ্রহভাজন সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ও প্রিয়তম নবী মুহাম্মদ (সাঃ)।

মুসলিম শরীফের হাদিসে রয়েছে, আল্লাহ এ সময় রাসূল (সাঃ)-কে তিনটি বিষয়ে হাদিয়া হিসেবে প্রদান করেন-

১. পাঁচ ওয়াক্ত সালাত।

২. সূরা বাকারার শেষ আয়াত গুলো এবং

৩. রাসূলের উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করবে না আল্লাহ তার কবিরা গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন।

রাসূল (সাঃ) জিব্রাইল (আঃ) কে তার আসলরূপে দেখেছিলেন দুইবার। একবার পৃথিবীতে এবং অন্যবার সিদরাতুল মুনতাহার নিকট। এই সফরকালে তাকে কয়েকটি জিনিসও দেখানো হয়েছিল-

তার সামনে পানের জন্য দুধ ও মদ পেশ করা হয়েছিল । তিনি দুধ পছন্দ করেছিলেন।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জান্নাতে চারটি নদী দেখেছিলেন। এর মধ্যে দুটো প্রকাশ্য এবং দুটো গোপনে । সম্ভবত এর তাৎপর্য এই ছিল যে, তার রিসালাত নীল ও ফোরাত নদীর শস্য- শ্যামল অঞ্চল পর্যন্ত প্রসার ঘটবে এবং এখানকার মানুষ বংশপরম্পরা সূত্রে মুসলমান হবে।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জান্নাত ও জাহান্নামও দেখেছিলেন।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জাহান্নামের মালিক এবং দারোগাকেও দেখেছেন। তারা হাসছিলেন না এবং তাদের মুখ মন্ডলে আনন্দ এবং প্রফুল্লতাও ছিল না।

তিনি তাদেরকেও দেখেছিলেন- যারা অন্যায়ভাবে এতিমের মাল আত্মসাৎ করে, তাদের ঠোঁটের আকার আকৃতি উটের ঠোঁটের মত। পাথরের মত আগুনের ফুলকি তাদের মুখের মধ্যে পুড়ছিল এবং সেগুলো গুহ্যদার দিয়ে নির্গত হয়ে আসছিল।

তিনি সুদখোরদের অবস্থা দেখেছিলেন। তাদের পেটগুলো প্রকাণ্ড আকার ধারণ করেছিল, যার ফলে তাদের খুবই কষ্ট হচ্ছিল এবং পেটের ভারে তারা নড়াচড়া করতে পারছিল না।

ব্যভিচারীদের সম্মুখে টাটকা ও মোটা গোশত ছিল এবং তার পাশে দুঃসহ দুর্গন্ধযুক্ত পচা গোশত ছিল। এরা টাটকা ও মোটা গোশত বাদ দিয়ে পচা গোশত খাচ্ছিল।

মিরাজের রাত শেষে সকাল বেলা এই ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) স্বগোত্রীয় লোকজনদের নিকট বর্ণনা করলে তারা এসব কিছুকে মিথ্যা এবং গাঁজাখুরি গল্প বলে উড়িয়ে দেয় এবং তার প্রতি জুলুম নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। উক্ত সময়ই আবু বকর (রাঃ) কে 'সিদ্দিক' বা 'সত্যবাদী' উপাধিতে ভূষিত করা হয় কারণ সকলে যখন এই ঘটনাকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিচ্ছিল, তখন তিনি একে সর্বান্তকরণে সত্য বলে মেনে নিয়েছিলেন।

মদীনায় ইসলাম বিস্তারের সূচনা

অবশেষে সেই সময়টি এসে উপস্থিত হলো যখন আল্লাহ তাঁর দ্বীনকে বিজয়মাল্যে ভূষিত করা, তাঁর নবীকে অধিকতর মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করা এবং তাঁকে দেয়া প্রতিশ্রুতি করার সিদ্ধান্ত নিলেন। এবারও নবী (সাঃ) যথরীতি হজ্জ উৎসবে আগত লোকদের কাছে ইসলামের দাওয়াত দিতে ও তাঁকে আপন করে গ্রহণ করার জন্য আরব গোত্রগুলিকে অনুরোধ করতে লাগলেন। এবার তিনি কিছুসংখ্যক মদীনাবাসীর সাক্ষাত পেলেন। এরা ছিলেন মদীনার খাজরাজ গোত্রের একটি দল।

আকাবার

মক্কা থেকে দুই মাইল দূরে অবস্থিত একটি জায়গার নাম| এটি মক্কা ও মিনার মধ্যবর্তী একটি জায়গা| এখান থেকে পাথর নিক্ষেপ হজ্জের অন্যতম বিধি| কাছাকাছি এক স্থানে তাদের সাথে তাঁর সাক্ষাত ঘটে| আল্লাহ এই দলটির কল্যান সাধনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বলেই এই ঘটনা ঘটেছিলো|

এ ঘটনা ঘটে নবুওয়াতের একাদশ বছরে| তাদের সাথে দেখা হওয়া মাত্রই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, "আপনারা কারা?" তারা বললো,"আমরা খাজরাজ গোত্রের লোক|" তিনি পুনরায় বললেন, "যা ইহুদিদের সাথে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ আপনারা কি তাদের অন্তর্ভুক্ত?" তাঁরা বললো, "হ্যাঁ|" তিনি বললেন, "আপনারা একটু বসবেন কি? আমি আপনাদের সাথে কিছু কথা বলতে চাই|" তারা বললো, "বেশ,বলুন|" এরপর তারা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাহচর্যে বসলো| রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদেরকে দাওয়াত দিলেন, তাদের সামনে ইসলাম পেশ করলেন এবং কুরআন তিলাওয়াত করে শোনালেন|

আগে থেকেই মহান আলল্লাহ তাদের ইসলাম গ্রহণের সহায়ক একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করে রেখেছিলেন| মদীনায় তাদের আশেপাশে ইহুদীরা বাস করতো| তারা আসমানী কিতাবের অধিকারী ছিলো এবং সেই সুবাদে তাদের কাছে ঐশী জ্ঞান ছিল| খাজরাজ ও অন্যান্য আরব গোত্র ছিল মুশরিক তথা প্রতিমাপূজারী| ইতিপূর্বে এইসব পৌত্তলিক আরবকে আগ্রাসী যুদ্ধের মাধ্যমে পরাজিত করে ইহুদীরা তাদের এলাকা দখল করে বসতি স্থপন করে পৌত্তলিক ও ইহুদিদের মধ্যে যখনই কোন অপ্রীতিকর অবস্থার উদ্ভব হতো, তখনই ইহুদীরা পৌত্তলিকদেরকে এই বলো শাসাতো, "এ যুগের নবীর আগমনের সময় আসন্ন হয়ে উঠেছে| ঐ নবী এলে আমরা তাঁর নেতৃত্বে 'আদ ও ইরাম জাতিকে যেভাবে পাইকারী হত্যা করা হয়েছিল, তোমদেরকে সেইভাবে কচুকাটা করবো|"

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন খাজরাজ গোত্রের দলটির সাথে আলাপ-আলোচনা করলেন এবং তাদেরকে আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত দিলেন তখন তারা এক অপরকে বলতে লাগলো, "আল্লাহর শপথ, ইনিই তো সেই নবী যার কথা বলে ইহুদরিা আমাদেরকে হুমকি দেয় ও শাসায়| এখন ইহুদীদেরকে কিছুতেই আমাদের আগে ইসলাম গ্রহণের সুযোগ দেয় উচিত হবে না|" এইরূপ চিন্তার বশবর্তী হয়ে তারা তৎক্ষনাৎ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দাওয়াতে সাড়া দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করলো| তারা বললো, "আমরা আমাদের সম্প্রদায়কে এক ভয়ংকর

শত্রুর শত্রুতার মুখে অসহায় অবস্থায় রেখে এসেছি৷ আমরা আশা করি আল্লাহ আমাদের গোটা সম্প্রদায়কেই আপনার সমর্থক কওে দেবেন৷ আমরা তাদের কাছে ফিরে গিয়ে আপনার দাওয়াত তাদের কাছেও তুলে ধরবো৷ আল্লাহ যদি তাদেরকে আপনার সমর্থক বানিয়ে দেন তা হলে আপনার চেয়ে স্মমানিত ও পরাক্রান্ত আর কেউ থাকবে না৷”

এভাবে তারা ঈমান আনা ও ইসলামকে সত্য বলে মেনে নেয়ার পর নিজ এলাকায় ফিরে গেলেন৷ যতদূর জানা যায়, খাজরাজ গোত্রীয় এই দলটির সদস্য ছিল ছয়জন৷ মদীনায় পৌঁছে তারা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-র বক্তব্য গোত্রের কাছে পেশ করলেন এবং তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানালেন৷ এভাবে ক্রমে মদীনার প্রতিটি ঘরে ইসলমের দাওয়াত পৌঁছে গেল৷ এমন একটি বাড়ীও অবশিষ্ট রইলো না, যেখানে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-র কথা আলোচিত হতো না৷

মুসলমানদের মদীনায় হিজরত করার অনুমতি

আলস্নাহর তরফ থেকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে যখন যুদ্ধের অনুমতি দেয় হলো আর মদীনাবাসীদের উপরোক্ত দলটি ইসলামী বিধানের অনুসরণ এবং নবী (সাঃ) ও তাঁর অনুরসারীদের সর্বত্মক সাহায্য সহযোগিতা দানের ব্যাপারে অঙ্গীকারাবদ্ধ হলো, তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সেই সব মুসলমানকে মদীনায় হিজরাত করে তাদের আনসার ভাইদের কাছে-চলে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন| তিনি তাদেরকে বললেন, "আলল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্য একটি নিরাপদ আবাসভূমি ও কিছুসংখ্যক ভাই সংগ্রহ করে দিয়েছেন|" ফলে মুসলমানগণ দলে দলে হিজরাত করতে শুরু করলেন| আর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজে মক্কা ত্যাগ করে মদীনায় হিজরাতের জন্য আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষায় মক্কায় অবস্থান করতে লাগলেন|

মদীনায় হিজরতকারী মুসলমানদের বিবরন

সাহাবীদেও মধ্যে কুরাইশ বংশীয় প্রথম মুহাজির ছিলেন বনী মাখযুম গোত্রের আবু সালামা ইবনে আব্দুল আসাদ| আকাবার বাইয়াতের এক বছর আগে তিনি মদীনায় হিজরাত করেন| ইতিপূর্বে তিনি আবিসিনিয়া থেকে মক্কায় রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-র কাছে গিয়ে আসেন| এই সময় কুরাইশরা তাঁকে উৎপীড়ন করতে লাগলো| তিনি মদীনাবাসীদের ইসলাম গ্রহনের খবর শুনতে পেলেন| এবং তাঁর সাথে হিজরাত করে চলে গেলেন| আবু সালামার পর আমের ইবনে রাবীয়া এবং মদীনায় তার স্ত্রী লায়লা বিনতে আবু হাসমা মদীনায় হিজরাত করেন| তারপর আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ তাঁর পরিবার পরিজন ও ভাই আবদ ইবনে জাহাশকে সাথে নিয়ে হিজরাত করেন| তাঁর ভাইয়ের আর এক নাম ছিলো আবু আহমাদ| তাঁর দৃষ্টিশক্তি ছিলো ক্ষীণ| তা সত্বেও তিনি কারো সাহায্য ছাড়াই মক্কার উচ্চ ও সমতল এলাকায় ঘুরে বেড়াতেন| তিনি ছেলেন একজন কবি|

এপর উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) ও আইয়াশ ইবনে আবু রাবিয়া মাখযুমী হিজরাত করে মদীনায় চলে যান| অতঃপর ব্যাপকহারে মুসলমানগণ মদীনায় হিজরাত করতে থাকেন|

রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর মাদানী জীবন

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হিজরাত

সাহাবীগণ হিজরাত করে মদীনায় চলে যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হিজরাতের ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষায় থেকে গেলেন| এ সময়ে আলী ইবনে আবু তালিব, আবু বকর সিদ্দিকী ও মুষ্টিমেয় ক'জন সাহাবা ছাড়া আর কেউ মক্কায় ছিলেন না| অন্য যারা ছিলো তারা হয় কাফিরদের হাতে বন্দী ছিল নতুবা ইসলাম ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলো| আবু বকর (রাঃ) প্রায়ই রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-র নিকট হিজরাত করার অনুমতি চাইতেন| কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে বলতেন, "তুমি তাড়াহুড়ো করো না| হয়তো আলস্নাহ তোমাকে একজন সাথী জুটিয়ে দেবেন|" রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-ই তাঁর হিজরাতের সঙ্গী হন| হযরত আবু বকর সিদ্দিকী (রাঃ) এরপর থেকে তাই কামনা করতেন| কুরাইশরা যখন দেখলো যে, অন্যত্র তাদের গোত্রের বাইরের বহু লোক রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অনুসারী হয়েছে এবং তাঁর সঙ্গীরা তাদের কাছে হিজরাত করে চলে যাচ্ছে, তখন তারা বুঝতে পারলো যে, নবী (সাঃ) ও তাঁর সহচরগন একটা নিরাপদ আবাসভূমি পেয়ে গেছেন| তাই তারা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-র দেশত্যাগের ব্যাপারে সতর্ক হয়ে গেলো| তারা ভাবলো যে, তিনি তাদের সাথে যুদ্ধ করার প্রস্ত্তুতি সম্পূর্ণ করেছেন|

এ ব্যাপারে পরামর্শ করার জন্য তারা পরমর্শগৃহ 'দারুন নাদওয়ায়' সমবেত হলো| এই গৃহটি ছিলো কুসাই ইবনে কিলাবের বাড়ী| কুরাইশরা যে কোন সিদ্ধান্ত নিতে এখানেই সমবেত হতো| এবার তারা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-র ভয়ে ভীত হয়ে তাঁর ব্যাপারে কি করা যায়, তাই নিয়ে আলোচনা করতে বসলো| আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-র ব্যাপারে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য তারা নির্ধারিত দিনে সেখানে সমবেত হলো| এই দিনকে 'গণসমাবেশ দিবস' নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে| তাদের পরামর্শ গৃহে ঢুকবার পথে ইবলিস কম্বল আচ্ছদিত এক বৃদ্ধের বেশে তাদের সামনে এসে দাঁড়ালো| সে ঠিক দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল| তাকে দেখে সবাই বললো, "বৃদ্ধ এই লোকটি কে?" সে বললো, "আমি নাজদের অধিবাসী| [সুহাইলীর মতে, শয়তান নিজেকে নাজদবাসী বলে পরিচয় দেয়ার কারণ হলো, কুরাইশরা আগেই জানিয়ে দিয়েছিলো যে, তিহামা অঞ্চলের কোন লোককে এই পরামর্শ সভায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে না| কেননা তারা মনে করতো, তিহামাবাসী মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-র সমর্থক| এজন্য ইবলিস নাজদবাসী বৃদ্ধের রূপ ধরে আত্মপ্রকাশ

করেছিলো।] তোমরা যে উপলক্ষে আজ সমবেত হচ্ছো, তা আমি শুনেছি। তাই তোমাদের কথাবার্তা শোনার জন্য এসেছি। আশা করি আমার উপদেশ ও পরামর্শ থেকেও তোমরা বঞ্চিত হবে না।" একথা শুনে সবাই তাকে পরম সমাদরে ভেতরে যাওয়ার অনুমতি দিলো। সে সবার সাথে প্রবেশ করলো। ততক্ষণে কুরাইশদের বড় বড় নেতা ও সরদার ভেতরে আসন গ্রহণ করেছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সম্প র্কে তারা পরস্প র বলাবলি করতে লাগলো, "এই লোকটির তৎপরতা বর্তমানে কোন্ পর্যায়ে পৌঁছেছে, তোমরা সবাই তা জান। সে তার বাইরের অনুসারীদের নিয়ে কখন যে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তার কোন ঠিক নেই। তার আক্রমণ থেকে আমরা এখন নিরাপদ নই। অতএব, সবাই মিলে তার ব্যাপারে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর।"

গলা-পরামর্শ চলতে থাকলো। এক সময় একজন বললো, "তাকে লোহার শিকল দিয়ে বেঁধে কোন অর্গলবদ্ধ কুঠরীতে বন্দী করে রাখ। তারপর ইতিপূর্বে তার মত কবিদের যে পরিণতি হয়েছে তারও সেই পরিণতি অর্থাৎ শোচনীয় মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে থাক। যুহাইব, নাবেগা ও তাদের মত অন্যান্য কবির এই পরিণতি হযেছিল।" তখন বুড়ো বললো, "না, তোমাদের এই সিদ্ধান্ত সঠিক নয়। তোমরা যদি তাকে বন্দী কর, তা হলে বদ্ধ কুঠরীতে তার বন্দী হওয়ার খবর তার বাইরের অনুসারীদের কানে চলে যাবে। সে অবস্থায় তারা তোমাদের ওপর হামলা চালিয়ে তাকে তোমাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারে। অতঃপর তাদের সংখ্যা বেড়ে যাবে এবং একদিন তারা তোমাদের ওপর বিজয়ী হবে। কাজেই তোমাদের এ সিদ্ধান্ত সঠিক নয়। অন্য কোন সিদ্ধান্ত নিতে পার কিনা, ভেবে দেখ।"

এরপর আবার আলাপ-আলোচনা চলতে লাগলো। একজন বললো, "আমরা তাকে দেশ থেকে বহিষ্কার করবো। এরপর তাকে নিয়ে আমাদের আর কোন দুশ্চিন্তা থাকবে না। সে একাবার আমাদের কাছ থেকে চলে গেলে কোথায় গেলো বা কোথায় থাকলো আমরা তার কোন পরোয়া করবো না। সে চলে গেলে আমরা তার ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে যাবো। এরপর আমাদের পারস্প রিক মৈত্রী ও বন্ধুত্ব এবং অন্যান্য ব্যাপারে আমরা নিজেরাই শুধরে স্বাভাবিক করে নিতে পারবো।" নাজদের বৃদ্ধ বললো, "না, এটাও সঠিক সিদ্ধান্ত হলো না। তোমরা কি তার অনুপম বাচনভঙ্গি, মিষ্ট ভাষা, যুক্তিগ্রাহ্য কথা এবং তথাকথিত ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত মন-মগজ আছন্নকারী ব্যাপারগুলো দেখনি? তোমরা যদি এই পদক্ষেপ নাও, তাহলে এমনও হতে পারে যে, সে অন্য কোন আরব গোত্রে গিয়ে হাজির হবে, আর তার মিষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী কথা দিয়ে তাদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করবে এবং তারা তার অনুসারী হয়ে

যাবে| অতঃপর তাদের নিয়ে তোমাদের ওপর হামলা চালিয়ে তোমাদের দেশ দখল করে তোমাদের হাত থেকে কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নেবে| তোমরা এটা বাদ দিয়ে অন্য কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর|”

এবার আবু জাহল বললো, “আমার একটা মত আছে য এতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের কারো মাথায় আসেনি|” সবাই বললো, “বলো দেখি, আবুল হাকাম তোমার মত কি?”

সে বললো, “আমাদের প্রত্যেক গোত্র থেকে এক একজন শক্তিশালী সম্ভ্রান্ত যুবক বাছাই করতে হবে| তারপর তাদের প্রত্যেককে আমরা একটা করে ধারালো তরবারী দেবো| ওই যুবকেরা এক যোগে হামলা চালিয়ে মুহাম্মাদকে হত্যা করবে| এভাবে আমরা তার থেকে নিস্তার পেতে পারি| আর তারা সবাই মিলে যখন এ কাজটা করবে, তখন মুহাম্মাদের খুনের দায় দায়িত্ব সকল গোত্রের ঘাড়েই কিছু না কিছু পড়বে| ফলে আবদ মানাফ গোষ্ঠী সমগ্র জাতির বিরুদ্ধে লড়াই করে খুনের প্রতিশোধ নিতে পারবে না| রক্তপণ নিয়ে সন্তুষ্ট হতে বাধ্য হবে| আমরা সকল গোত্র মিলে তাদেরকে রক্তপণ দিয়ে দেবো|” নাজদের বৃদ্ধ বললো, “এটাই সঠিক সিদ্ধান্ত| আমি মনে করি এর চেয়ে ভালো সিদ্ধান্ত আর হতে পারে না|” এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে পরামর্শ সভার সমাপ্তি ঘোষনা করা হলো এবং সবাই যার যার বাড়ীতে চলে গেলো|

তৎক্ষণাৎ জিবরীল (আঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-র কাছে এস তাঁকে বললেন, “আপনি প্রতিদিন যে বিছানায় ঘুমান আজ রাতে সে বিছানায় ঘুমাবেন না|” রাতের এক তৃতীয়াংশ অতিক্রান্ত হলে নির্ধারিত ঘাতকের দল রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-র ঘরের দরজায় এসে সমবেত হয়ে ওত পেতে থাকলো| তিনি কখন ঘুমান তার প্রতীক্ষা করতে লাগলো| ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁর ওপর হামলা চালাবে এই তাদের বাসনা| রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদের উপস্থিতি বুঝতে পেরে আলী ইবনে আবু তালিবকে (রাঃ) বললেন, “তুমি আমার বিছানায় ঘুমাও এবং আমার এই সবুজ হাদরামাউতী চাদর দিয়ে আপাদমস্তক আবৃত করে রাখ| তোমার ওপর তাদের দিক থেকে কোন আঘাত আসবে না, এ ব্যাপারে তুমি নিশ্চিত থাক|” রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ঘুমাবার সময় ঐ চাদরটি গায়ে জড়িয়ে নিতেন|

মুহাম্মাদ ইবনে কা’ব আল কারযী বলেন, ঘাতক দলে আবু জাহলও ছিলো| ঘাতকরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বাড়ীর দরজায় জমায়েত হলে আবু জাহল তাদেরকে বললো, “মুহাম্মাদ (সাঃ) বলে যে, তোমরা যদি তার অনুসরণ কর তাহলে তোমাদের আরব ও অনারব সবার

জন্য জর্ডানের বাগ বাগিচার মত অসংখ্য বাগ বাগিচা তৈরী করে দেয়া হবে| কিন্তু যদি তার অনুসরণ না কর তা হলে তোমরা ধংস ও নির্মূল হয়ে যাবে| মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করে তোমাদেরকে আগুনে পোড়ানো হবে|” ঠিক সেই মুহূর্তেই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বেরিয়ে তাদের সামনে আসলেন| তিনি এক মুষ্ঠি ধূলি হাতে নিলেন| অতঃপর আবু জাহলকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন, “হ্যাঁ, আমি এ কথা বলি এবং যাদেরকে আগুনে পোড়ানো হবে তুমিও তাদেরই একজন|” এই সময় আল্লাহ তাদের দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নিলেন| ফলে তারা তাঁকে দেখতে পেলো না| তিনি ঐ ধূলি তাদের মাথার ওপর ছড়িয়ে দিতে লাগলেন| তিনি তখন সূরা ইয়াসীনের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ পড়ছিলেন-

يس ○وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ○ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ○عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ○ تَنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ○ لِتُنذِرَ
قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ○ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ○ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى
الْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ○ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُون○ (سورة يس-١~٩)

অর্থঃ “ইয়া-সীন! প্রজ্ঞাময় কোরআনের কসম। নিশ্চয় আপনি প্রেরিত রসূলগণের একজন। সরল পথে প্রতিষ্ঠিত। কোরআন পরাক্রমশালী পরম দয়ালু আল্লাহর তরফ থেকে অবতীর্ণ, যাতে আপনি এমন এক জাতিকে সতর্ক করেন, যাদের পূর্ব পুরুষগণকেও সতর্ক করা হয়নি। ফলে তারা গাফেল। তাদের অধিকাংশের জন্যে শাস্তির বিষয় অবধারিত হয়েছে। সুতরাং তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না। আমি তাদের গর্দানে চিবুক পর্যন্ত বেড়ী পরিয়েছি। ফলে তাদের মস্তক উর্দ্ধমুখী হয়ে গেছে। আমি তাদের সামনে ও পিছনে প্রাচীর স্থাপন করেছি, অতঃপর তাদেরকে আবৃত করে দিয়েছি, ফলে তারা দেখে না।”(সূরা ইয়াসীনঃ ১~৯)

এই আয়াত কয়টি পড়তে পড়তে তিনি তাদের প্রত্যেকের মাথায় ধূলি নিক্ষেপ করলেন| অতঃপর নিজের ইচ্ছামত একদিক চলে গেলেন| কিছুক্ষণ পর বাইরের এক ব্যক্তি তাদের কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, “তোমরা এখানে কি জন্য অপেক্ষা করছো?” তারা বললো, “আমরা মুহম্মাদের অপেক্ষায় আছি|” সে বললো, “আল্লাহ তোমাদেরকে ব্যর্থ করে দিয়েছেন| মুহাম্মাদ তো তোমাদের সামনে দিয়েই বেরিয়ে গেছে| তোমাদের মাথায় কি রয়েছে, তা কি দেখতে পাচ্ছো না?” তখন প্রত্যেকে মাথায় হাত দিয়ে দেখলো, ধূলিতে মাথা আচ্ছন্ন হয়ে আছে|

অতঃপর তারা গৃহতল্লাশী শুরু করলো| রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর চাদর গায়ে দিয়ে আলীকে (রাঃ) বিছানায় শয়িত দেখে বললো, “এই তো মুহাম্মাদ, চাদর গায়ে দিয়ে শুয়ে আছে|” তাই তারা ভোর পর্যন্ত অপেক্ষায় রইলো| সকালে আলী (রাঃ) বিছানা থেকে উঠলে, তাকে দেখে সবাই

বলে উঠলো, “লোকটা তাহলে তো ঠিকই বলেছে যে, মুহাম্মাদ চলে গেছে৷”

ইবনে ইসহাক বলেন, আবু বকর (রাঃ) ছিলেন খুব ধনবান ব্যক্তি৷ তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে হিজরাতের অনুমতি চাইলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে বলতেন, “তুমি তাড়াহুড়া করোনা৷ আল্লাহ হয়তো তোমাকে নিজের কথাই বলেছেন৷” তাই তিনি তখন থেকেই দুটো উট কিনে নিজের বাড়ীতে রেখেছিলেন৷ হিজরতের প্রস্তুতিস্বরূপ তিনি এই কাজ করেছিলেন৷ আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আবু বকর (রাঃ)-এর বাড়ীতে সকালে হোক বা বিকেলে দিনে অন্ততঃ একবার যেতে ভুলতেন না৷ সেই দিনটা এসে উপনীত হলো যেদিন রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে মক্কার স্বগোত্রীয়দেরকে ছেড়ে হিজরত করে চলে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হলো৷ সেদিন তিনি দুপুরে আমাদের বাড়ীতে আসলেন৷ ঐ সময় কখনো তিনি আসতেন না৷ তাঁকে দেখে আবু বকর (রাঃ) বললেন, “নিশ্চয়ই কিছু ঘটেছে তা না হলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এ সময় আসতেন না৷” তিনি বাড়ীতে প্রবেশ করলে আবু বকর (রাঃ)-র বাড়ীতে আসলেন, তখন আমি আর আমার বোন আসমা বিনতে আবু বকর ছাড়া আর কেউ ছিলো না৷ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, “তোমরা এখানে অন্য যারা রয়েছে, তাদেরকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে দাও৷” আবু বকর (রাঃ) বললেন, “হে আল্লাহর রাসূল, আমার দুই মেয়ে ছাড়া আর কেউ নেই৷ আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোক৷ আপনার কি হয়েছে? আমাকে বলুন৷” রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, “আল্লাহ আমাকে মক্কা থেকে চলে যাওয়ার ও হিজরাত করার অনুমতি দিয়েছেন৷” আবু বকর (রাঃ) বললেন, “আমিও কি সঙ্গে যেতে পারবো?” রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, “হ্যাঁ, তুমিও সঙ্গে যেতে পারবে?৷” আয়িশা (রাঃ) বলেন, সেদিনের আগে আমি জানতাম না যে, মানুষ আনন্দের আতিশয্যেও কাঁদতে পারে৷ আমি আবু বকর (রাঃ) কে সেদিন কাঁদতে দেখেছি৷ অত:পর আবু বকর (রাঃ) বললেন, “হে আল্লাহর রাসূল, এই দেখুন, আমি এই উট দুটো এই কাজের জন্যই প্রস্তুত করে রেখেছি৷” অতঃপর তারা আবদুল্লাহ ইবনে আরকাতকে পথ দেখিয়ে নেবার জন্য ভাড়া করে সাথে নিলেন৷ সে ছিলো মুশরিক৷ উট দুটো তার কাছেই রেখে গেলেন৷ সে নির্ধারিত সময়ের জন্য উট দুটির দেখাশুনা ও তত্ত্বাবধান করতে থাকলো৷

মদীনায় উপস্থিতি

অতঃপর আল্লাহর ইচ্ছায় তিনি শুক্রবার কুবা ত্যাগ করেন| বনু সালেম ইবনে আওফের বস্তিতে গিয়ে তিনি জুমার নামায পড়েন| বাতনুল ওয়াদীর মসজিদে তিনি জুমার নামায আদায় করেন| বাতনুল ওয়াদীর আর এক নাম ওয়াদীয়ে রানুনা| এখানেই তিনি মদীনায় প্রথম জুমার নামায আদায় করলেন|

ইতবান ইবনে মালিক ও আবয়াস ইবনে উবাদা ইবনে নাদলা সহ বনু সালেম ইবনে আওফের একদল লোক রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট এসে বললো, "হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের যা কিছু জনবল, সহায় সম্বল ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা আছে, তাতে খুশী হয়ে আমাদের এখানেই আপনি স্থায়ীভাবে বসবাস করুন|" রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজের উষ্ট্রীকে দেখিয়ে বললেন, "একে তোমরা পথ ছেড়ে দাও| আল্লাহর তরফ থেকে এটির ওপর নির্দেশ রয়েছে আমাকে যথাস্থানে নিয়ে যাওয়ার|" সবাই তাই করলো| উষ্ট্রী নিজের ইচ্ছামত চলতে লাগলো| বনু বায়াদা গোত্রের বস্তির নিকট যখন হাজির হলো, তখন যিয়াদ ইবনে লাবীদ ও ফারওয়া ইবনে আমরের নেতৃত্বে বনু বায়াদা গোত্রের একদল লোক রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট হাজির হয়ে বললো, "হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের এখানে আসুন, আমাদের যে জনবল, সহায় সম্বল ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা আছে তাঁর মধ্যে এসে বসবাস করুন|" তিনি বললেন, "এই উষ্ট্রীকে তার ইচ্ছামত যেতে দাও| কেননা ওকে যথাস্থানে আমাকে পৌঁছে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে|" উষ্ট্রীটি চলতে লাগলো| বনু সায়েদার বস্তিতে পৌঁছলে সা'দ ইবনে উবাদা ও মুনযির ইবনে আমরের নেতৃত্বে বনু সায়েদার একদল লোক রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পথ আগলে দাঁড়ালো| তারাও বনু বায়াদা ও বনু সালেমের মত একই অনুরোধের পুনরাবৃত্তি করলো| রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বনু বায়াদা ও বনু সালেমকে যে কথা বলেছিলেন বনু সায়েদাকেও তাই বললেন| উষ্ট্রী অগ্রসর হতে লাগলো| যখন সেটি খাযরাজ গোত্রের বনু হারেস পরিবারের বাড়ীর পাশ দিয়ে চলতে লাগলো, তখন সা'দ ইবনে রাবী, খবেজা ইবনে যায়িদ ও আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা বনু হারেস পরিবারের আরো কিছু লোককে সাথে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পথ আগলে দাঁড়ালো| তারা তাদের পরিবারে অবস্থান করা ও তাদের জনবল, সহায় সম্বল ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার ওপর আস্থা রাখার আমন্ত্রণ জানালো| রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, "তোমরা উষ্ট্রীকে যেতে দাও| কেননা এটি আমাকে উপযুক্ত স্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য আদিষ্ট|" সকলে

পথ ছেড়ে দিলো এবং উষ্ট্রীটা সামনের দিকে এগিয়ে চললো| চলতে চলতে উষ্ট্রী রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মামাদের পরিবার বনী আদী ইবনে নাজ্জারের বাড়ী অতিক্রম করলো| তখন বনী আদী ইবনে নাজ্জারের কতিপয় লোককে সাথে নিয়ে সালীত ইবনে কায়েস ও আবু সালীত উসাইরা ইবনে আবি খাবিজা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে এসে দাঁড়ালো| তারা বললো, “ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনারা আমাদের কাছে আসুন এবং আমাদের যা কিছু জনবল, সহায় সম্বল ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা আছে, তার ওপর আস্থা রাখুন|” তিনি বললেন, “উষ্ট্রীকে তার খেয়াল খুশীমত যেতে দাও| কারণ ওকে উপযুক্ত স্থানে আমাকে পৌঁছিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে|” এখানে উল্লেখ থাকে যে, বনী আদী ইবনে নাজ্জারেরই মেয়ে ছিলেন আবদুল মুত্তালিবের মা সালামা বিনতে আমর|

বনু মালিক ইবনে নাজ্জারের বাসস্থানের কাছে এসে উষ্ট্রী হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো| সে যেখানে বসলো সেখানেই পরবর্তীকালে সমজিদে নববীর প্রবেশদ্বার তৈরী হয়| তৎকালে ঐ জায়গাটা ছিলো বনু নাজ্জারের দুটো ইয়াতীম শিশুর খেজুর শুকাবার জায়গা| শিশু দুটো হলো আমরের ছেলে সাহল ও সুহাইল| তাদের লালন পালন করতো মায়য ইবনে আকরা| উষ্ট্রী হাঁটু গেড়ে বসলেও রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তার পিঠ থেকে নামলেন না| স্থির হয়ে বসে রইলেন| কিছুক্ষন পর উষ্ট্রীটি সামান্য কিছুদূর এগিয়ে গেলো| রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তখনও তার লাগাম শক্ত করে ধরে রাখলেন| অতঃপর উষ্ট্রী পিছনের দিকে ফিরে তাকালো এবং পুনরায় তাঁর প্রথম বিরতি স্থানে ফিরে এলো| সেখানে এসে হাঁটু গেড়ে বসলো| এবারে সে নড়াচড়া ও শব্দ করলো| তার বুক ও গলার নিম্নাংশ মাটিতে ঠেকিয়ে দিলো| রাসূলুলস্নাহ সালস্নালস্নাহু আলাইহি ওয়াসালস্নাম উষ্ট্রীর পিঠ থেকে নামলেন| আবু আইয়ুব খালিদ ইবনে যায়িদ তাঁর আসবাবপ নামিয়ে নিলো এবং নিজের ঘরে নিয়ে রাখলো| রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আবু আইয়ুবের মেহমান হলেন| তাকে জিজ্ঞেস করলেন, “খেজুর শুকাবার জায়গাটা কার?” মায়ায ইবনে আকরা বললো, “ইয়া রাসূলুল্লাহ, ওটা আমরের ছেলে সাহল ও সুহাইলের| ওরা আমার পালিত ইয়াতীম| আমি তাদেরকে সম্মত করিয়ে নেবো| আপনি এখানে মসজিদ তৈরী করুন|” রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ঐ স্থানে মসজিদ নির্মাণে আদিষ্ট হলেন| রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর মসজিদ ও ঘরবাড়ী তৈরী হওয়া পর্যন্ত আবু আইয়ুবের বাড়ী অবস্থান করলেন| এই মসজিদ নির্মাণের কাজে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজেই যোগদান করেন, যাতে মুসলমানরাও অংশগ্রহণ করার প্রেরণা পায়| ফলে মুহাজির ও আনসারগণ সকলেই ঐ কাজে পূর্ণ আগ্রহের সাথে অংশ নেন| এ সম্প র্কে জনৈক মুসলমান স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করেন,

“আমরা যদি বসে থাকি আর নবী কাজ করেন, তা হবে আমাদের চরম ভ্রষ্টতার পরিচায়ক|” মসজিদ নির্মানের সময় মাঝে মাঝেই মুসলমানরা উদ্দীপনার সাথে কবিতা বলতেন| যেমন: “আখিরাতের জীবন ছাড়া আর কোন জীবনের গুরুত্ব নেই| হে আল্লাহ, আপনি আনসার ও মুহাজিরদের ওপর রহমত বর্ষণ করুন|” আর তাদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলতেন,“আখিরাতের জীবন ছাড়া আর কোন জীবনের গুরন্নত্ব নেই| হে আল্লাহ, আপনি আনসার ও মুহাজিরদের ওপর রহমত বর্ষণ করুন|” মসজিদ ও থাকার ঘর নির্মিত হলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আবু আইয়ুবের বাড়ী থেকে নিজের ঘরে গিয়ে বাস করতে লাগলেন|

আবু আইয়ুব বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন আমার বাড়ীতে মেহমান হলেন, তখন তিনি নিচের তলায় থাকতে লাগলেন আর আমি ও আমার স্ত্রী উপরে| আমি বললাম, “হে আল্লাহর রাসূল, আমি উপরের তলায় থাকি আর আপনি নীচের তলায় থাকেন তা আমার কাছে নিতান্ত অপছন্দনীয় ও গর্হিত কাজ| অতএব আপনি ওপরে থাকুন| আর আমরা নেমে এসে নীচে থাকি|” রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জবাব দিলেন, “তোমাদের নীচে থাকাটা আমাদের জন্য এবং যারা আমাদের সাথে দেখা সাক্ষাত করতে আসে তাদের জন্য অধিকতর সুবিধাজনক|”

এ জন্য রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নীচের তলায় এবং আমরা ওপরের তলায় বাস করতে লাগলাম| একবার আমাদের একটা পানি ভর্তি কলসী ভেঙ্গে গেলো| আমাদের একটি মাত্র কম্বল ছিলো আর কোন লেপ বা শীতবস্ত্র ছিলোনা| অগত্যা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-র গায়ে তা থেকে পানি পড়বে এবং তাতে তিনি কষ্ট পাবেন এই আশংকায় আমি ও আমার স্ত্রী ঐ কম্বলটা দিয়েই পানি মুছে ফেললাম|

আমরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর রাতের জন্য খাবার তৈরী করে পাঠাতাম| তিনি ঐ খাবারের উদ্বৃত্তটুকু ফেরত পাঠালে আমি ও আমার স্ত্রী বরকতের আশায় তাঁর হাত লাগানো জায়গা থেকেই খেয়ে নিতাম| একদিন রাত্রে এইভাবে তাঁর জন্য খাবার পাঠালাম| সেই খাবারে আমরা কিছু পিঁয়াজ বা রসুনও দিলাম| রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তা ফেরত পাঠালেন| আমরা ঐ খাবারে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-র হাত স্প র্শ করার কোন চিহ্ন দেখতে পেলাম না| ফলে আমি ঘাবড়ে গিয়ে তাঁর কাছে গেলাম| বললাম, “হে আলস্নাহর রাসূল, আপনার জন্য আমার বাপ-মা কুরবান হোক| আপনি খাবার ফেরত পাঠালেন অথচ তাতে আপনার হাতের স্প র্শের কোন চিহ্নই দেখলাম না| আপনি যখনই খাবার ফেরত দিতেন, আমি ও আমার স্ত্রী বরকত লাভের জন্য সেই খাবার আপনার হাত লাগানোর জায়গা থেকে খেতাম|”

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, “আমি খাবারের মধ্যে অমুক গাছের গন্ধ পেয়েছি| যেহেতু আমাকে অনেকের মুখের কাছে মুখ নিয়ে আলাপ করতে হয়, তাই আমি খাইনি| অবশ্য তোমরা ওটা খেতে পার|” এরপর আমরা ঐ খাবার খেয়ে নিলাম| অতঃপর আর কখনো আমরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জন্য পিঁয়াজ বা রসুন পাঠাইনি ইবনে ইসহাক বলেন এরপর মুহাজিররা হিজরত করে একের পর এক রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট চলে আসতে লাগলেন| একমাত্র যারা বন্দী ছিলেন অথবা কঠোর নির্যাতনে ইসলাম ত্যাগে বাধ্য হয়েছিলেন, তাঁরাই মক্কায় থেকে গেলেন| মুষ্টিমেয় কয়েকটি পরিবার ছাড়া আর সব কয়টি পরিবারেরই অবস্থা এরূপ ছিলো যে, তারা তাদের পরিবারের সব লোক এবং ধন-সম্প দ মদীনায় নিয়ে আসতে পারেনি| যে কয়টি পরিবার তাদের সকল সদস্যসহ হিজরাত করতে সক্ষম হয়েছিলো তারা হলো,বনু জুমাহ গোত্রের বনু মাযউন পরিবার, বনু উমাইয়ার মিত্র বনু জাহাশ ইবনে রিয়াব এবং বনু সা’দ ইবনে লাইসের বনু বুকাইর পরিবার যারা বনু কা’বের মিত্র ছিলো| হিজরতের পর এদের ঘরবাড়ী একেবারেই জনশূন্য ও অর্গলবদ্ধ ছিল|

মদীনাতে ভাষন দান এবং চুক্তি সম্পাদন

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) রবিউল আউয়াল মাসে মদীনায় পৌঁছেন এবং পরবর্তী বছর সফর মাস পর্যন্ত মদীনাতেই অবস্থান করেন| এই সময়ের মধ্যে তাঁর জন্য মসজিদ ও ঘর তৈরী করা হয়| উপরন্তু মদীনার আনসারদের এই গোত্রটির (বনু মালিক ইবনে নাজ্জার) ইসলাম গ্রহণের ফলে ইসলাম ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে| একমাত্র খতমা, ওয়াকেদ, ওয়ায়েক ও উমাইয়া এই চারটি পরিবার ছাড়াও আওস গোত্রের একটি গোষ্ঠী পৌত্তলিকতা আঁকড়ে থাকে|

আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান আমর বর্ণনা করেছেন যে, মদীনায় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রথম যে ভাষণ দেন তাতে প্রথমে জনতার সামনে দাঁড়িয়ে তিনি আল্লাহর যথাযোগ্য প্রশংসা করেন| তারপর নিম্নবর্ণিত কথাগুলো বলেন:

“হে জনমন্ডলী, তোমরা আখিরাতের জন্য পুণ্য সঞ্চয় কর| জেনে রেখো, তোমাদের মধ্য থেকে কেউ হয়তো সহসাই মারা যাবে, তার মেষপাল দেখার লোকও থাকবে না| অতঃপর তার রব জিজ্ঞেস করবেন| কোন দোভাষীও সেখানে থাকবে না| তিনি বলবেন,‘তোমার কাছে কি আমার রাসূল আসেনি? আমি কি তোমাকে ধন সম্প দ অনুগ্রহ বিতরণ করিনি? তা থেকে তুমি কতটুকু আখিরাতের জন্য পাঠিয়েছো?’ তখন সে ডানে বামে তাকাবে| কিন্তু কিছুই দেখতে পাবে না| সামনের দিকে তাকাবে| সেখানে জাহান্নাম ছাড়া কিছুই দেখতে পাবে না| যে ব্যক্তি নিজেকে দোযখ থেকে রক্ষা করতে পারে, তার নিজেকে রক্ষা করতে যত্নবান হওয়া উচিত তা যদি একটা খোরমার অংশ দিয়েও হয়| যার এটুকু ক্ষমতা নেই তারও উচিত অন্তত ভালো কথা বলে নিজেকে দোযখ থেকে রক্ষা করা| কেননা প্রতিটি ভালো কাজের পুরস্কার দশগুণ থেকে সাতশো গুণ পর্যন্ত দেয়া হয়| আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ|”

আরেকবার তিনি নিম্নরূপ ভাষণ দেন,

“সকল প্রশংসা আল্লাহর| আমি তাঁর প্রশংসা করি ও তাঁর কাছেই সাহায্য চাই| আমরা তাঁর কাছে প্রবৃত্তির কুপ্ররোচনা ও খারাপ কাজ থেকে আশ্রয় চাই| আল্লাহ যাকে হিদায়াত দান করেন তাকে কেউ বিপথগামী করতে পারে না| আর আল্লাহ যার জন্য গুমরাহীর অনুমোদন দান করেন তাকে কেউ সুপথগামী করতে পারে না| আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই| তিনি একক ও লা শরীক| বস্তত: আল্লাহর কিতাব হলো সর্বোত্তম কথা| যে ব্যক্তির অন্তরে তিনি কুরআনকে আকর্ষণীয় করেছেন এবং যাকে কুফরীতে নিমজ্জিত থাকার পর ইসলাম গ্রহণের সুযোগ দিয়েছেন এবং যে মানুষের কথা বাদ দিয়ে কুরআনকে গ্রহণ

করেছে সে সফলকাম| কেননা কুরআনের চেয়ে সুন্দর ও অলংকারমন্ডিত কথা আর নেই| আল্লাহ যা পছন্দ করেন তোমরা তাই পছন্দ কর| আল্লাহকে সমগ্র মন দিয়ে ভালবাস| আল্লাহর বাণী চর্চা ও তাঁর স্মরণে গাফিল হয়ো না এবং মনকে কঠিন হতে দিও না| কেননা আল্লাহ তাঁর প্রত্যেক সৃষ্টি থেকেই কিছু সংখ্যককে বাছাই করেন| তার আমল থেকেও কিছু আমলকে মনোনীত বলে স্থির করেছেন| তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকেও কিছু সংখ্যাক বান্দাকে মনোনীত করেছেন| তিনি উত্তম কথা পছন্দ করেন| মানুষকে কিছু দেয়া হয়েছে, তার মধ্যে হালাল ও হারাম দুই-ই আছে| অতএব আল্লাহর ইবাদাত কর এবং তাঁর সাথে কোন কিছু শরীক করো না| তাঁকে যথার্থভাবে ভয় কর| তোমরা যে সব কথা মুখে বলে থাক তার ভেতরে যে কথা উত্তম তাকে কার্যে পরিণত করার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সম্যবাদী হও, আল্লাহর অনুগ্রহ দ্বারা পরস্প রের মধ্যে ভালোবাসা গড়ে তোল| আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার লংঘিত হলে তিনি ক্রুদ্ধ হন| তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক|”

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে একটি ঘোষনাপত্র সম্প াদন করেন| এই দলীলের মাধ্যমে তিনি ইহুদীদের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের প্রতিশ্রুতি প্রদান ও গ্রহণ করেন, তাদের ধর্মপালনের স্বাধীনতা ও ধন সম্প দে তাদের মালিকানার স্বীকৃতি দেন এবং তদের সাথে কিছু শর্ত প্রদান ও গ্রহণ করেন| সে ঘোষণাপত্র নিম্নরূপ:

মুহাম্মাদ (সাঃ), কুরাইশ ও ইয়াসরিবের মু’মিন মুসলমানগণ এবং পরবর্তীকালে যারা তাদের অনুসারী হয়ে তাদের সাথে শরীক হবে ও একসাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করবে, তাদের পক্ষ থেকে এ একটি ঘোষণাপত্র| সমগ্র মানব জাতির মধ্যে তারা একটি স্বতন্ত্র উম্মাহ| কুরাইশদের মধ্য থেকে আগত মুহাজিররা তাদের ইসলাম গ্রহণকালীন অবস্থার ওপর বহাল থকবে, তাদের পরস্প রের মধ্যে ক্ষতিপূরণ দানের নীতি অক্ষুণ্ন থাকবে, তাদের পরস্প রের মধ্যে সাবেকী ক্ষতিপূরণ দানের নীতি অটুট থাকবে, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মু’মিনদের মধ্যে মুক্তিপণ নিয়ে বন্দীকে মুক্তি দেয়ার বিধান চালু থাকবে| বনু সায়েদাও তাদের ইসলাম গ্রহণকালীন অবস্থার ওপর বহাল থাকবে| তাদের প্রত্যেক গোষ্ঠীর মুমিনদের মধ্যে বন্দীকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়া চলবে| বনু হারেস তাদের ইসলাম গ্রহণকালীন অবস্থার ওপর বহাল থাকবে| তাদের পরস্প রের মধ্যে সবেকী ক্ষতিপূরণ দানের নীতি অক্ষুণ্ন থাকবে| তাদের প্রত্যেক গোষ্ঠীর মু’মিনদের মধ্যে বন্দীকে মুক্তপণের ভিত্তিতে মুক্তি দেয়ার রীতি অব্যাহত থাকবে| আর বনু জুশামও ইসলাম গ্রহণকালীন অবস্থার ওপর বহাল থাকবে| তাদের সাবেকী ক্ষতিপূরণ

দানের রীতি চালু থাকবে| তাদের প্রত্যেক গোষ্ঠীর মু'মিনদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গতভাবে মুক্তিপণের ভিত্তিতে বন্দী মুক্তির নীতি অক্ষুণ্ণ থাকবে| বনু নাজ্জারও ইসলাম গ্রহণকালীন অবস্থার ওপর বহাল থাকবে| তাদের প্রত্যেক গোষ্ঠীর মু'মিনদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গতভাবে মুক্তিপণ নিয়ে বন্দী মুক্তির নীতি অব্যাহত থাকবে| বনু আমর ইবনে আওফ ইসলাম গ্রহণকালীন অবস্থার ওপর বহাল থাকবে| তাদের সাবেকী ক্ষতিপূরণ দানের রীতি অব্যাহত থাকবে| তাদের প্রত্যেক গোষ্ঠীর মু'মিনদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গতভাবে মুক্তিপণের ভিত্তিতে বন্দীকে মুক্তি দেয়া চলবে| বনু নাবীত ইসলাম গ্রহণকালীন অবস্থার ওপর বহাল থাকবে| তাদের সাবেকী ক্ষতিপূরণ দানের রীতি চালু থাকবে| তাদের প্রত্যেক গোষ্ঠীর মু'মিনদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গতভাবে মুক্তিপণ নিয়ে বন্দী মুক্তির নীতি অব্যাহত থাকবে| বনু আওস ইসলাম গ্রহনকালীন অবস্থার ওপর বহাল থাকবে| তাদের প্রত্যেক গোষ্ঠীর মু'মিনদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গতভাবে মুক্তিপণের ভিত্তিতে বন্দীকে মুক্তি দেয়া চলবে| মু'মিনগণ তাদের মধ্যকার ঋণগ্রস্ত ও অধিক সন্তানধারী প্রত্যেক ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ ও মুক্তিপণদানে সঙ্গতভাবে আর্থিক সাহায্য করবে| কোন মু'মিন অন্য মু'মিনের মিত্রের বিরোধিতা করবে না| খোদাভীরু মু'মিনগণ তাদের মধ্যকার বিদ্রোহী, ঘোরতর নির্যাতক, অপরাধী, মুসলিম সমাজের স্বার্থের ক্ষতিকারক ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারকের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যাবস্থা নেবে এবং এ ধরনের অপরাধীর বিরুদ্ধে সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে পদক্ষেপ নেবে, চাই সে তাদের কারো ছেলেই হোক না কেন| কোন কাফিরের স্বার্থে এক মু'মিন অন্য মু'মিনকে হত্যা করবে না এবং কোন কাফিরকে কোন মুমিনের বিরুদ্ধে সাহায্য করবে না| মুসলিম রাষ্ট্রে অনুগত অমুসলিমের অধিকার সমানভাবে নিরাপদ| একজন নগণ্যতাম অমুসলিমকেও মুসলমানরা পূর্ণ নিরাপত্তাসহ আশ্রয় দেবে| মু'মিনরা পরস্প রের মিত্র হয়ে থাকবে, তবে অন্যদের বেলায় এ কথা প্রযোজ্য নয়| আর ইহুদীদের মধ্য হতে যে ব্যক্তি আমাদের আনুগত্য ও অনুসরণ করবে, সে আমাদের সমান অধিকার ও সাহায্য লাভ করবে| এ ধরনের লোকদের ওপর কোন যুলুম চলতে দেয়া হবে না এবং তাদের ওপর কাউকে হামলা চালাতে সাহায্য করা হবে না| মু'মিনদের রক্ষাকবচ সবার ক্ষেত্রে এক ও অভিন্ন| ইসলামের স্বার্থে কোন যুদ্ধ সংঘটিত হলে সেই যুদ্ধে মুসলমান কোন অমুসলমানের সাথে সমতা ও ন্যায়ের ভিত্তিতে ছাড়া আপোষরফা করবে না| আমাদের মধ্য হতে প্রতিটা যোদ্ধাদল অন্য যোদ্ধাদলকে অনুসরণ করবে| মুমিনদের একজন অন্যজনকে হত্যা করতে পারবে শুধুমাত্র হত্যার বিনিময়ে এবং আল্লাহর বিধান অনুসারে| খোদাভীরু মু'মিনগণ সর্বশ্রেষ্ঠ ও দৃঢ়তম আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত| মদীনার কোন

মুশরিক কুরাইশ সম্প্রদায়ের কারো জানমালের রক্ষক বা জিম্মাদার হতে পারবে না, আর কোন মু'মিনের ক্ষতি সাধনে তাকে প্রশ্রয় দেবে না| যে ব্যক্তি কোন মু'মিনকে মৃত্যুদন্ড অপরাধ না করা সত্বেও হত্যা করবে এবং তা যথাযথভাবে প্রমাণিত হবে, তাকে প্রাণদন্ডে দন্ডিত করা হবে| অবশ্য নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীকে অন্য কোন উপায়ে খুশী করে থাকলে প্রাণদন্ড হবে না| তবে সর্বাবস্থায় মুমিনরা সকলে ঐ মুসলিম হন্তার বিরুদ্ধে থাকবে এবং তার পক্ষপাতিত্ব করা কোন মুমিনের জন্য হালাল হবে না| এই ঘোষণাপত্রকে মেনে নিয়েছে এবং আল্লাহ ও আখিরাতে অটুট বিশ্বাস রাখে এমন কোন মু'মিনের জন্য ইসলামী বিধানে উদ্ভট জিনিস সংযোজনকারীর সাহায্য করা বা আশ্রয় দেয়া বৈধ নয়| যে ব্যক্তি এ ধরনের লোককে সাহায্য করবে কিংবা আশ্রয় দেবে তার ওপর আল্লাহর লা'নত এবং কিয়ামতের দিন আল্লাহর গজব নামবে| তার পক্ষে কোন সুপারিশ বা পণ গ্রহণ করা হবে না| আর তোমরা যখনই কোন বিষয়ে মতবিরেধে লিপ্ত হবে, তখন সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শরণাপন্ন হবে|

মু'মিনরা যতদিন যুদ্ধরত থাকবে ততদিন ইহুদীরা তাদের যুদ্ধের রসদ যোগানোতে অংশ নেবে| বনু আওফের ইহুদিরা মু'মিনদের সাথে একই উম্মতভুক্ত বলে গণ্য হবে, তারা নিজে এবং তাদের মিত্ররাও| কিন্তু মুসলমানরা ও ইহুদীরা সে অবস্থায় নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে| তবে যে ব্যক্তি যুলুম অত্যাচার ও অপরাধমূলক কাজে লিপ্ত হবে সে কেবল নিজের পরিবার পরিজনের ধ্বংসই ডেকে আনবে| বনু নাজ্জারভুক্ত ইহুদীদের অধিকার বনু আওফের ইহুদীদের সমান| অনুরূপভাবে বনু হারেস, বনু সায়েদা, বনু জুশাম, বনু আওস, বনু সা'লাবা ও বনু শতাইবার ইহুদীদের অধিকার বনু আওফের ইহুদীদের সমান| তবে যুলুম অত্যাচার ও পাপাচারে লিপ্ত ব্যাক্তি নিজের ও নিজের পরিবার পরিজনের কেবল ধ্বংসই সাধন করবে| সা'লাবার যাবতীয় বাহ্যিক ব্যাপার তাদের ভেতরকার ব্যাপারের সমপর্যায়ে তাদের প্রাণের মতই সম্মানার্হ| আনুগত্য ও প্রতিশ্রুতিপরায়ণতা যেন সাবাইকে পাপাচার থেকে রক্ষা করে| সা'লাবার মিত্রদের অধিকার তাদের নিজেদেরই সমান| ইহুদিদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার তাদের প্রাণের মতই সম্মানার্হ| তাদেও ভেতর থেকে কেউ মুহাম্মাদ (সাঃ)-র অনুমতি ছাড়া মদীনার বাইরে যেতে পারবে না| প্রত্যেকের জেনে রাখা উচিত যে, কোন প্রকারের তর্ক বা জেরা দ্বারা আগুন থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না| যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করলো সে নিজের ও নিজের পরিবার পরিজনের ধ্বংসের বিনিময়েই হত্যা করলো| অবশ্য নিহত ব্যক্তি অপরাধী হলে আলাদা কথা| আল্লাহ তায়ালা এ ক্ষেত্রে অধিকতর মহানুভবতা পছন্দ করেন| ইহুদীদের

ব্যয়ভার তারা নিজেরাই বহন করবে এবং মুসলামানদের ব্যয়ভারও তারা নিজেরাই বহন করবে| এই ঘোষণাপত্রকে যারা মেনে নিয়েছে তদের কর্তব্য, কোন শরীক যুদ্ধরত থাকলে তাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করা এবং পরস্প রের মধ্যে হিতকামনা, সদুপদেশ ও মহানুভবতার সম্প র্ক থাকবে, কোন পাপ কাজে একজন আর একজনের সাথে শরীক হবে না| নিজের মিত্রের ক্ষতি সাধন এক ভয়ংকর নজিরহীন অপরাধ| মযলুমকে সাহায্য করা সকলের কর্তব্য| মু'মিনরা যতদিন যুদ্ধরত থাকবে ততদিন ইহুদীরা তাদেরকে আর্থিক সহযোগিতা দিয়ে যাবে| [অর্থাৎ আল্লাহ ও মুমিনগণের তাদের সহযোগিতা নিতে আপত্তি নেই|] এই ঘোষণাপত্রের শরীকদের জন্য ইয়াসরিবের অভ্যন্তরভাগ সম্পূ র্ণ নিরাপদ| প্রতিবেশী যদি অপরাধী না হয় এবং ক্ষতিকর কাজে লিপ্ত না থেকে থাকে তা হলে তার জান, মাল ও ইজ্জত নিজের জান, মাল ও ইজ্জতের মতই পূর্ণ নিরাপত্তার অধিকারী| কারো বাড়ীর ভেতরে বাড়ীর মালিকের অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করা যাবে না| এই ঘোষণাপত্র গ্রহণকারীদের মধ্যে যে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা কিংবা ঝগড়া কলহ ঘটুক না কেন, তার ফায়সালার জন্য আল্লাহ ও মুহাম্মাদ (সাঃ)-র শরণাপন্ন হতে হবে| আল্লাহ সর্বাধিক সতর্কতা ও সততার সাথে এই ঘোষণাপত্রের বাস্তবায়ন দেখতে আগ্রহী|[উল্লেখযোগ্য যে, এই ঘোষণাপত্র যখন গ্রহণ করা হয় তখন জিজিয়া আরোপ করা হয়নি এবং মুসলমানগণ দুর্বল ছিল| সে সময় ইহুদীরা মুসলমানদের পক্ষে যুদ্ধ করলে যুদ্ধলব্ধ সম্প দে ইহুদীদের অংশ থাকতো| এই ঘোষণাপত্রে তাদের জন্য যুদ্ধের ব্যয়ভার বহনে অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক ছিল|] জেনে রাখা দরকার যে, কুরাইশ ও তাদের সহযোগীদের আশ্রয় দেয়া চলবে না| ঘেষনাপত্র গ্রহণকারীগণ মদীনা আক্রমণকারীকে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরোধ করবে| আর যখন সন্ধি ও মৈত্রী স্থাপনের আহ্বান জানানো হবে তখন তারা আহ্বানকারীর সাথে সন্ধি ও মৈত্রী স্থাপন করবে| এ ধরনের কোন সন্ধি ও মৈত্রীর দিকে তাদেরকে যখন আহ্বান জানানো হবে তখন তা মেনে চলা মু'মিনদের জন্যও বাধ্যতামূলক হবে| তবে যে বা যারা ধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে তখন তারা তাদের প্রাপ্য অংশ সেই পক্ষের নিকট থেকে নেবে যে পক্ষ তাদেরকে বাহিনীতে ভর্তি করেছিল| আওসে ইহুদীদের ও তাদের মিত্রদের অধিকার ও দায়দায়িত্ব এই ঘোষণাপত্র গ্রহণকারীদের অধিকার ও দায়দায়িত্বের মতই এবং ঘোষণাপত্র সম্প াদনকারীদের কাছ থেকে তারা পূর্ণ ন্যায়সঙ্গতভাবে তা লাভ করতে পারবে| কেউ সততার পথ অবলম্বন করলে তার পূর্বতন পাপাচার ক্ষমার চোখে দেখতে হবে| কেউ খারাপ কাজ করলে তা তার নিজেরই ক্ষতি সাধন করবে| আল্লাহ এই ঘোষণাপত্রের আনুগত্যের ব্যাপারে সর্বধিক সততা ও

সত্যবাদিতা দেখতে চান| এই ঘোষণাপত্র কোন অত্যাচারী বা অপরাধীর জন্য রক্ষকবচ নয়| যুলুম কিংবা অপরাধে লিপ্ত না হলে যুদ্ধ থেকে বেরিয়ে যাওয়া কিংবা নিষ্ক্রিয় বসে থাকা লোকও মদীনার চৌহদ্দির ভেতরে নিরাপত্তা লাভ করবে| যে ব্যক্তি সততা ও খোদাভীতির পথে অবিচল থাকবে, আল্লাহ ও মুহাম্মাদ (সাঃ) তার আশ্রয়দাতা ও সহায়ক থাকবেন|”

আযানের সূচনা

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মদীনায় তাঁর মুহাজির ভাইদের সবাইকে কাছে পেয়ে এবং আনসারদের ঐক্যবদ্ধ সমর্থন ও সহযোগিতা লাভ করে যখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন তখন ইসলাম একটি সুসংহত শক্তিতে পরিণত হলো| সঙ্গে সঙ্গে নিয়মিত নামায কায়েমের ব্যবস্থা হলো, যাকাত ও রোযা ফরয হলো এবং অপরাধ দমনের আইন চালু হলো| হালাল হারামের বিধানও কার্যকর হলো| এভাবে ইসলাম তাদের মধ্যে পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করলো| আনসারদের এই গোত্রটিই ঈমান গ্রহণের পর এখানে স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো| রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মদীনায় আসার পর মুসলমানগণ নামাযের সময় হলেই তাঁর কাছে আপনা থেকেই জমায়েত হতো, ডাকতে হতো না| রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মনস্থ করলেন, ইহুদীরা যেমন শিঙ্গা বাজিয়ে নামাযের জন্য লোক জমায়েত করে থাকে তিনিও তেমনি শিঙ্গা বাজানোর ব্যাবস্থা করবেন| কিন্তু পরক্ষণেই ব্যাপারটা তাঁর মনঃপূত না হওয়ায় বাদ দিলেন| এরপর ঘণ্টা বাজিয়ে মুসলমানদেরকে নামাযে ডাকায় বিষয়টি চিন্তা করলেন|

এইসব চিন্তাভাবনা চলাকালেই আবদুল্লাহ ইবনে যায়িদ কিভাবে মানুষকে ডেকে জমায়েত করতে হয় তা স্বপ্নে দেখলেন| তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, “হে আল্লাহর রাসূল, আজ রাতে আমি স্বপ্নে দেখলাম, অচেনা একজন লোক সবুজ কাপড় পড়ে এবং একটা ঘণ্টা হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে| লোকটা আমার কাছ দিয়ে চলে যাওয়ার সময় আমি তাকে বললাম, ‘ওহে আল্লাহর বান্দা, তুমি কি এই ঘন্টাটা বিক্রি করবে?’ সে বললো, ‘ঘণ্টা দিয়ে তুমি কি করবে?’ আমি বললাম, ‘নামাযের জন্য লোকজনকে ডাকবো|’ সে বললো, ‘তোমাকে এর চেয়ে ভালো জিনিস শিখিয়ে দেবো?’ আমি বললাম, ‘কি জিনিস, বলতো|’ সে বললো, ‘আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলল্লাহ, হাইয়া আলাস সালাহ, হাইয়া আলাস সালাহ, হাইয়া আলাল ফালাহ, হাইয়া আলাল ফালাহ, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্|” রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে স্বপ্নের বৃত্তান্ত জানানোর সঙ্গে সঙ্গে তিনি

বললেন, “ইনশাআল্লাহ এই স্বপ্ন সত্য৷ তুমি বিলালকে নিয়ে এক জায়গায় দাঁড়াও৷ তাকে কথাগুলো শিখিয়ে দাও৷ সে আযান দিক৷ কেননা ওর আওয়াজ তোমার আওয়াজের চেয়ে বড়৷” বিলাল আযান দিলেন৷ উমার (রাঃ) ঘরে বসে তা শুনলেন৷ সঙ্গে সঙ্গে তিনি চাদর টানতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-র কাছে এসে বললেন, “ইয়া রাসূলুল্লাহ, আল্লাহর কসম, আবদল্লাহ ইবনে যায়িদ যে স্বপ্ন দেখেছে, আমিও সেই রকম দেখেছি৷ তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ‘আলহামদুলিল্লাহ’ বলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন৷”

হিজরতের তারিখ

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন মদীনায় পৌঁছেন তখন সময় ছিল রৌদ্রতপ্ত দুপুরের প্রাক্কাল৷ তারিখ ছিল ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার৷ তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বয়স হয়েছিল ৫৩ বছর৷ এটা নবুওয়াতের ১৩ বছর পরের ঘটনা৷ অতঃপর রবিউল আউয়াল মাসের বাকী দিনগুলো এবং রবিউস সানী, জামাদিউল আউয়াল, জামাদিউস সানী, রযব, শা’বান, রমাদান, শাওয়াল, যিলকাদ, যিলহাজ্ব ও মুহররমের মাস মদীনাতেই অবস্থান করেন৷ [অর্থাৎ হিজরত করে মদীনায় যাওয়ার পরে এই সময়ে মদীনার বাইরে কোথাও যাননি।]

সারিয়া ও গাজওয়া

মুজাহিদ বাহিনী গঠন

মদীনায় পৌঁছে রাসূল (সাঃ) মুজাহিদ বাহিনী গড়ে তোলেন। এখানে কেউই পেশাদার সৈনিক ছিলেন না। তারা ছিলেন সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বেসামরিক নাগরিক। জিহাদের অংশগ্রহণ করার জন্য প্রত্যেক নাগরিককে চারটি শর্ত পূরণ করতে হতো - তাদের অবশ্যই মুসলমান হতে হবে, তাদেরকে প্রাপ্তবয়স্ক হতে হবে, শারীরিক এবং মানসিকভাবে সুস্থ হতে হবে, কারণ তখন রাষ্ট্রের খরচ বহন করার মতো অবস্থা ছিল না। সাহাবীরা অনেক কঠিন কঠিন কাজ করে অভিজ্ঞ ছিলেন। তবুও কিছু দক্ষতা প্রয়োজন ছিল। যা তাদেরকে শেখার নির্দেশ দেন । সাঁতার থেকে শুরু করে তীর চালনা ইত্যাদি নানারকম খেলার সাথে তিনি তাদের সখ্যতা গড়ে তোলেন।

জিহাদ ফরজ হওয়ার ধাপসমূহ

জিহাদ ফরজ হয়েছে চারটি ধাপে:-

প্রথম ধাপে যুদ্ধ নিষিদ্ধ ছিল। এটি হলো মক্কায় রাসূল (সাঃ) এর জীবনের সেই সময়ে যখন রাসূল (সাঃ)কে ধৈর্য ধারণ করতে বলা হয়েছিল।

দ্বিতীয় ধাপে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়েছে কিন্তু যুদ্ধ ওয়াজিব করা হয়নি। আল্লাহ সূরা হজ্জে যুদ্ধে অনুমতি দেওয়ার ব্যাপারে বলেন-যুদ্ধে অনুমতি দেওয়া হলো তাদেরকে যাদের সাথে কাফেররা যুদ্ধ করে; কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম। (সূরা হজ্জ২২:৩৯)

তৃতীয় ধাপে যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে শুধু তাদের সাথেই যুদ্ধ করাকে ওয়াজিব করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন- আর লড়াই করো আল্লাহর ওয়াস্তে তাদের সাথে, যারা লড়াই করে তোমাদের সাথে। অবশ্য কারো প্রতি বাড়াবাড়ি করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমা লংঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।(সূরা বাকারা ২:১৯০)

চতুর্থ ধাপে সব কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে ফরজ করে দেওয়া হয়েছে নিম্নলিখিত আয়াতের মাধ্যমে। আল্লাহ বলেন - নিশ্চয়ই আল্লাহর বিধান ও গণনায় মাস বারোটি আসমান সমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকে। তার মধ্যে চারটি সম্মানিত। এটি সু-প্রতিষ্ঠিত বিধান। এর মধ্যে তোমরা নিজেদের প্রতি অত্যাচার করো না। আর মুশরিকদের সাথে তোমরা যুদ্ধ কর সমবেতভাবে, যেমন তারাও তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছে সমবেতভাবে। আর মনে রেখো আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন। (সূরা তাওবা ৯:৩৬)

মুসলিম বাহিনীর অবস্থা বিবেচনা করেই যুদ্ধের বিধান ধাপে ধাপে দেওয়া হয়েছে। যুদ্ধে প্রস্তুতির জন্য সময় প্রয়োজন ছিল, প্রয়োজন ছিল একটি শক্ত ইসলামী রাষ্ট্রের। শত্রুর ভয়, চারপাশ থেকে নবী (সাঃ)র উপর নানান হামলা আসার আশঙ্কা, সমস্ত কিছু নিয়ে এক বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি হয় মদীনাতে। এই প্রতিকূলতা ও বিপত্তিগুলো থেকে উদ্ধার পাওয়া মুসলমানদের জন্য একটা অন্যতম চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। এমন অবস্থায় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মুসলমানদের যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করেন। যুদ্ধের অনুমতি পাওয়ার পর মুসলমানদের সামরিক তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। প্রহরী হিসেবে মুসলিম সেনাবাহিনী মদিনা ও তার সংলগ্ন এলাকায় নিরাপত্তায়ের জন্য কাজ শুরু করে।

গাজওয়া এবং সারিয়ার পার্থক্য

গাজওয়া: রাসূল (সাঃ) -এর নেতৃত্বে মুসলিম সেনাবাহিনীর অভিযানগুলোকে গাজওয়া বলে। নবীজির অংশগ্রহণে যে যুদ্ধগুলো হয়েছে তাই গাজওয়া। সেনাবাহিনী কম বা বেশি সেটা বিষয় না এবং যুদ্ধ হওয়া বা না হওয়া এখানে প্রভাব ফেলে না।

সারিয়া: যেসব সৈন্যদলকে সাহাবীদের নেতৃত্বে পাঠানো হতো তাদের সারিয়া বলা হয়। যা রাসূল (সাঃ) পাঠাতেন কিন্তু নিজে অংশগ্রহণ করতেন না । এক্ষেত্রেও যুদ্ধ হওয়া বা না হওয়া কিংবা শত্রুর কমবেশি হওয়া এতে প্রভাব ফেলে না। বেশিরভাগ সময় সারিয়াতে সৈন্য সংখ্যা কম হতো। নিজেদের নিরাপত্তা বা শত্রুদের বিভ্রান্ত করায় উদ্দেশ্য ছিল এবং এতে নিয়ম তান্ত্রিক যুদ্ধ হতো না।

গাজওয়া এবং সারিয়া-এর সংখ্যা:

রাসূল (সাঃ) এর হিজরতের পর থেকে যতগুলো গাজওয়া ও সারিয়া সংঘটিত হয়, তা নিয়ে বিভিন্ন মতভেদ আছে। এই মতভেদের কারণ হলো, অনেক সীরাহ- এর আলেমগণ সময়ের ব্যবধান কম হলে একটাই ধরেছেন। মতানুসারে ২৭টি, ২৪টি, ২১টি ১৯টি গাজওয়ায়ের উল্লেখ করেছেন মুসা ইবনে উকবা, মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক, ওয়াকেদি ইবনে সাদ, ইবনে জাওযি, সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব, জাবির বিন আব্দুল্লাহ, যায়েদ ইবনে আরকাম রহিমুল্লাহ। সারিয়া-এর ক্ষেত্রেও ইবনে সাদ এর মতে ৪০টি, ইবনে আব্দুল বার এর মতে ৩৫টি, মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক এর মতে ৩৮টি, ওয়াকেদি এর মতে ৪৮টি এবং ইবনে জাউযের মতে ৫৬টি।

উবায়দা ইবনুল হারিস (রাঃ)-এর নেতৃত্বে প্রথম সারিয়া: ইসলামী পতাকার নেতৃত্বে এটাই মুসলিমদের প্রথম সারিয়া। প্রথম হিজরীর শাওয়াল মাসে এই সারিয়া রাসূল (সাঃ) পাঠান যাতে সৈন্য সংখ্যা ছিল ৭০ জনের মত। অন্যান্য মত অনুযায়ী ৬০/ ৮০ মুহাজীর সাহাবী ছিলেন। রাসূল (সাঃ) উবাইদা ইবনু হারিসকে এই বাহিনীর নেতা হিসাবে নির্বাচন করেন। এই অভিযানে তারা রাবিগ উপত্যকায় মুশরিকদের সম্মুখীন হয়, যেখানে আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে প্রায় ২০০ জন মুশরিক ছিল। সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস শত্রুদের দিকে প্রথমবার মুসলিমদের হয়ে তীর নিক্ষেপ করেন। যুদ্ধটি খুব বেশি দীর্ঘস্থায়ী ছিল না। মক্কা থেকে মিকদাত বিন আমর ও উতবা বিন গাযওয়ান আসে মদিনার মুসলমানদের সাথে যোগ দিতে, যারা আগে থেকেই মুসলমান ছিল।

হামজা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (রাঃ) এর নেতৃত্বে সারিয়া:-আবু ইসহাকের বর্ণনা মতে, রাসূল (সাঃ) আবওয়া থেকে মদিনায় ফিরে হামজা ইবনে আব্দুল মুত্তালিবকে (রাঃ) সেনাপতি নিযুক্ত করে ইশের সমুদ্র উপকূলে প্রায় ৩০ জন মুহাজির সাহাবী পাঠান। এই সারিয়াতে শুধু মুহাজির ছিল সেই অঞ্চলে তারা আবু জেহেলের মুখোমুখি হয়। আবু জেহেলের সৈন্য সংখ্যা ছিল৩০০ জন। কিন্তু জুহায়না গোত্রের নেতা মাজদি ইবনে আমর এতে বাধা দেন এবং উভয় পক্ষের মিত্র হয়ে তাদের দুই দলকে শান্ত করেন। হামজা (রাঃ)য়ের এটা ছিল পতাকা যা রাসূল (সাঃ) নিজ হাত দিয়ে বেঁধে দিয়েছিলেন।

গাজওয়াতুল বুওয়াত

দ্বিতীয় হিজরী রবিউল আউয়াল মাসে রাসুল (সাঃ) ২০০ জন সাহাবীর দল নিয়ে বের হন। উমাইয়া ইবনে খালাফ ও কুরাইশ কাফেলার পথ রোধ করাই উদ্দেশ্য ছিল। মুসলমান বাহিনী

রাযওয়ার পার্শ্ববর্তী বুওয়াত নামক স্থানে পৌঁছান। তাদের দেখা না পেয়ে ফিরে আসেন।

গাজওয়াতুল উশাইরা

রাসূল (সাঃ) মদিনাতে আবু সালমা ইবনু আব্দুল আসাদকে শাসনভার দিয়ে কুরাইশদের ধরার জন্য উশাইরার উদ্দেশ্যে বের হন। সেখানে তিনি দ্বিতীয় হিজরির জুমাদুল উলার পুরো মাস ও জুমাদাল উখরার কিছুদিন অবস্থান করেন। এ সময় তিনি বনু মুদলিজ এবং তাদের মিত্র বনু যামরার সাথে চুক্তি করেন। তারপর মদিনায় ফিরে আসেন কারণ সম্পদবাহী যে কাফেলার উদ্দেশ্যে নবী (সাঃ) গিয়েছিলেন তারা আগেই শামদেশের দিকে চলে যায়।

গাজওয়ায়ে সাফওয়ান

এই গাজওয়াটি সংঘটিত হয় দ্বিতীয় হিজরির রবিউল আউয়াল মাসে। এর কারণ ছিল কুরয ইবনে জাবের মদিনার চারণভূমিতে আক্রমণ করে কিছু উট ও বকরি নিয়ে যায়। রাসূল (সাঃ) তার খোঁজে বের হয়ে বদরের পাশে সাফওয়ান উপত্যকা পর্যন্ত যান। কিন্তু তাকে ধরতে না পেরে মদিনায় ফিরে আসেন । এই অভিযানে সেনা ছিল প্রায় ৭০ জন ।পরবর্তীতে কুরয ইবনে জাবের ইসলাম গ্রহণ করেন। উড়াইনা গোত্রের বিরুদ্ধে রাসুল যখন ২০ জন সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন তখন এর নেতৃত্বের দায়িত্বে ছিলেন কুরয ইবনে যাবের। মক্কা বিজয়ের সময় তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

সারিয়া সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস

রাসূল (সাঃ) প্রথম হিজরীর যিলকদ মাসে সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস- এর সাথে ৮ জন সৈন্য দিয়ে কুরাইশ কাফেলার গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য পাঠান। তিনি হিজাজের খাররার নামক জায়গা পর্যন্ত যান। এই যাত্রায় তারা এত বেশি গোপনীয়তা বজায় রাখতেন যে, দিনের বেলা লুকিয়ে থাকতেন আর রাতের বেলা হাটতেন। কিন্তু সেখানে গিয়ে তারা জানতে পারেন, একদিন আগেই কাফেলা চলে গিয়েছে। অতঃপর তারা ফিরে আসেন।

সারিয়ায়ে নাখলা বা সারিয়ায়ে আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ

দ্বিতীয় হিজরির রজব মাসের শেষের দিকে কুরাইশদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্য আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ আসাদী-এর নেতৃত্বে ৮ জন মুহাজিরকে মতান্তরে 12 জনের বাহিনীকে রাসূল (সাঃ) প্রেরণ করেন। উনাকে নির্দেশনা দেয়া হয় যে, দুই দিনের পথ অতিক্রম করার পরে যেন রাসূল (সাঃ) থেকে প্রেরিত চিঠি পাঠ করেন।যাতে লেখা ছিল যে, আমার এই পত্র পাঠ করার পর তোমরা সামনের দিকে এগিয়ে চলবে এবং মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী নাখালয় অবতরণ করবে। এক কুরাইশ কাফেলার আগমনের প্রতীক্ষায় তোমরা সেখানে ওত পেতে থাকবে এবং তাদের অবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কে আমাদের অবহিত করবে।

তার সেনাদের নিয়ে তিনি দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে নাখলায় পৌঁছান। সেখানে কুরাইশদের এক বণিক দল যাচ্ছিল যাতে অনেক মূল্যবান সম্পদ ছিল। সেই কাফেলায় ছিল ইবনে মুগীরার দুই ছেলে ওসমান ও নওফল এবং আমর ইবনু হাযরামি ও হাকাম ইবনু কায়সান। সেই দিন ছিল রজবের শেষ দিন । তারা শুধুমাত্র খবর আনার লক্ষ্যে সেখানে গেলেও তারা আক্রমণ করে বসে এবং মুসলমানদের ছোড়া তীরে আমর ইবনু হাযরামি মারা যায়। এবং ওসমান এবং হাকাম কে বন্দী করে সমস্ত সম্পদ নিয়ে তারা মদিনায় ফিরে আসে। রাসূল (সাঃ)- এর দরবারে এই গনিমত নিয়ে আসার পর উনি অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং এই গনিমত ও

যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকেন। মুশরিকরা এই সুযোগ কাজে লাগায় তারা বলে মুসলমানরা অপরাধী কারণ তারা হারাম মাসে যুদ্ধ ও হত্যা করেছে তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরা বাকারার ২১৭ নং আয়াত নাজিল করেন। রাসূল (সাঃ) বন্দীদের ছেড়ে দেন এবং নিহত ব্যক্তির জন্য রক্তপন দেয়ার ব্যবস্থা করেন। ওসমান মক্কায় ফিরে গেলেও আকাম ইসলাম গ্রহণ করে এবং মদিনায় থেকে যায়।

কেবলা পরিবর্তন

দ্বিতীয় হিজরীতে এই স্মরণীয় ঘটনা ঘটে। নবীজির আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী বায়তুল মুকাদ্দাস- এর পরিবর্তে বায়তুল্লাহকে কেবলা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। আল্লাহর ইবাদতের জন্য কেন্দ্র হিসেবে নির্ধারণ করা হয় কাবাঘরকে।

বদর যুদ্ধ

কুরাইশ কাফেলার সংবাদ

রাসুল (সাঃ) খবর পেলেন শাম থেকে আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে কুরাইশদের একটি বড় বাণিজ্য কাফেলা আসছে। সেই কাফেলাতে আছে প্রায় পঞ্চাশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা সমপরিমাণ সম্পদ, এক হাজার উট কিন্তু এর পাহারায় আছে মাত্র ৩০ থেকে ৪০ জন ব্যক্তি। তিনি তখন সাহাবীদেরকে ডেকে বললেন, আমাদের একটি অভিযানে যেতে হবে। যার যার উট প্রস্তুত আছে সে যেন রওনা দেয়। গোপনীয়তার স্বার্থে উটের গলা থেকে ঘন্টা খুলে নেয়া হয়। দ্বিতীয় হিজরীর ১২ই রমজান তিনি সাহাবীদেরকে নিয়ে মদিনা থেকে বের হন।

বদর যুদ্ধে মুসলিমদের সৈন্য সংখ্যা

বদর যুদ্ধে মুসলিমদের সৈন্য সংখ্যা নিয়ে মতবিরোধ আছে। ইমাম বুখারী রাহিমুল্লাহ বলেছেন ৩১০ এর মত সৈন্যসংখ্যা ছিল, ইমাম মুসলিম রাহিমুল্লাহ বলেছেন সৈন্যসংখ্যা ছিল প্রায় ৩১৯ জন ।তারা কেবল কাফেলাকে আক্রমণের উদ্দেশ্যে বের হয়েছিল । আউশ গোত্রের ছিল ৬১ জন, হাজরাজের ১৭০ জন এবং বাকিরা ছিল মুহাজির।

আবু সুফিয়ানের কাফেলা নিরাপদ ও কুরাইশদের ষড়যন্ত্র

আবু সুফিয়ান তার কাফেলার উপর আক্রমণের জন্য মুসলিমবাহিনী মদিনা থেকে রওনা দেয়ার খবর পেলেন। শাম থেকে ফেরার পথে আবু সুফিয়ান খুব সতর্কতার সাথে মুসলিমদের গতিবিধি সম্পর্কে খোঁজ রাখছিলেন। কোন কোন বর্ণনামতে, শাম যাওয়ার সময় পেছন থেকে মুসলিমদের আক্রমণের সংবাদ তিনি পেয়েছিলেন এবং তাই ফিরতি পথে মুসলিমদের আক্রমণের ব্যাপারে অত্যাধিক সচেতন ছিলেন। চারিদিকে গোয়েন্দা ছড়িয়ে দেওয়া ছাড়াও তিনি নিজেও সে অঞ্চলের স্থানীয় অধিবাসীদের মুসলিমদের ব্যাপারে প্রশ্ন করছিলেন । বদর এলাকায় পৌঁছে তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কি তোমাদের এলাকায় অচেনা কাউকে দেখেছ?" তারা বলল ,"দুজন ব্যক্তিকে দেখেছি "আবু সুফিয়ান বলল," আমাকে তাদের বাহনের কাছে নিয়ে যাও।"আবু সুফিয়ান সেখানে গিয়ে তাদের উটের মল হাতে নিয়ে দেখলেন ভেতরে খেজুরের বিচি। তিনি সেই বিচি পর্যবেক্ষণ করে বললেন, "আল্লাহর কসম, এত ইয়াসরিবের উট" সাথে সাথে তিনি তাদের সম্পদ ও কাফেলা রক্ষার জন্য এগিয়ে আসতে আহ্বান জানিয়ে যমমম ইবনে আমর গিফারীকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মক্কায় পাঠালেন এবং তার কাফেলার সাধারণ পথ পাল্টে সমুদ্র উপকূলবর্তী পথ ধরে মক্কার দিকে

এগিয়ে চললেন। যমযম ইবনে আমর কুরাইশদের উত্তেজিত করতে ও পরিস্থিতির গুরুত্ব বোঝাতে উটের নাক কেটে, হাউদা উল্টিয়ে ও নিজের গায়ের জামা দুই দিক থেকে ছিঁড়ে মক্কায় প্রবেশ করেছিল। চিৎকার করে সে বলেছিল, "তোমাদের কাফেলা, তোমাদের কাফেলা! আবু সুফিয়ানের সাথে থাকা তোমাদের সম্পদের উপর মুসলিমরা হামলা করেছে। হয়তো তোমরা তোমাদের সম্পদ হারাতে যাচ্ছ। সাহায্য করো, সাহায্য করো।"কাফেলা বিপদে পড়ার খবর শুনে কুরাইশ নেতারা ক্রোধে ফুসে উঠলো। এটি ছিল তাদের ঔদ্ধত্য এবং অহমিকার উপরে যেমন আঘাত, তেমনি তাদের অর্থনীতির জন্য হুমকি স্বরূপ। কাফেলা রক্ষা করার জন্য তারা দিশেহারা হয়ে তাদের পূর্ণ সামরিক শক্তি নিয়ে বদর অভিমুখে রওনা দিল। ইবনে ইসহাকের বর্ণনামতে, কুরাইশ বাহিনীতে ছিল ১০০ এর বেশি ঘোড়া ৬০০ বর্ম পরিহিত সৈন্য ও ৫০০ এর বেশি উট। ওদিকে আবু সুফিয়ান বিপদজনক এলাকা অতিক্রম করে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে কুরাইশ নেতাদের কাছে খবর পাঠালো যে - কাফেলা রক্ষা পেয়েছে, আপনারা মক্কায় ফিরে যান। কিন্তু এর মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল। তাদের অধিকাংশই মুসলিমদের সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার পক্ষে অবস্থান নিল। তাদের যুক্তি ছিল মুসলিমদের উপর আক্রমণ করলেই কুরাইশদের ব্যবসার পথ ভবিষ্যতের জন্য নিরাপদ হবে এবং অন্য গোত্রগুলোর উপর এর প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হবে। যুদ্ধে অংশগ্রহণের ব্যাপারে কুরাইশদের প্রধান নেতৃবৃন্দ সকলেই একমত হল ও রওনা দেওয়ার প্রস্তুতি নিতে শুরু করল।

নবীজী (সাঃ) -এর সাহাবীদের সাথে মাশোয়ারা

নবীজী (সাঃ) যখন জানতে পারলেন আবু সুফিয়ান নাগালের বাইরে চলে গেছে এবং মক্কার নেতারা যুদ্ধের জন্য এগিয়ে আসছে তখন তিনি পরামর্শের জন্য সাহাবীদের একত্রিত করলেন। কিছু সাহাবী যুদ্ধের পক্ষে মত দিলেন ,আর কিছু সাহাবী কুরাইশদের মুখোমুখি হতে ভরসা পাচ্ছিলেন না এই প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, যেমন করে তোমাকে তোমার পরওয়ারদিগার ঘর থেকে বের করেছেন ন্যায় ও সৎ কাজের জন্য, অথচ ঈমানদারদের একটি দল তাতে সম্মত ছিল না। তারা তোমার সাথে বিবাদ করছিল সত্য ও ন্যায় বিষয়ে, তা প্রকাশিত হবার পর; তারা যেন মৃত্যুর দিকে ধাবিত হচ্ছে দেখতে দেখতে। আর যখন আল্লাহ দুটি দলের একটি ব্যাপারে তোমাদের সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, সেটি তোমাদের হস্তগত হবে, আর তোমরা কামনা করেছিলে যাতে কোনরকম কন্টক নেই ,তাই তোমাদের ভাগে আসুক ;অথচ আল্লাহ চাইতেন সত্যকে স্বীয় কালামের মাধ্যমে সত্যে পরিণত করতে এবং কাফেরদের মূল কর্তন করে দিতে। যাতে করে সত্যকে সত্য এবং মিথ্যাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে দেন , যদিও পাপীরা অসন্তুষ্ট হয় । (সূরা আনফাল ৮:৫৮)

এরপর রাসূল বললেন, "হে লোকসকল, আমাকে পরামর্শ দাও ।"তিনি এখানে আনসারদের মত জানতে চাচ্ছিলেন। কারণ তারাই ছিলেন সেনাবাহিনীর অধিকাংশ এবং আকাবার দ্বিতীয় বাইয়াত অনুযায়ী, মদিনার বাইরে রাসুল (সাঃ)কে রক্ষা করার দায়িত্ব তাদের উপর বর্তায় না। আনসারদের পতাকাবাহী সাদ বিন মুয়ায নবীজির উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে বললেন, "আপনি বোধহয় আমাদের বললেন। আমরা আপনার উপর ঈমান এনেছি ,আপনাকে সত্যায়ন করেছি, সাক্ষ্য দিয়েছি যে, আপনি যা কিছু নিয়ে এসেছেন তা সবই সত্য এবং আমরা আপনার আনুগত্যের শপথ করেছি। আপনি আপনার লক্ষ্যে এগিয়ে যান। হে আল্লাহর রাসূল, আপনাকে যিনি সত্য দিয়ে প্রেরণ করেছেন সেই রবের শপথ, যদি আপনি আমাদের নিয়ে

সমুদ্রেও ঝাঁপিয়ে পড়েন তবে আমরাও আপনার সাথে ঝাঁপিয়ে পড়ব। আমাদের একজনও পিছিয়ে থাকবে না। আপনি চাইলে আমাদের নিয়ে শত্রুর মুখোমুখি হন, আমরা যুদ্ধে ধৈর্যশীল থাকবো । আক্রমণের মুখে আমরা জোয়ানী ও তেজদীপ্ত পৌরুষের প্রমাণ দিব। যুদ্ধের ময়দানে আল্লাহ আমাদের পক্ষ থেকে এমন কিছু দেখাবেন যা আপনার চোখ শীতল করবে। সুতরাং আপনি যেখানে ইচ্ছা আমাদের নিয়ে চলুন। আল্লাহ আমাদের কাজকর্মে বরকত দান করুন।" আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তার কথা শুনে ভীষণ খুশি হলেন তিনি বললেন, "এগিয়ে যাও এবং সুসংবাদ গ্রহণ করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাকে দুদলের মধ্য থেকে একটি অঙ্গীকার করেছেন। আল্লাহর কসম আমি যেন এখনই সেই কওমের বধ্যভূমি দেখতে পাচ্ছি।"

গায়েবি সাহায্য

আল্লাহ তার রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করলেন সে রাতেই । মক্কা বাহিনীর উপরে বৃষ্টি বর্ষিত হল মুষলধারার মতো। তাদের পায়ের নিচের মাটি কাদায় পরিণত হলো। আর সেই বৃষ্টির পানিতে মুসলিম বাহিনী হয়ে গেল পবিত্র।

মুসলমানদের অঙ্গীকার

যুদ্ধাস্ত্রে সুসজ্জিত এক হাজার সৈন্যের মোকাবিলায় সাজ সরঞ্জামহীন ৩০০ জন মুজাহিদ মুখোমুখি হন। এমন অবস্থায় একজন মানুষও যুদ্ধে শরীর হতে চাইলে কত বড় উপকার হত। কিন্তু ইসলাম ধর্মে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বদর যুদ্ধের ময়দানে হুজাইফা (রাঃ) ও আবু হুসাইল(রাঃ) যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে এসে তাদের কাহিনী বর্ণনা করেন যে, এখানে আসার পথে কুরাইশরা তাদেরকে আটক করে জানতে চায় ,"তোমরা কি মুহাম্মাদের সাহায্যার্থে যাচ্ছ?" তারা অস্বীকার করেন। তখন কুরাইশরা তাদেরকে যুদ্ধে শরিক না হওয়ার অঙ্গীকার করায়। নবীজি এই অঙ্গীকার সম্পর্কে জানতে পেরে এ দুজনকেই যুদ্ধে অংশ নিতে নিষেধ করলেন এবং "বললেন আমরা সর্বাবস্থায় ওয়াদা রক্ষা করব। আল্লাহর সাহায্যই আমাদের জন্য যথেষ্ট।"

দুইপক্ষ সারিবদ্ধ ভাবে মুখোমুখি হওয়ার পর কুরাইশের ৩ বাহাদুর যোদ্ধা এগিয়ে আসে- উতবা, শাইবা ও ওয়ালিদ। মুসলমানদের পক্ষ থেকে তাদের মোকাবেলা করেন আলী (রাঃ) হামযা (রাঃ) ও উবাইদা বিন হারিস (রাঃ)। কাফের তিনজন নিহত হয়। মুসলমানদের মধ্যে শুধু ওবায়দা (রাঃ) আহত হন। আলী (রাঃ) তাকে কাঁধে তুলে নবীজির কাছে নিয়ে আসেন। নবীজি তার মাথা নিজ পায়ের উপর রেখে তাকে শুইয়ে দেন এবং তার চেহারার ধুলোবালি নিজ হাতে মুছে দেন। উবায়দা(রাঃ) যখন শেষ নিঃশ্বাস যখন ত্যাগ করেন, তখন নবীজিকে জিজ্ঞেস করেন, "আমি কি শাহাদাতের ফজিলত থেকে বঞ্চিত হব?" আল্লাহর নবী উত্তর দেন ,"না , তুমি শহীদ। এ ব্যাপারে আমি সাক্ষী থাকলাম ।"উবাইদা (রাঃ)-র মৃত্যুর পর নবীজি স্বয়ং তার কবরে অবতরণ করেন এবং নিজ হাতে তাকে সমাহিত করেন।

সাহাবীদের ত্যাগ

যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর অনেক আত্মীয় সাহাবীদের তরবারির নাগারে চলে আসে। কিন্তু তারা ঈমানের উপরে এত বেশি দৃঢ় ছিল যে, সেখানে আত্মীয়তার সম্পর্কও ম্লান হয়ে যায়। আবু বকর (রাঃ)-এর পুত্র যে তখনও মুসলমান হয়নি, ময়দানে এলে স্বয়ং আবু বকর (রাঃ) তরবারি নিয়ে তার দিকে অগ্রসর হন । উতবা সামলে এলে তার পুত্র হুজাইফা (রাঃ) তরবারি খাপমুক্ত করে তার দিকে এগিয়ে যান। তরবারি থাকমুক্ত করে তার দিকে এগিয়ে যান। ওমর

(রাঃ) তার মামাকে রণক্ষেত্রে দেখতে পেয়ে তাকে আক্রমণ করতে উদ্যত হন। তুমুল লড়াই শুরু হয় ময়দানে। যুদ্ধ চলছিল আর নবীজি সেজদায় পড়েছিলেন। তিনি আল্লাহর কাছে সাহায্য চাচ্ছিলেন।

ফেরেশতাদের যুদ্ধ

বদর যুদ্ধে আল্লাহ তাআলা সরাসরি প্রথমে ১০০০, এরপর ৩০০০ এবং সবশেষে ৫ হাজার ফেরেশতা নাযিল করে মুসলিম বাহিনীকে সাহায্য করেন। তবে কোন কোন বর্ণনামতে, আল্লাহ শুধু ১০০০ ফেরেশতা নাযিল করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ কুরআনে বলেছেন সূরা আনফালের ১২ নং আয়াতে, সূরা আলে ইমরানের ১২৪ ও ১২৫ নং আয়াতে।

সূরা আনফারে বলা হয়েছে- যখন নির্দেশ দান করেন ফেরেশতা দিগকে তোমাদের পরওয়ারদিগার যে, আমি সাথে রয়েছি তোমাদের, সুতরাং তোমরা মুসলমানদের চিত্তসমূহকে ধীরস্থির করে রাখ। আমি কাফেরদের মনে ভীতির সঞ্চার করে দিব । কাজেই গর্দানের উপর আঘাত হানো এবং তাদেরকে কাটো জোড়ায় জোড়ায়।

আবু উসাইদ সায়েদী বলেন, "বদর যুদ্ধের দিন ফেরেশতারা গৌরবর্ণের পাগড়ি পরিহিত ছিলেন এবং পাগড়ীর শেষ প্রান্ত দুই কাঁধের মাঝে ছেড়ে দেওয়া অবস্থায় ছিল।"

জুবায়ের ইবনুল আওয়াম বদর যুদ্ধের দিন গৌরবর্ণের পাগড়ী পড়ে যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছিলেন। সকল ফেরেশতারা তার অনুকরণে গৌর বর্ণের পাগড়ী পড়ে নেমে আসে। নিঃসন্দেহে এটি তার জন্য এক বিরল সম্মান। ইবনে আব্বাস বলেন, বদর যুদ্ধে জনৈক মুসলিম মুজাহিদ একজন মুশরিক সেনার পিছু ধাওয়া করছিলেন। হঠাৎ তিনি সেই মুশরিক সৈনিকের উপর চাবুকের আঘাত শুনতে পেলেন এবং তার পাশাপাশি একজন অশ্বারোহীর কণ্ঠস্বর শুনলেন। তিনি বলছিলেন,"হাইজুম! (ফেরেশতার বাহনের নাম) এগিয়ে যাও।"সাথে সাথে ওই মুশরিক মাটিতে গড়িয়ে পড়ে। তিনি দেখলেন তার নাক ও মুখ মন্ডল থেকে রক্ত বেরোচ্ছে যেন কেউ তাকে বিষাক্ত চাবুক দিয়ে আঘাত করেছে। ওই আনসারী সাহাবী রাসূল(সাঃ)কে ঘটনাটি জানালে রাসূল(সাঃ) বললেন , "তুমি ঠিকই বলেছ, তিনি ছিলেন তৃতীয় আকাশ থেকে অবতরণকারী ফেরেশতা।"

আলী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আনসারী গোত্রের এক সাহাবী বদর যুদ্ধের দিন আব্বাসকে গ্রেপ্তার করে আনে। আব্বাস বলছিলেন, "আল্লাহর শপথ, সে আমাকে গ্রেফতার করেনি। আমাকে অনিন্দ্য সুন্দর চেহারার এক লোক গ্রেপ্তার করেছেন যার মাথার দিকে কোন চুল ছিল না এবং তিনি ছিলেন ধূসর বর্ণের ঘোড়ার আরোহী। আমি উপস্থিত লোকদের মাঝে তাকে দেখছি না।"

অবশেষে বিজয়

বদর যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী বিজয় অর্জন করে। মুশরিকদের ৭০ জন্য নিহত হয় এবং ৭০ জন বন্দী হয়। আর মুসলিম বাহিনীর ১৪ জন মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করে। তাদের মধ্যে ছিলেন ৬ জন মুহাজির ও ৮ জন আনসার। যুদ্ধের পর রাসূল (সাঃ) মুশরিকদের ২৪ জন সর্দারের লাশ বদরের নোংরা, অপবিত্র ও দুর্গন্ধময় কুয়ায় ফেলে দেয়ার নির্দেশ দেন। ৭০ জনের মধ্যে বাকিদের লাশ অন্য কুয়ায় ফেলে দেয়া হয়। তিন দিন অতিক্রান্ত হলে ২০ রমজান রাসূল(সাঃ) বদর প্রান্ত থেকে রওনা দিলেন ফিরে আসার সময় তিনি ২৪ জন সর্দারের লাশ যে কুয়ায় ফেলা হয়েছিল তার নিকটে গিয়ে তাদের প্রত্যেককে 'অমুক ইবনে অমুক' বলে

ডাকলেন এবং বললেন," আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করা তোমাদের ভালো লাগেনি। তোমাদের প্রতি আমাদের রব যে ওয়াদা করেছেন, আমরা তা সঠিক ও সত্য হওয়ার নিশ্চিত প্রমাণ পেয়েছি। তোমাদেরকে যে অঙ্গীকার প্রদান করা হয়েছে তা তোমরা সত্য হিসেবে পেয়েছ কি?"

এ কথা শুনে ওমর (রাঃ) বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল, আপনি কি প্রাণহীন কতগুলো লাশের সাথে কথা বলছেন?" রাসূল (সাঃ)বললেন ,"ওই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! তোমরা আমার কথা তাদের চেয়ে বেশি শুনতে পাও না। তবে পার্থক্য এতটুকু যে, তারা কথার জবাব দিতে পারে না। " চূড়ান্ত বিজয়ের পর রাসূল (সাঃ) মদিনা বাসীর নিকট সুসংবাদ প্রদানের জন্য মদিনার উচ্চ এলাকাতে আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহাকে এবং নিম্ন এলাকায় জায়েদ বিন হারিসা (রাঃ)-কে পাঠালেন। রাসুল (সাঃ)- এর উট কাসওয়ার পিঠে চড়ে তাকবীর দিতে দিতে মদিনায় প্রবেশ করলেন। মদিনা বাসী তার চারপাশে জড়ো হলে তিনি কুরাইশদের নিহত নেতাদের নাম বলতে লাগলেন আর মুসলিমরা আনন্দ ও আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করলেন।

বদর যুদ্ধের বিজয়ের সংবাদ যেদিন মদিনায় আসে, সেদিন আরেকটি বিষাদময় ঘটনা ঘটে। রাসূল (সাঃ) -এর প্রিয় কন্যা ও ওসমান(রাঃ)- এর স্ত্রী রুকাইয়া ইন্তেকাল করেন। বিজয়ী মুসলিম বাহিনী যখন মদিনায় প্রবেশ করছে, তখন মাত্র রুকাইআ'র দাফন -কাফন সম্পন্ন হয়েছে । তাই রাসূলের জন্য এই দিন ছিল আনন্দ ও কন্যা হারানোর কষ্টের দিন। আল্লাহ যেন মুসলিমদেরকে জানিয়ে দিলেন যে এই দুনিয়া চিরস্থায়ী সুখের বা আনন্দের জায়গা নয়।

আবু জেহেল -এর মৃত্যু

আব্দুর রহমান ইবনে আওফ বলেন, বদর যুদ্ধের দিন আমি ছিলাম যুদ্ধের সারিতে। আমার ডানে-বায়ে দেখলাম দুজন অল্পবয়সি আনসার কিশোর। (তারা দুজন হল মুয়াজ ইবনে আফরা ও মুয়াজ ইবনে আমর ইবনে জামুহ) আমি ভাবলাম আমার পাশে শক্তিশালী দুজন যোদ্ধা থাকলে খুব ভালো হত। তাদের একজন আমাকে বলল ,"চাচাজান, আপনি কি আবু জেহেলকে চেনেন ?" আমি বললাম," তোমরা তার কি করবে?" সে বলল, "আমি শুনেছি যে, রাসূল (সাঃ)-এর ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য করে । ওই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ !আমি যদি তাকে দেখতে পাই, তবে হয় আমি মারা যাব অথবা সে মারা যাবে।"আমি তার কথায় আশ্চর্য হলাম। দ্বিতীয়জনও আমাকে একই কথা বলল। তখনই আমি আবু জেহেলকে দেখলাম। সে লোকজনের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি তাদেরকে দেখিয়ে দিলাম। তারা সাথে সাথে নিজের তরবারি নিয়ে ছুটলো এবং তাকে আঘাত করে বসলো। অতঃপর রাসূল (সাঃ)-এর কাছে গিয়ে এই খবর জানানো হলে রাসূল(সাঃ) বললেন," তোমাদের মধ্যে কে তাকে হত্যা করেছ?" তারা উভয়ে দাবি করল যে সেই তাকে হত্যা করেছে । তখন রাসুল (সাঃ) তাদের তরবারি দেখেন এবং বলেন ,"তোমরা উভয়েই তাকে হত্যা করেছ। অবশ্য তার নিকট হতে প্রাপ্ত মালামাল মুয়াজ ইবনে আমর ইবনে জামুকে দেওয়া হল। মুয়াজ বিন আমর বিন জামুহ বর্ণনা করেছেন, "যখন আমি আবু জেহেলকে আঘাত করলাম, (এই আঘাতের ফলে তার পা দ্বিখন্ডিত হয়ে খুলে পড়ে যায়) অন্যদিকে তখন তার পুত্র ইকরিমা আমার কাঁধে তরবারির আঘাত করল এবং তাতে আমার হাত কেটে গিয়ে চামড়ার সঙ্গে ঝুলে থাকলো এবং যুদ্ধের জন্য প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ালো। আমি সেটি পিছনে টেনে নিয়ে সাধারণভাবে যুদ্ধ করতে

থাকলাম। কিন্তু সে যখন আমাকে খুবই কষ্ট দিতে লাগলো তখন আমি তার ওপর আমার পা রেখে জোরে টান দিয়ে তাকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললাম। রাসুল বললেন," আবু জেহেলের কি অবস্থা, তোমরা কি একটু দেখে আসবে?" এ কথা শুনে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ দেখতে গেলেন। তিনি দেখতে পেলেন, সে মুমূর্ষ অবস্থায় পড়ে আছে। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ বলেন আমি বদরের দিন আবু জেহেলকে আহত অবস্থায় দেখে তাকে বললাম ,"হে আল্লাহর শত্রু, শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তোমাকে লাঞ্ছিত করেছেন।"উত্তরে সে বলল," আমাকে কিভাবে লাঞ্ছিত করেছেন? তোমরা যাকে হত্যা করেছ তার চেয়ে সম্মানিত আর কে আছে ?"আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন, আমার কাছে তরবারি ছিল আমি তাকে হত্যা করতে অগ্রসর হয়ে দেখতে পেলাম তার তার হাতে ধারালো তরবারি মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায় আছে। আমি তার হাতে আক্রমণ করলে তার হাত থেকে তা পড়ে গেল। অতঃপর আমি তার শিরস্ত্রাণ খুলে ফেললাম এবং তার দাড়ি ধরে তার শিরচ্ছেদ করে ফেললাম। এরপর রাসূল (সাঃ)-কে তার কর্তৃত মাথা নিয়ে গিয়ে দেখালে রাসূল(সাঃ) তার মৃতদেহ দেখতে চাইলেন। আমি তাকে তাও দেখালাম। এরপর রাসূল(সাঃ) বললেন ,"সে হচ্ছে এই উম্মতের ফেরাউন" এবং তিনি আল্লাহর প্রশংসা করলেন ও আবু জেহেলের তরবারিটি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদকে দিয়ে দিলেন।
উমাইয়া ইবনে খালাফের লাশ অত্যাধিক ফুলে যায়। এ কারণে লাশের গা থেকে বর্ম খুলতে গিয়ে লাশটি খণ্ড-বিখন্ড হয়ে যায়। সে স্থানেই লাশটি মরুভূমির তপ্ত পাথর দিয়ে চাপা দেওয়া হয়। এটাই আল্লাহর ফয়সালা- যে তপ্ত মরুভূমির পাথরে তিনি একদিন বেলাল (রাঃ)-কে চাপা দিতেন, সেই পাথরের নিচেই তার খন্ড-বিখন্ড মৃতদেহ চাপা পড়ে যায়। সুবাহানাল্লাহ।

যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে মতবিরোধ

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন, যুদ্ধবন্দীদের আটক করা হলে, রাসূল (সাঃ) এদের সম্পর্কে আবু বকর(রাঃ) ও ওমর (রাঃ)- এর সাথে পরামর্শ করলেন। আবু বকর(রাঃ)তাদেরকে মুক্তিপণ নিয়ে মুক্তি দেওয়ার জন্য সুপারিশ করলেন এবং বললেন, এতে কাফেরদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের শক্তি বাড়বে এবং হতে পারে তারা ভবিষ্যতে ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় নিবে। কিন্তু ওমর (রাঃ) বললেন, তাদের প্রত্যেককেই তাদের মুসলিম আত্মীয়দের হাতে তুলে দেওয়া হোক এবং তারা তাকে হত্যা করবে । তিনি বললেন আকিলকে আলীর হাতে দিন। সে তার মস্তক ছিন্ন করবে। আমার বংশের অমুকে আমার হাতে দিন, আমি তাকে হত্যা করব। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ (রাঃ) ভিন্ন বর্ণনায় আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা-এর অতিরিক্ত একটি প্রস্তাবের কথা এসেছে। তিনি বলেছিলেন," হে আল্লাহর রাসূল, তাদেরকে ঘন জঙ্গলে প্রবেশ করিয়ে সেখানে আগুন জ্বালিয়ে ধ্বংস করে দিন।" রাসূল (সাঃ)আবু বকর (রাঃ)-এর সিদ্ধান্তই পছন্দ করলেন সকলের মত শোনার পর রাসূল(সাঃ) বললেন ,"নিশ্চয়ই আল্লাহ কিছু মানুষকে এতটাই কোমল হৃদয়ের অধিকারী করেছেন যে তার হৃদয় দুধের চেয়েও কোমল। আবার কিছু মানুষকে এতটা কঠোর হৃদয়ের অধিকারী করেছেন যে তা পাথরের চেয়েও কঠিন। হে আবু বকর ! তোমার উদাহরণ ইব্রাহিম আলাইহি ওয়াসাল্লাম - এর মত। তিনি বলেছিলেন ,।হে পালনকর্তা, এরা অনেক মানুষকে বিপথগামী করেছে। অতএব যে আমার অনুসরণ করে সে আমার এবং কেউ আমার অবাধ্যতা করলে নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (সূরা ইব্রাহীম, ১৪৩:৬)
সাহাবায়ে কেরাম মুশরিকদের বন্দি করতে শুরু করলে সাদ বিন মুয়াজ মনঃক্ষুণ্ন হন । রাসূল

(সাঃ) তার চেহারার এমন ভাব দেখে তাকে বললেন, "সঙ্গীদের কর্মকান্ডে হয়তো তুমি বিরক্ত হচ্ছ। তিনি বললেন ,"হে আল্লাহর রাসূল, ঠিকই বলেছেন। কাফের বাহিনীর বিরুদ্ধে এটি সর্বপ্রথম সুযোগ। তাদের বাঁচিয়ে রাখার চেয়ে মেরে ফেলাই ভালো হতো বলে আমি মনে করি।"রাসূল (সাঃ) বন্দীদের সাথে বিভিন্ন রকম আচরণ করেছিলেন। দুইজনকে মাত্র হত্যা করা হয়, অধিকাংশকেই কেবল মুক্তিপণ নিয়ে মুক্তি দেওয়া হয়, কয়েকজনকে দয়াপরবশ হয়ে মুক্তিপণ ছাড়াই মুক্তি দেওয়া হয়, আবার যাদের মুক্তিপণ দেওয়ার সামর্থ্য ছিল না তাদের কয়েকজনকে মুসলমানদের দশজন করে শিশুকে শিক্ষা দানের জন্য নিয়োগ দেওয়া হয়।

আবুল আস - এর ঘটনা

আবুল আস মুক্ত হয়ে মক্কায় ফিরে আসেন এবং শর্তানুযায়ী যয়নাব(রাঃ)-কে মদিনায় পাঠিয়ে দেন। আবুল আস ছিলেন বড় ব্যবসায়ী। ঘটনা ক্রমে সিরিয়া থেকে পণ্য আনার সময় তিনি আবারও বন্দী হোন এবং তাকে আবারো ছেড়ে দেওয়া হয়।

এবার তিনি ফিরে গিয়ে ব্যবসার অংশীদারদের ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি বলেন ,"মক্কায় ফিরে গিয়ে মুসলমান হওয়ার কারণ হলো, লোকেরা যেন বলতে না পারে আমি তাদের সম্পদ ফিরিয়ে দেওয়ার ভয়ে মুসলমান হয়ে গেছি অথবা আমাকে জোরপূর্বক মুসলমান বানানো হয়েছে।"

ইহুদিদের বেয়াদবি রাসুল (সাঃ)- এর সাথে

একদিন একদল ইহুদি রাসূল(সাঃ)- এর সামনে এসে বলল ,অসসামু আলাইকা ইয়া রাসুলুল্লাহ। কথাটি শুনতে আসসালামু আলাইকুম মনে হলেও, এর অর্থ হল -তোমার মৃত্যু হোক ।আয়িশা(রাঃ) এ কথা শুনে খুবই রেগে গেলেন। তিনি ইহুদিদেরকে অভিশাপ দিতে লাগলেন । তখন রাসূল (সাঃ) তাকে নিষেধ করলেন। ইহুদিরা এটা নিয়ে বলাবলি করা শুরু করলো যে, তারা রাসূল(সাঃ)-কে নিয়ে এভাবে বলল, তবু আল্লাহ তাদের শাস্তি দিচ্ছেন না। তারমানে মুহাম্মদ (সাঃ) মিথ্যা বলে, তিনি আল্লাহর রাসূল নন। আস্তাগফিরুল্লাহ। এছাড়াও তারা মুনাফিকদের সাথে একত্রিত হয়। মদিনা সনদের চুক্তি সমূহের বিরোধিতা করে। ইসলামী দাওয়াতের বিরোধিতা শুরু করে। মানুষকে মুসলিম হওয়া থেকে বিরত রাখার সর্বোচ্চ চেষ্টা শুরু করে।

আলী (রাঃ) ও ফাতিমা (রাঃ)-এর বিয়ে

দ্বিতীয় হিজরীতে (মাসের ব্যাপারে মতভেদ আছে- যিলহাজ/ মহররম/ সফর) রাসুল (সাঃ)তার কনিষ্ঠ কন্যা ফাতেমা(রাঃ)-র সাথে আলি(রাঃ)র বিবাহ দেন। প্রথমে আবুবকর (রাঃ)এবং ওমর(রাঃ) এই সৌভাগ্য লাভ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু রাসূল(সাঃ) চুপ থাকেন। অতঃপর আবু বকর (রাঃ)-এর পরামর্শক্রমেই আলী(রাঃ রাসূল (সাঃ)-কে এই প্রস্তাব দিলে রাসূল (সাঃ) তা মঞ্জুর করেন। ভিন্ন বর্ণনায় রয়েছে, আলী(রাঃ) সরাসরি প্রস্তাব দিতে লজ্জা পাচ্ছিলেন বিধায় তিনি ইঙ্গিতে বোঝানোর চেষ্টা করছিলেন । রাসূল (সাঃ) এই অভিপ্রায় এর কথা জিজ্ঞেস করলে আলী(রাঃ) তা স্বীকার করেন এবং নবি(সাঃ) তা মঞ্জুর করে ফাতেমা (রাঃ)-র সাথে আলি(রাঃ) বিবাহ দেন। এই বিয়ের মোহরানা হিসেবে বদর যুদ্ধে প্রাপ্ত বর্মটি ধার্য করা হয়। ভিন্ন বর্ণনায় রয়েছেন, এই বর্মটি ওসমান(রাঃ)-এর কাছে ৪৮০ দিরহামে বিক্রি করে প্রাপ্ত সম্পত্তি নিয়ে আলী(রাঃ) রাসূল (সাঃ)-র এর কাছে হাজির হন। রাসুল(সাঃ) বলেন, এর মধ্যে থেকে সুগন্ধি ও পোশাক ক্রয় করে নাও । তিনি তার প্রাণপ্রিয় কন্যার বিয়েতে

উপহার হিসেবে একটি লেপ, একটি বালিশ, দুটি চাককি অর্থাৎ যাতা, একটি মশক এবং দুটি মাটির কলসি উপহার দেন।

গাযওয়া বনু কাইনুকা বা কাইনুকা অভিযান

আবু আউন থেকে ইবনে হিশাম বর্ণনা করেছেন, এক মুসলিম মহিলা বনু কাইনুকা বাজারে দুধ বিক্রি করতেন এবং বিশেষ প্রয়োজনে এক ইহুদি স্বর্ণকারের দোকানে বসেন। কয়েকজন ইহুদী তাকে নিকাব খুলতে বলেন। স্বর্ণকার সুযোগ বুঝে তার কাপড়ে গিট লাগিয়ে দেয়। উনি উঠতে গেলে তার কাপড় খুলে বিবস্ত্র হয়ে যান। এই অবস্থা দেখে ইহুদিরা খুশিতে হাততালি দিতে থাকেন। এই দৃশ্য দেখে এক মুসলিম ইহুদিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ইহুদীরা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে হত্যা করে । তার পরিবার রাসুল (সাঃ)-এর কাছে বিচার দেয়। রাসুল (সাঃ)-এর ধৈর্যের সীমা অতিক্রম করে। তিনি পরিপূর্ণ যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়। হামজা ইবনে আব্দুল মুত্তালিবকে যুদ্ধের সেনাপ্রধান নিযুক্ত করেন এবং এবং আবু লুবাকে মদিনার আমিরের দায়িত্ব দেন। দ্রুতগতিতে বনু।কাইনুকার দুর্গের দিকে পৌঁছান। দুর্গের সমস্ত প্রবেশপথ বন্ধ করে দেন। দিনটি ছিল হিজরী দ্বিতীয় সালের শাওয়ালের ১৫ তারিখ। ১৫ দিন পর্যন্ত অর্থাৎ জিলকদমাসের চাঁদ ওঠা পর্যন্ত অবরুদ্ধ রাখেন। অবশেষে ভয় পেয়ে তারা আত্মসমর্পণ করেন এবং রাসূল (সা)-এর সব কথা মেনে নেয়ার অঙ্গীকার করেন। আবু উবাই -এর অনুরোধে নবী(সাঃ) তাদের হত্যা করেন না, তবে তাদের মদিনা ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেন। নির্বাসন প্রক্রিয়ার তত্ত্বাবধানে ছিলেন উবাদা বিন সামিত। তাদেরকে সিরিয়ার আজরায়াত নামক স্থান পর্যন্ত রেখে আসেন।

গাজওয়ায় কুদর

নবী (সাঃ)- এর কাছে খবর আসে বনু গাফতানের শাখা বনু সুলাইম মদিনা আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তখন নবী (সাঃ) তাদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্য ২০০ উট এবং সৈন্য নিয়ে তাদের বাসভূমিতে যান। উদর নামক স্থানে পৌঁছানোর পর বনু সুলাইম পালিয়ে যায় এবং তাদের ৫০০ উট ও একজন গোলাম রেখে যায়।

গাজওয়ায়ে সাওয়ীক

আবু সুফিয়ান বদর যুদ্ধে পরাজয়ের পর মুসলমানদের সাথে লড়াই করার সুযোগ খুঁজতে থাকে। তার মনের ভিতর প্রতিশোধের আগুন জ্বলতে থাকে। সে প্রায় ২০০ অশ্বরোহী নিয়ে মদিনা আক্রমণের জন্য রওনা হয় । সাইব নামক স্থানে তাবু স্থাপন করে। ভোরবেলা সরাসরি মদিনা আক্রমণের সাহস না পেয়ে আশেপাশের এলাকায় ডাকাতি ও লুণ্ঠন শুরু করে। রাসূল (সাঃ)-এ খবর পেয়ে আবু লুববাবা ইবনে আব্দুল মুনজির (রাঃ)- এর নিকট মদিনার দায়িত্ব দিয়ে সাহাবীদের একটি দল নিয়ে তাদের পেছনে ধাওয়া করে। আবু সুফিয়ান সেখান থেকে পালিয়ে যায় এবং পালানোর সুবিধার্থে অনেক সাওয়ীক বা ছাতু ফেলে যায়। এভাবে এই যুদ্ধের নাম হয় সাওয়ীক বা ছাতুর যুদ্ধ।

গাফতান যুদ্ধ

তৃতীয় হিজরীতে ৪৫০ জন লোক নিয়ে দাসুর বিন হারিস মদিনায় আক্রমণ করতে আসে। নবী (সাঃ) তার মোকাবিলায় বের হলে তারা পালিয়ে পাহাড়ে আশ্রয় নেয়। নবী (সাঃ) নিশ্চিন্ত হয়ে ময়দান থেকে ফিরে আসেন এ সময় হঠাৎ বৃষ্টি আরম্ভ হয়। এতে তার পোশাক ভিজে

যায়। তিনি তা শুকানোর জন্য একটি গাছে ঝুলিয়ে দেন এবং ওই গাছের ছায়ায় শায়িত হন। ওদিকে তারা পাহাড়ের উপর থেকে এ দৃশ্য দেখতে পায় সে নবী (সাঃ)-কে ঘুমাতে দেখে খাপমুক্ত তরবারি নিয়ে তার কাছে চলে এসে বলল, "মুহাম্মদ, এখন আপনাকে কে আমার হাত থেকে রক্ষা করবে?"আল্লাহর রাসূল সামান্য বিচলিত না হয়ে উত্তর দিলেন," আল্লাহই আমাকে রক্ষা করবেন।" একথা শোনা মাত্র দাসুরের দেহে কম্পন তৈরি হলো এবং তার হাত থেকে তরবারি পড়ে গেল। তখন নবী (সাঃ) তরবারি উঠিয়ে বললেন," এবার বল, এখন তোমাকে কে রক্ষা করবে?"তার কাছে এটা ছাড়া আর কোন উত্তর ছিল না যে ,"কেউ না।" নবী (সাঃ) দয়াবশত তাকে ক্ষমা করে দেন। এ ঘটনায় দাসুর এতটাই প্রভাবিত হয় যে, সে নিজেও মুসলমান হয় এবং তার গোত্রে ফিরে গিয়ে বড় একজন ইসলাম প্রচারক হয়ে যায়।

হাফসা (রাঃ) ও যায়নাব (রাঃ)-এর সঙ্গে বিবাহ

তৃতীয় হিজরির শাবান মাসে হাফসা(রা)- এর সঙ্গে এবং রমজান মাসে যায়নাব বিনতে খুযাইমা (রাঃ)র সঙ্গে নবী (সাঃ)-এরশুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়।

সারিয়াতু যায়েদ ইবনে হারিসা

এটা ছিল উহুদ যুদ্ধের আগে তৃতীয় হিজরীতে কুরাইশরা তখন বদর যুদ্ধের পর খুব বেশি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিল। গ্রীষ্মকাল চলে আসে এবং শাম এ তাদের বাণিজ্যের সময় চলে আসে। সেই কাফেলাতে আমির ছিল সাফওয়ান ইবনু উমাইয়া। আসওয়াদ ইবনু আবদুল মুত্তালিবের পরামর্শ মত ইরাকের রাস্তায় সফর করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু এই যাত্রার খবর মদিনায় চলে যায়। রাসুল(সাঃ) আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন ।প্রায় ১০০ অশ্বারোহীর একটি বাহিনী তৈরি হয়, যার নেতৃত্বে ছিলেন যায়েদ ইবনে হারিস। যায়েদ অত্যন্ত দ্রুতগতিতে পথ অতিক্রম করে এবং কুরাইশরা একেবারেই অসতর্ক অবস্থায় কারদা নামক স্থানে অবতরণ করলে মুসলিম বাহিনী অতর্কিত হামলা করে কাফেলা দখল করে নেয় ফুরাত ইবনু হাইয়ান ও দুজনকে বন্দী করেন। পরবর্তীতে ফুরাত ইবনে হাইয়ান রাসুল(সাঃ)-এর কাছে ইসলাম গ্রহণ করেন।

উহুদ যুদ্ধ

মদিনার কাছাকাছি একটি পাহাড়ের নাম উহুদ। উহুদের যুদ্ধ যেখানে সংঘটিত হয়, সেখানে হারুন(আঃ)-র এর কবর রয়েছে। এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে সর্বসম্মতি ক্রমে তৃতীয় হিজরির শাওয়াল মাসে। তবে তারিখের ব্যাপারে কয়েকটি মত রয়েছে ৭,৮,৯, ১০, ১১। বদরের যুদ্ধের পর মুশরিকরা পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে মদিনা আক্রমণের পরিকল্পনা করে। তারা ৩০০০ সৈনিকের বিরাট বাহিনী নিয়ে মদিনার উদ্দেশ্যে রওনা হয়। বাহিনীতে ৭০০ বর্ম,২০০ ঘোড়া ও ৩০০০ উট ছিল। তারা ১৪ জন মহিলাকে সঙ্গে নেয়, যারা পুরুষদের আত্মমর্যাদা জাগিয়ে তুলবে এবং তারা যখন পালাতে থাকবে তাদেরকে অভিসম্পাত করবে। নবী (সাঃ) -এর চাচা আব্বাস (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করলেও তিনি তখনো মক্কায় যাননি। তিনি তৎক্ষণাৎ দ্রুতগতিতে রাসূল (সাঃ)- এর কাছে খবর পাঠান। তখন কুরাইশরা মদিনার একদম কাছাকাছি চলে আসে। শহরে আক্রমণের আশঙ্কা থাকায় চারদিকে পাহারা বসানো হয়। সকালে নবীজি (সাঃ) সাহাবীদের সঙ্গে পরামর্শ করে ১০০০ সৈন্য নিয়ে মদিনার বাইরে বের হন। বাহিনীতে মুনাফিক আব্দুল্লাহ বিন উবাই এবং তার ৩০০ সহচরও ছিল। মাঝপথ থেকে তারা ফিরে আসে, ফলে মুসলিম বাহিনীতে অবশিষ্ট থাকে ৭০০ সৈন্য।

মুসলিম বাহিনীর যুদ্ধযাত্রা ও প্রস্তুতি

রাসূল সা তার সেনাবাহিনীকে তিন ভাগে ভাগ করেন-

১. মুহাজির বাহিনীর পতাকা দেওয়া হয় মুসআব বিন উমায়েরকে।

২. কবিলায়ে আউসের আনসার বাহিনীর পতাকা দেওয়া হয় উসাইদ বিন হুযাইর এর হাতে।

৩. কবিলায়ে খাযরাজের আনসার বাহিনীর পতাকা দেওয়া হয় হুবাব ইবনে মুনযির এর হাতে।

মুসলিমদের সেনাবাহিনীতে সৈন্য সংখ্যা ছিল ১০০০। তাদের মাঝে ১০০ জন ছিলেন বর্ম পরিহিত এবং 50 জন ছিলেন ঘোড়সওয়ার। অবশ্য মুসা ইবনে উকবা জোর দিয়ে বলেছেন, উহুদের যুদ্ধে মুসলিমগণের সাথে কোন ঘোড়াই ছিল না। ওয়াকেদি বলেছেন, শুধুমাত্র দুটি ঘোড়া ছিল, একটি রাসুল (সাঃ)- এর কাছে আরেকটি আবু বুরুদা(রাঃ)-এর কাছে। মদিনায় সালাত পড়ানোর ইমাম হিসেবে নিযুক্ত করা হয় আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুমকে। সাদ বিন মুয়াজ এবং সাদ বিন উবাদা)রাঃ) বর্ম পড়ে রাসুলের আগে আগে চলছিলেন। সানিয়াতুল বিদা থেকে এগিয়ে গিয়ে তারা একটি বাহিনী দেখতে পান, যারা অত্যান্ত উত্তম অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সেখানে অবস্থান করছিল। তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হলে তারা বলে তারা খাযরাজের মিত্র ইহুদি। তারা মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে চায়। কিন্তু নবী (সাঃ) যুদ্ধে কোন কাফিরদের সহায়তা নিতে চান না।

রাসুল (সাঃ) চেয়েছিলেন উহুদ পাহাড়কে পিছনে রেখে, মদিনাকে সামনে রেখে শত্রু বাহিনীর বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে। তাই শত্রুবাহিনীকে এড়িয়ে ভিন্ন পথে উহুদ পাহাড়ের সামনে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। ওয়াকেদি বর্ণনা করেছেন, রাসূল (সাঃ) রাতের প্রথম অংশে ঘুমিয়ে মধ্যরাতে জেগে উঠলেন এবং এরপর উপযুক্ত রাস্তা খুঁজতে তিনি পথপ্রদর্শকের সাথে পরামর্শ করলেন। তিনি জানতে চাইলেন মুসলিম বাহিনীকে গোপন পথে নিয়ে যেতে পারবে এমন কে আছে? আবু খাইসামা বললেন," আল্লাহর রাসূল, আমি পারবো।" এরপর তিনি রিবয়ী ইবনে কাইযী নামক এক মুনাফিকের বাগানের ভেতর দিয়ে মুসলিম সেনাবাহিনীকে নিয়ে যান। রাসূল (সাঃ) ও মুসলিম সেনাবাহিনীর আগমনের খবর পেয়ে সে মুনাফেক ব্যক্তি তাদের মুখে বালু নিক্ষেপ করতে থাকে এবং বলে," যদি তুমি রাসূল (সাঃ) হও তাহলে আমার বাগানে প্রবেশ করা তোমার জন্য বৈধ নয়। ভিন্ন বর্ণনায় রয়েছে সে নিজের হাতে এক মুষ্টি মাটি নিয়ে বলল ,"হে মুহাম্মদ, যদি আমি পারতাম তাহলে এই মাটি তোমার মুখে নিক্ষেপ করতাম।"এ কথা শুনে সাহাবীরা তাকে হত্যা করতে চাইলে রাসূল (সাঃ) নিষেধ করলেন এবং বললেন, তোমরা তাকে হত্যা করো না কারণ তার দৃষ্টিশক্তি ও অন্তর্দৃষ্টি কোনটাই নেই।

কিশোরদের আগ্রহ

মদিনা থেকে বের হয়ে সৈন্যদের যাচাই-বাছাইয়ের সময় কম বয়সী ছেলেদের ফেরত পাঠানো হয়। কিন্তু কিশোরদের মধ্যে জিহাদের জজবা এত বেশি ছিল যে, রাফে বিন খাদিজকে যখন বলা হয়, তোমার বয়স কম ,তুমি ফিরে যাও । তখন তিনি পায়ের গোড়ালিতে ভর দিয়ে দাঁড়ান, যাতে তাকে লম্বা মনে হয়। ফলে তাকে বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয় ।সমবয়সী সামুরা বিন জুন্দুব তাকে বাহিনীতে নিতে দেখে বললেন, আমি তো রাফের সাথে লড়াইতে তাকে আছাড় দিতে পারি। তাকে নেওয়া হলে আমাকেও নেওয়া উচিত। তার কথা মত দুজনকে মোকাবেলার সুযোগ দেওয়া হয়। সামুরা রাফিকে ভূপতিত করেন। ফলে তাকেও যুদ্ধে নেওয়া

হয়।

আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এবং তার সঙ্গীদের পলায়ন:-

রাসূল (সাঃ) ও সাহাবীরা মদিনার মধ্যস্থলে যখন পৌঁছান তখন মাগরিবের সময় হয়ে গেছে। রাসূল সেখানেই শিবির স্থাপন করে রাত্রিযাপনের সিদ্ধান্ত নেন। ৫০ জন সাহাবীকে মুসলিম শিবিরে নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত করা হয়। তাদের নেতা ছিলেন মুহাম্মদ বিন মাসলামা। যাকওয়ান ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু কায়ুস নির্দিষ্ট ভাবে রাসুলের পাশে থেকে রাসূলকে পাহারা দিচ্ছিলেন। সুবহে সাদিক হওয়ার পূর্বে রাসুল(সাঃ) পথ চলতে শুরু করেন এবং 'শাওত' নামক স্থানে পৌঁছে ফজরের সালাত আদায় করেন। এখানে পৌঁছে মুসলিম এবং মুশরিক সেনাবাহিনী একে অপরকে দেখতে পাচ্ছিল। এখানেই মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। সে তার ৩০০ সৈন্য নিয়ে বলতে শুরু করে, অযথা কেন জীবন দিতে যাব! সে যুক্তি উপস্থাপন করে যে, রাসূল (সাঃ) তার কথা মেনে মদিনার ভেতরে যুদ্ধ না করে অন্যদের কথা মেনে মদিনা থেকে বের হয়েছেন। তাই রাসূলের সাথে সে যুদ্ধ করতে বাধ্য নয়। এই কথা বলে সে ৩০০ জন সৈন্য নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে মদিনায় ফিরে আসে। তার উদ্দেশ্য ছিল নিজে প্রাণভয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বিরত থাকা এবং মুসলিম সেনাবাহিনীর মাঝে সন্দেহ এবং ভীতি সৃষ্টি করে দেওয়া। তার এই পরিকল্পনা অনেকটা সফল হতে চলছিল। কেননা সে চলে আসার পর আউস গোত্রের বনু হারিসা এবং খাযরাজ গোত্রের বনু সালামা কিছু হটতে যাচ্ছিল এবং তারা ফিরে যাবার ব্যাপারে চিন্তা করছিল। কিন্তু আল্লাহ তাদের অন্তরের পরিবর্তন ঘটান এবং তারা ফিরে যাওয়ার সংকল্প ত্যাগ করে।

রণক্ষেত্র

রণক্ষেত্রে পৌঁছে নবী (সাঃ) সাহাবীদেরকে সারিবদ্ধ করেন। উহুদ পাহাড় পেছনে থাকায় এদিক থেকে আক্রমণের আশঙ্কা ছিল। নবী (সাঃ) ৫০ জনের একটি দলকে পাহাড়ে মোতায়েন করে নির্দেশ দেন, মুসলমানদের জয় পরাজয় যেটাই হোক না কেন, তারা যেন নিজ স্থান থেকে সরে না যান। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর তুমুল লড়াই চলতে থাকে। এক পর্যায়ে মুসলমানদের বিজয়ের লক্ষণ ফুটে ওঠে । কুরাইশরা বিক্ষিপ্ত হয়ে পালাতে থাকে। মুসলমানরা গনিমতের সম্পদ জমা করতে শুরু করে । এই পরিস্থিতি দেখে পেছনের পাহাড়ে মোতায়েনকৃত দলটি নিজেদের স্থান ছেড়ে ময়দানে চলে আসে। তাদের নেতা আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের তাদেরকে অনেক নিষেধ করেন। কিন্তু তারা মনে করেন, এখন আর সেখানে অবস্থানের প্রয়োজন নেই। এটা ভেবে তাদের অধিকাংশই পাহাড় থেকে নেমে আসেন। মাত্র ১১ জন সেখানে রয়ে যান। খালিদ বিন ওয়ালিদ(রাঃ) তখনও মুসলমান হননি। তিনি কাফেরদের পক্ষে যুদ্ধ করছিলেন। তিনি পেছনদিকের পাহাড় পর্যবেক্ষণ করছিলেন আর সুযোগ খুঁজছিলেন। মুসলমানদের সেখান থেকে সরে পড়তে দেখে তিনি আক্রমণ করেন। আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের ও তার অবশিষ্ট সঙ্গীরা বীরত্বের সাথে লড়াই করে শহীদ হয়ে যান। ফলে পথ বাধা মুক্ত হয়ে পড়ে এবং খালিদ তার বাহিনী নিয়ে মুসলমানদের ওপর পিছন থেকে আক্রমণ করেন। এতে উভয়পক্ষ এমন ভাবে মিশ্রিত হয়ে পড়ে যে, মুসলমানদের হাতেই মুসলমানরা আঘাতপ্রাপ্ত হতে থাকে। এ সময় মুসআব বিন উমাইর(রাঃ) শহীদ হন। তার চেহারা নবী (সাঃ) - এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল। এজন্য তার শাহাদাতের পর ভুল সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে যে, নবী(সাঃ) শহীদ হয়েছেন। কিছু বর্ণনায় আছে, কোন শয়তান বা কাফের

উচ্চ স্বরে চিৎকার করে বলেছিল," মুহাম্মদ নিহত হয়েছেন।"
এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই মুসলিম বাহিনীতে হতাশা ছেয়ে যায়। বড় বড় বীর সাহাবীর পা বসে যায়। তবে প্রাণ উৎসর্গকারী বেশ কিছু সাহাবী তখনও লড়ে যাচ্ছিলেন। সবার ব্যাকুল দৃষ্টি নবীজিকে খুঁজে ফিরছিল। সবার আগে কাব বিন মালেক (রাঃ) -এর দৃষ্টি পড়ে নবী (সাঃ)- এর দিকে। তিনি খুশিতে চিৎকার করে বলে ওঠেন, "মোবারক হোক? রাসূল (সাঃ) এখানে সম্পূর্ণ নিরাপদ আছেন। একথা শুনে সাহাবীরা সেদিকে ছুটে যান। কাফেররাও সেদিকে অগ্রসর হয়। তারা কয়েকবার আক্রমণ করে। তবে নবীজি নিরাপদ থাকেন। কাফেররা আক্রমণ করলে নবী(সাঃ) বলেন," আমার জন্য প্রাণোসর্গকারী কে আছে?", যিয়াদ বিন সাকান (রাঃ) চারজন সঙ্গিসহ এগিয়ে যান এবং সবাই বীরত্বের সাথে লড়াই করে শহীদ হন। যিয়াদ আহত হয়ে নিচে পড়ে গেলে নবীজি বলেন," তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো।" লোকেরা তাকে উঠিয়ে নিয়ে আসে। তখন পর্যন্ত তার শ্বাস-প্রশ্বাস চলছিল। তিনি নবীজির পায়ের উপর মুখ রাখেন। এই অবস্থায়ই তার মৃত্যু হয়।

নবীজির জখম

কুরাইশের বিখ্যাত বাহাদুর আব্দুল্লাহ বিন কামিয়া সাহাবীদের ব্যূহ ভেদ করে এগিয়ে যায় এবং নবীজির চেহারায় তরবারির আঘাত হানে। এর ফলে লোহার দুটি কড়া নবীজির চেহারায় বিধে যায় এবং একটি দাঁত শহীদ হয়। আবু বকর(রাঃ) কড়া বের করতে এগিয়ে আসেন। তখন আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ বলেন,"আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে এই খেদমতের সুযোগ দিন।" এরপর তিনি নবীজির কাছে এসে হাতের বদলে নিজ দাঁত দিয়ে লোহার কড়া টেনে বের করেন। প্রথমবার একটি কড়া বের হয় ।এর সঙ্গে আবু উবায়দার একটি দাঁত পড়ে যায় । এটি দেখে আবু বকর(রাঃ) দ্বিতীয় কড়া বের করতে উদ্যত হন । আবু উবায়দা আগের মত আল্লাহর দোহাই দিয়ে তাকে নিবৃত করেন এবং নিজের মুখ দিয়ে অপর কড়া বের করেন। এতে তার আরেকটি দাঁত পড়ে যায়। এজন্য তাকে ডাকা হতো দাঁতভাঙ্গা উত্তম ব্যক্তি।
এ সময় নবী (সাঃ) একটি গর্তে পড়ে যান। কাফেররা মুসলমানদের জন্য গর্ত করে রেখেছিল। নবী(সাঃ)কে গর্তে পড়ে যেতে দেখে সাহাবীরা তাকে ঘেরাও করে রাখেন। চারদিক থেকে তীর ও তরবারির বৃষ্টি হচ্ছিল ।সাহাবীরা সেসবের আঘাত নিজেদের দিকে নিচ্ছিলেন। আবু দুজানা(রাঃ) ঢুকে নবীজির ঢাল হয়ে যান। এদিক থেকে যত তীর এসেছে সব তার পিঠে বিদ্ধ হয়েছে। তালহা (রাঃ) তীর ও তরবারির আঘাত প্রতিহত করেন হাত দিয়ে। ফলে তার হাত কেটে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। যুদ্ধ শেষে দেখা গেল তার দেহে ৭০টির বেশি আঘাত লেগেছে । আবু তালহা(রাঃ) একটি ঢাল দিয়ে নবীজিকে রক্ষা করছিলেন। নবীজি ঘাড় উঁচু করে ময়দানে তাকালে আবু তালহা বললেন, "আল্লাহর রাসূল, আপনি মাথা উঠাবেন না হতে পারে শত্রুর কোনো তীর আপনার দেহে বিদ্ধ হবে। আঘাত সহ্য করার জন্য আপনার আগে আমার বুক বিদ্যমান। এক সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন ,"হে আল্লাহর রাসূল, আমি নিহত হলে আমার ঠিকানা কোথায় হবে?" তিনি বললেন ,"জান্নাত।" ওই সাহাবীর হাতে কিছু খেজুর ছিল। একথা শুনে তিনি খেজুর নিক্ষেপ করে সোজা রণাঙ্গনে চলে গেলেন এবং লড়াই করে শাহাদাত বরণ করলেন। কুরাইশের হতভাগা লোকেরা নির্দয়ভাবে নবীজির উপর তীর নিক্ষেপ করছিল । নবীজির পবিত্র চেহারা থেকে রক্ত ঝরছিল । তিনি কাপড় দিয়ে রক্ত মুছতে থাকেন।

তিনি বলেন ,"এই রক্তের একটি ফোটাও মাটিতে পড়লে, সবার উপর আল্লাহর আজাব অবতীর্ণ হতো।" এই যুদ্ধে কাফেরদের ২২ বা ২২ নিহত হয় আর মুসলমানদের ৭০জন শহীদ হন।

শহীদদের লাশ ও দাফন

যুদ্ধের পর রাসূল (সাঃ) নিজে শহীদদের মৃতদেহ পরিদর্শন করে বলেন," আমি এই লোকদের ব্যাপারে সাক্ষী থাকব । প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে,যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে আহত হয়, আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিন এই অবস্থায় উঠাবেন যে তার ক্ষতস্থান দিয়ে শোণিতধারা বইতে থাকবে। এগুলোর রং তো রক্তের রঙের মতোই হবে কিন্তু তার ঘ্রাণ হবে মেশকের ঘ্রাণের মত।"বেশ কয়েকজন সাহাবী তাদের শহিদ আত্মীয়-স্বজনদের মৃতদেহ নিয়ে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু রাসূল (সাঃ) তাদেরকে নির্দেশ দিলেন, মৃতদেহ মদিনায় না নিয়ে তাদের শাহাদাতের স্থানে দাফন করতে এবং শহীদদের দেহ থেকে অস্ত্র ও হাতিয়ার খুলে নিতে এবং গোসল ছাড়াই তাদের পরনের কাপড়ে তাদের দাফন করতে। প্রতি দুজনকে এক কাপড়ে জড়াতে এবং দুজনকে একই কবরে দাফন করার নির্দেশ দিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ,এদের মধ্যে কুরআন কার বেশি মুখস্ত ছিল? যার কুরআন মুখস্থ থাকতো তাকে আগে কবরে রাখতেন।
আব্দুল্লাহ ইবনু হারাম(রাঃ) এবং আমর বিন জামুহ(রাঃ)-কে একই কবরে দাফন করা হয়, কেননা তাদের দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল। হামজা(রাঃ)-র মৃতদেহ মুশরিকরা অত্যান্ত খারাপ ভাবে বিকৃত করে তার বোন সাফিয়া তার মৃতদেহ দেখতে চাইলে রাসূল (সাঃ) জুবায়ের কে বললেন, তিনি যেন তার মাকে ফিরিয়ে নিয়ে যান। কারণ এই দৃশ্য তার মা সহ্য করতে পারবেনা। একথা শুনে সাফিয়া ধৈর্য ধারণ করার সংকল্প করলেন এবং বললেন, আমি জানতে পেরেছি আমার ভাইয়ের নাক কান কেটে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমার ভাই আল্লাহর পথে রয়েছে, সুতরাং তার ওপর যা কিছু করা হয়েছে , তাতে আমি পূর্ণভাবে সন্তুষ্ট আছি আমি ইনশাআল্লাহ ধৈর্য ধারণ করব। এরপর তিনি হামজা(রাঃ) -কে দেখেন, তার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করেন । রাসূল(সাঃ)-এর নির্দেশে হামজা(রাঃ) -কে আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ এর সঙ্গে দাফন করা হয়। তিনি ছিলেন হামজা(রাঃ)-এর ভাগিনা এবং দুধ ভাই । খাব্বাব ইবনুল আরাত বর্ণনা করেছেন, হামজা(-রাঃ)র জন্য কালো প্রান্ত বিশিষ্ট একটি চাদর ছাড়া আর কোন কাফনের কাপড় পাওয়া যায়নি। ওই চাদর দিয়ে মাথা ঢাকা হলে পা খোলা থাকতো, এবং পা ঢাকলে মাথা খোলা থাকতো অবশেষে মাথা ঢেকে দেওয়া হল এবং পায়ের উপর 'ইযখির' (এক প্রকার ঘাস) চাপিয়ে দেওয়া হল ।একই অবস্থা হয়েছিল মুসআব বিন উমাইর-এর । তার জন্য একটিমাত্র চাদর পাওয়া গিয়েছিল যা দিয়ে পুরো শরীর ঢাকা যাচ্ছিল না। এই অবস্থায় রাসূল নির্দেশ দিলেন, তার মাথা চাদর দিয়ে ঢেকে দিতে এবং পায়ের উপর ইযখির বিছিয়ে দিতে। হানজালার মৃতদেহ অদৃশ্য ছিল। সাহাবীরা খুঁজতে খুঁজতে এক জায়গায় দেখলেন তার মৃতদেহ জমিন থেকে উপরে রয়েছে এবং সেখান থেকে টপটপ করে পানি পড়ছে। এ দৃশ্য দেখে তারা রাসূল (সাঃ)-কে জানালেন । তখন রাসূল(সাঃ) তাদেরকে বললেন ,"ফেরেশতারা তাকে গোসল করিয়ে দিচ্ছেন।"এখান থেকেই তার নাম হয়ে যায় 'গসীলুল মালাইকা' অর্থাৎ ফেরেশতাগণ কর্তৃক গোসলকৃত।

গাজওয়ায়ে হামরাউল আসাদ

মুসলিম বাহিনী মদিনায় ফিরে আসার পর রাসূল(সাঃ) জানতে পারলেন, আবু সুফিয়ান এবং

কাফির বাহিনী ফিরে যাওয়ার পথে রওহা নামক স্থানে পৌঁছানোর পর সে তার বাহিনীকে বলছিল, তোমরা কিছুই করতে পারলে না, তোমরা মুহাম্মদকে হত্যা করতে পারলে না, তাদের যুবতী নারীদের দাসী বানাতে পারলে না। এসব কথা নবীজির কানে পৌঁছালে তিনি উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের নিয়ে হামরাউল আসাদ অভিযানে বের হন। এখানে পৌঁছে তিনি কাফের বাহিনীর মুখোমুখি হওয়ার জন্য তিন দিন পর্যন্ত অবস্থান করেন। কাফিররা মুসলমানদের মুখোমুখি হওয়ার সাহস করে না। রাসুল (সাঃ) সাহাবীদেরকে রাতের বেলা অধিক পরিমাণে আগুন জ্বালানোর আদেশ দিয়েছিলেন। প্রতি রাতে একসাথে প্রায় ৫০০ আগুন জ্বলতো। নিজেদের পলায়নপরতা গোপন রাখার উদ্দেশ্যে এবং মুসলিমদের ভয় দেখানোর জন্য আবু সুফিয়ান একটি নতুন বুদ্ধি করল। কবীলায়ে আব্দুল কায়েসের একটি মদিনাগামী একটি কাফেলার সাথে দেখা হলে আবু সুফিয়ান তাদেরকে বলল," তোমরা মুহাম্মদকে গিয়ে বলবে, আমরা তার ও তার দলের ওপর হামলা চালিয়ে তার অবশিষ্ট অংশকে নির্মূল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।"আর এই কথা পৌঁছে দিতে পারলে উকায বাজারে গিয়ে তাদেরকে প্রচুর পরিমাণে কিশমিশ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি করল। এই কাফেলা মুসলিম বাহিনীর পাশ দিয়ে অতিক্রমের সময় আবু সুফিয়ানের বার্তা পৌঁছে দিল। তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন -

যাদেরকে লোকেরা বলেছে যে, তোমাদের সাথে মোকাবিলা করার জন্য লোকেরা সমাবেশ করেছে বহু সাজ - সরঞ্জাম নিয়ে, তাদের ভয় করো। তখন তাদের বিশ্বাস আরো দৃঢ়তর হয়ে যায় এবং তারা বলেন আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট । কতই না চমৎকার কামিয়াবিদানকারী । অতঃপর ফিরে এলো মুসলমানরা আল্লাহর অনুগ্রহ নিয়ে, তাদের কিছুই অনিষ্ট হল না। তারপর তারা আল্লাহর ইচ্ছার অনুগত হল। বস্তুত আল্লাহর অনুগ্রহ অতি বিরাট। (সূরা আলে ইমরান, ৩:১৭৩- ১৭৪)

নবি(সাঃ) তার সেনাবাহিনী নিয়ে সেখানে অবস্থান করতে লাগলেন । কিন্তু যখন কাফেরদের আসার আর কোন সম্ভাবনা রইল না, তখন তিনি নিরাপদে মদিনার পথে ফিরে গেলেন।

আর রাজীর মর্মান্তিক ঘটনা

চতুর্থ হিজরির সফর মাসে আযাল এবং কারাহ গোত্রের কয়েকজন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ(সাঃ)-র কাছে এসে জানালেন যে, তাদের মাঝে ইসলামের কিছু কিছু চর্চা রয়েছে। তারা পরিপূর্ণভাবে দীন শিক্ষার জন্য কয়েকজন সাহাবীকে চাইলেন। মহানবী (সাঃ) ৬ জন মতান্তরে ১০ জন সাহাবীকে তাদের সাথে প্রেরণ করেন । রাবেগ এবং জেদ্দার মধ্যবর্তী স্থানে যখন তারা পৌঁছায় তখন তাদের ওপর বনু হুজাইলের একটি শাখা গোত্র বনু লাহইয়ান সাহাবীদের উপর আক্রমণ করে। আজাল এবং কারাহ গোত্রের লেলিয়ে দেয়ার ফলে প্রায় ১০০ জন তীরন্দাজ তাদের আক্রমণ করে। সাহাবীরা পাহাড়ের চূড়ায় আশ্রয় নেন। তারা তাদেরকে ঘিরে ফেলে এবং প্রতিশ্রুতি দেয় যে, তারা নেমে আসলে তাদেরকে রক্ষা করা হবে। আসীম(রাঃ) তাদের প্রস্তাবে রাজি না হয়ে তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। একের পর এক তীর বর্ষণের কারণে ৭ জন সাহাবী সেখানেই শহীদ হলেন বনু লাহইয়ান আরো একবার প্রতিশ্রুতি দেয়, ফলে বাকি ৩ জন নেমে আসে। সাহাবীরা নেমে আসার সাথে সাথে তাদেরকে বেঁধে ফেলা হয়। এদের মধ্যে তৃতীয় সাহাবী তাদের সাথে যেতে অস্বীকার করলে তাকে হত্যা করা হয়। জায়েদ বিন দাসিন্নাহ (রাঃ) এবং খুবাইব (রাঃ) - কে নিয়ে মক্কায় বিক্রি করে দেয়। খুবাইবকে হত্যা করার

জন্য মক্কা থেকে হারাম শরীফের বাইরে তানঈম নামক স্থানে নিয়ে যায়। তাকে শূলে চড়ানোর পূর্ব মুহূর্তে তিনি দুই রাকাত সালাত পড়ার জন্য অনুমতি চাইলেন। তাকে অনুমতি দেয়া হলো। সালাম ফিরানোর পর তিনি বলেন যদি তোমাদের এই বলার ভয় না থাকতো যে, আমি যা কিছু করছি তা ভয় পাওয়ার কারণে করছি তাহলে আরো দীর্ঘ সময় আমি সালাত আদায় করতাম। তিনি আরো বলেন, হে আল্লাহ তাদেরকে এক এক করে গুনে নাও অতঃপর তাদেরকে বিক্ষিপ্তভাবে মৃত্যু দাও এবং কাউকে অবশিষ্ট রেখো না। বন্দি অবস্থায় তাকে আঙ্গুর ফল খেতে দেখা গিয়েছিল। অথচ সেই সময় মক্কায় খেজুরও পাওয়া যাচ্ছিল না।

বীরে মাউনার ঘটনা

রাজীর মর্মান্তিক হত্যাকান্ড যে মাসে ঘটে সে মাসে আরো একটি ঘটনা ঘটে। আবু বারা আমের বিন মালিক নামে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) -এর সাথে দেখা করতে আসলেন রাসূল (সাঃ) তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলে তিনি ইসলাম গ্রহণও করলেন না আবার পরিত্যাগও করলেন না। তিনি নবী(সাঃ)- কে অনুরোধ করলেন নযদবাসীদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্য কিছু সাহাবীকে প্রেরণ করতে। তিনি নবী (সাঃ)-কে কথা দেন সাহাবীদের আশ্রয় দিবেন । এরপর রাসুল(সাঃ) ৪০ জন মতান্তরে ৭০ জন সাহাবীকে আবু বারার সাথে পাঠালেন। এ দলের নেতা নিযুক্ত করা হয় মুনযির বিন আমিরকে। সাহাবীরা দিনের বেলা জঙ্গল থেকে জ্বালানি সংগ্রহ করতেন এবং রাতের বেলা কুরআন পড়তেন, শিক্ষা দিতেন এবং আল্লাহর ইবাদতে ব্যস্ত থাকতেন। এভাবে ভিড়ে মাওনা তে পৌঁছান এবং তারা সেখানে তাঁবু খাটান হারাম মিলহান (রাঃ) -কে সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহের পত্র নিয়ে আমির বিন তুফাইলের কাছে পাঠান। তিনি সেই চিঠি ছুঁয়েও দেখলেন না বরং হারাম(রাঃ)-কে হত্যা করেন। এরপর আমের অবশিষ্ট সাহাবীদেরকে হত্যা করার জন্য তার গোত্রকে আহ্বান জানান। কিন্তু তারা রাজি না হলে বনু সুলাইম গোত্রকে সে আহ্বান জানায়। বন্ধু সুলাইম এবং যাকাওয়ান তার আহবানে সারা দিয়ে সাহাবীদেরকে সেখানেই শহীদ করে ফেলে। কেবলমাত্র জীবিত ছিলেন কা'ব ইবনে যায়েদ ইবনে নাজ্জার(রাঃ) । তাকে শহীদানের মধ্য থেকে উঠিয়ে নিয়ে আসা হয়। খন্দকের যুদ্ধ পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন।

ঘটনাস্থলের আশপাশে আরো দুজন সাহাবী আমর বিন উমাইয়া যমরী (রাঃ)এবং মুনযির ইবনে উকবা ইবনে আমের (রাঃ) উট চড়াচ্ছিলেন। তারা ঘটনাস্থলে পাখি ওড়াওরি করতে দেখে সেখানে গিয়ে পৌঁছেন এবং অন্যদের সাথে যুদ্ধ করতে শুরু করেন। মুনজির(রাঃ) শহীদ হয়ে যান আর আমর ইবনে উমাইয়া(রাঃ) বন্দী হন।

যায়নাব বিনতে হুজাইমা ও উম্মু সালামার সাথে বিবাহ

হিজরতের প্রায় ৩১ মাস পর তৃতীয় হিজরির রমজান মাসে রাসূল (সাঃ) যয়নাব (রাঃ)-র সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়। তার স্বামী আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ উহুদ যুদ্ধে শহীদ হন। আবু সালামা বনু আসাদের বিপক্ষে অভিযানে যান। এই অভিযান সংঘটিত হয়েছিল চতুর্থ হিজরীর মহররম মাসে। অভিযান থেকে ফিরে আসার পর আবু সালামা ইন্তেকাল করেন। ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পর নবী (সাঃ) উম্মে সালামাকে বিয়ে করেন।

বদর দ্বিতীয় যুদ্ধ

বদরের যুদ্ধ হয়েছিল হিজরী দ্বিতীয় বর্ষে, আর ওহুদের যুদ্ধ তৃতীয় বর্ষে। এর রেশ ধরে হিজরী

চতুর্থ বছরের কাফেরদের নেতা আবু সুফিয়ান মুসলিমদের তৃতীয়বারের মতো চ্যালেঞ্জ করে সে ২০০০ সৈন্যের শক্তিশালী একটি দল নিয়ে মক্কা ত্যাগ করে। কিন্তু কিছু পথ যাওয়ার পর সে মন পরিবর্তন করে। সবার উদ্দেশ্যে বলে," আমার মতে সচ্ছলতার বছর ছাড়া যুদ্ধে অংশ নেওয়া সমীচীন হবে না। বরং যে বছর তৃপ্তির সাথে পশুদের ভালো ঘাস পাতা খাওয়াতে পারবে এবং নিজেরা ইচ্ছেমতো দুধ পান করতে পারবে, সে বছরই যুদ্ধ করা ভালো হবে। এবার শুষ্ক মৌসুম। আমি ফিরে যাচ্ছি, তোমরাও ফিরে চলো। হতে পারে এ কথাগুলো আবু সুফিয়ানের অজুহাত মাত্র। মুসলিমদের সাথে যুদ্ধে কুরাইশরা এর আগেও খুব একটা সুবিধা করতে পারেনি। হয়তো ঝোঁকের বসে সে চ্যালেঞ্জ করে বসেছে কিন্তু পরে বুঝতে পেরেছে যে খুব একটা সুবিধা করা যাবে না। কিন্তু রাসূল (সাঃ)- এর দৃঢ়তায় কোন ফাটল ধরেনি। নির্ধারিত সময়ে নির্ধারিত জায়গায় ১৫০০ মুজাহিদ নিয়ে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) শিবির স্থাপন করলেন। সেখানে আট দিন অবস্থান করলেন। ওদিকে কুরাইশদের দেখা নেই সেখানে অবস্থানকালে তার সাথে দেখা হল বনু দামরা গোত্রের মুখশীর সাথে। ইতিপূর্বে এই গোত্রের সাথে মুসলিমদের শান্তি চুক্তি ছিল। মুখশী রাসূল(সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, "আপনারা কি কুরাইশদের সাথে যুদ্ধ করার জন্যই এখানে এসেছেন?" রাসূল (সাঃ) বললেন. হ্যাঁ। আমরা সেজন্যই এসেছি আর তোমরা যদি চাও তাহলে আমাদের সাথে যে চুক্তি ছিল তা প্রত্যাহার করতে পারো। সে ক্ষেত্রে আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব যতক্ষণ না আল্লাহ আমাদের ও তোমাদের মাঝে ফয়সালা করেন।" মুখশী জবাব দিল," না, এমন কিছু করার কোন প্রয়োজন দেখি না। রাসূল (সাঃ) এই কথাগুলো বলে মুখশীকে সূক্ষ্ম একটি ইঙ্গিত দিচ্ছেন; আমরা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করার ক্ষমতা রাখি। সেই শক্তি আমাদের ভালই আছে। চুক্তির সময়সীমা বাড়ানোর ব্যাপারে তোমাদের প্রয়োজন থাকতে পারে, কিন্তু আমাদের নেই।

খন্দকযুদ্ধ বা গাজওয়ায়ে আহযাব

রাসুল(সাঃ) যখন মদিনায় হিজরত করে, তখন সন্ধি করে নেন। মুসলমানরা সর্বদা চুক্তি রক্ষা করার ব্যাপারে সচেতন ছিল। নবী (সাঃ)-র মদিনায় আগমনের আগে ইহুদিরা মদিনাতে ক্ষমতাসীন ছিল । মদিনাতে নবী(সাঃ)-র এবং ইসলামের বৃদ্ধি পেতে দেখে তারা ভিতরে ভিতরে ভীষণ রকমের প্রতিহিংসা তৈরি করতে থাকে। বদর যুদ্ধে মুসলমানদের জয়ের পরে তাদের ক্রোধ বাড়তে থাকে । তারা প্রকাশ্যে চুক্তি ভঙ্গ করতে থাকে । বনু কাইনুকা যুদ্ধের পর বনু নাজির বিদ্রোহ করে। সমস্ত পরিস্থিতি বিবেচনা করে নবী(সাঃ) যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন। তাদেরকে কেল্লাতে আবদ্ধ রেখে পরবর্তীতে দেশান্তর করা হয়। এদিকে মক্কার কুরাইশরা ইহুদিদের এবং মুনাফিকদের উস্কানি দিতে থাকে। তাদের মধ্যে মিত্রতা গড়ে ওঠে। অবশেষে পঞ্চম হিজরির জিলকদ মাসে তারা নিজেদের পূর্ণ শক্তি একত্রিত করে মদিনায় আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয়। নবী(সাঃ)-র কাছে সংবাদ পৌঁছালে তিনি সাহাবীদের নিয়ে মাসোয়ারা করেন। সালমান ফারসি (রাঃ) পরামর্শ দেন, ময়দানে বের হয়ে যুদ্ধ না করে যেদিক থেকে তারা মদিনায় প্রবেশ করতে পারে, সেই জায়গাগুলোতে পরীক্ষা বা খন্দক খনন করা হোক।

প্রায় ৩০০০ সাহাবীকে নিয়ে নবী(সাঃ) পরীখা খনন আরম্ভ করেন। ছয় দিনে পাঁচ গজ গভীর পরীখা খনন করা হয় । পরীখা খননের সময় বিরাট একটি পাথর বের হয়। কেউ এটি ভাঙতে সক্ষম হয় না। নবি(সাঃ)এসে নিজ হাতে পাথরের উপর একটি আঘাত করেন আর সেটি

ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। এভাবেই পরীখা খননের কাজ সমাপ্ত হয়।
কিছুদিন পর কাফেররা মদিনা অবরোধ করে এবং প্রায় ১৫ দিন মুসলমানরা অবরুদ্ধ থাকেন। এই সময় বনু কুরায়যাও চুক্তি ভঙ্গ করে শত্রুদের সাথে মিত্রতা করে। অবরোধের কারণে মদিনা শহরে দুশ্চিন্তা ছড়িয়ে পড়ে। খাবারের স্বল্পতা দেখা দেয়। এমনকি আল্লাহর নবী খাবারের যন্ত্রণা সইতে না পেরে পেটে পাথর বেঁধে রাখে। শত্রু বাহিনী পরীখা পাড়ি দিতে না পেরে অনবরত তীর ও পাথর বর্ষণ করতে থাকে।

ঝড় ও রবের সাহায্য

অবশেষে আল্লাহ সুবহানাতায়ালা মুসলমানদের সাহায্য করেন। কাফের বাহিনীর স্থানে প্রচন্ড ঝড় শুরু হয় তাদের তাঁবুর খুঁটি উপড়ে পড়ে যায়। তারা ভীত- সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং দ্রুত ময়দান ত্যাগ করে পালিয়ে যায় ।এই বছরের কিছু ঘটনা:-

১. এ বছরে হজ ফরজ হয় । তারিখের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে

২. জুমাতুল উলা মাসে নবী(সাঃ)-র নাতি আব্দুল্লাহ বিন ওসমান মৃত্যুবরণ করেন ।

৩.শাওয়াল মাসের শেষের দিকে আয়েশা (রাঃ)-এর মা ইন্তেকাল করেন।

৪. জিলকদ মাসে যয়নাব বিনতে জাহাশ (রাঃ)-এর সাথে নবী (সাঃ)-এর বিবাহ সম্পন্ন হয়।

৫. মদিনায় ভূমিকম্প ও চন্দ্রগ্রহণ হয়।

বনু আল মুস্তালিক এর যুদ্ধ

এই সময় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অভিযান ছিল খুযাআ গোত্রের বিরুদ্ধে সংঘটিত বনু মুস্তাকের যুদ্ধ। তাদের সাথে কুরাইশদের মিত্রতা ছিল। মদিনা আক্রমণের নিশ্চিত খবর পেয়ে রাসূল(সাঃ) প্রায় ৭০০ মুজাহিদ নিয়ে তাদের উপর অতর্কিত আক্রমণ করে. যে জায়গাটিতে যুদ্ধ সংঘটিত হয় সেটার নাম আল মুরাইসী। তারা কোন প্রতিরোধই করতে পারে না। তাদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়, স্ত্রী ও সন্তানদের বন্দি করে নিয়ে আসা হয় । সাধারণত মুসলমানরা যখন শত্রুর উপর আক্রমণ করে, তখন ইসলাম গ্রহণের জন্য তিন দিন সময় দেয়া হয়ে থাকে। তাদেরকে বলা হয় মুসলিম হও, না হলে জিযিয়া দাও । আর যদি কোন প্রস্তাবে রাজি না হও, তাহলে যুদ্ধ কর । কিন্তু বনু মুস্তালিবকে কোন সময় দেয়া হয় না কারণ তাদেরকে আগেই ইসলামের দাওয়াত দেওয়া হয়েছি এবং তারা স্বইচ্ছায় কুরাইশদের মিত্র হিসেবে বেছে নেয়।

রাসুল (সা)- এর সাথে জুয়াইরিয়ার বিয়ে

জুয়াইরিয়া ছিলেন বনু মুস্তালিকের গোত্র নেতা আল হারিসের মেয়ে । তার সাথে রাসুল (সাঃ)-র বিয়ে নিয়ে প্রবল ঈর্ষা আর দুশ্চিন্তায় ভুগছিলেন মা আয়েশা(রঃ) । মজার এই ঘটনাটি তার মুখেই শোনা যাক। যখন আল্লাহর রাসূল বনু মুস্তালিকের বন্দী নারী ও শিশুদের বন্টন করে দিলেন তখন জুয়াইরিয়া পড়লেন সাবিত ইবনে কাইসের ভাগে। তিনি সাবিতের সাথে মাকাতুবা(দাসমুক্তির চুক্তি) করলেন। জুয়াইরিয়া দেখতে ছিলেন খুবই মিষ্টি, আর অসম্ভব সুন্দরী। এতটাই সুন্দরী যে, যেই তাকে দেখবে , সেই তার প্রেমে পড়ে যাবে। তিনি রাসুল (সাঃ)- এর কাছে এসে দাসমুক্তির অর্থ পরিশোধের সাহায্য চাইলেন। আল্লাহর কসম! আমি যখন তাকে আমার দরজায় দেখলাম, প্রচন্ড ঈর্ষা র কারণে তাকে আমার একটুও ভালো লাগেনি । আমি জানতাম যে রূপ আমি তার মধ্যে দেখেছি , তা আল্লাহর রাসূলের চোখ এড়াবে না। জুয়াইরিয়া আসলেন সরাসরি রাসূল (সাঃ)- কে বললেন ,"হে আল্লাহর

রাসূল, আমি আল হারিসের মেয়ে জুয়াইরিয়া। আমার বাবা গোত্রের নেতা। আর আমি এখন হয়েছি সাবিতের দাসী। আমার কেমন লাগছে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। আমি নিজেকে মুক্ত করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছি। আপনি আমাকে মুক্তির অর্থ পরিশোধে সাহায্য করুন। আল্লাহর রাসূল বললেন,

আচ্ছা তোমাকে যদি এর থেকেও ভালো কিছু দেওয়া হয়?

তিনি জানতে চান , সেটি কি ?

আমি তোমার মুক্তিপণ পরিশোধ করবো আর তোমাকে বিয়ে করে নেব।

হে আল্লাহর রাসূল ,আমি অবশ্যই তা কবুল করব।

রাসুলুল্লাহ জুয়াইরিয়াকে বিয়ে করে নিলেন। সবাই তখন বলতে লাগলো, আরে! এরা তো রাসূল(সাঃ)-র শ্বশুরবাড়ির লোকজন এদেরকে আমরা কি করে দাস বানিয়ে রাখি! তাই তারা তাদের ভাগের সকল বন্দিকে মুক্ত করে দিল। জুয়াইরিয়ার মত আর কেউ নিজ গোত্রের জন্য এত বরকত বয়ে এনেছে বলে আমাদের জানা নেই । এই এক নারীর কারণে বনু মুস্তালিকের ১০০ পরিবার আজাদ হয়ে যায়। এই ঘটনার পর বনু মুস্তালিক গোত্র ইসলাম গ্রহণ করে।

খালিদ বিন ওয়ালিদের ইসলাম গ্রহণ

তখন পর্যন্ত মুসলমানদের বিরুদ্ধে পরিচালিত প্রতিটি যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন খালিদ বিন ওয়ালিদ । উহুদ যুদ্ধে তার কৌশলী আক্রমণে কাফেররা যুদ্ধের নিয়ন্ত্রণ নিতে সক্ষম হয়েছিল। হুদাইবিয়ার সন্ধির পর নিজ থেকেই মুসলমান হওয়ার জন্য মদিনার পথে তিনি রওনা হন। মদিনায় এসে ইসলাম কবুল করেন।

বিভিন্ন রাষ্ট্রের দাওয়াতি পত্র

সন্ধির ফলে যাতায়াতের পথ নিরাপদ হয়ে যায়। তখন নবী(সাঃ) হকের বাণী পৃথিবীর সকল বাদশাহ'র কাছে পৌঁছে দিতে চাইলেন। আমর বিন উমাইয়া (রাঃ)-কে হাবসার সম্রাট আসহামার নাজ্জাশীর কাছে পাঠানো হয়। তিনি নবীজির পত্রকে দুই চোখের ওপর রাখেন এবং সিংহাসন থেকে নেমে মাটিতে বসে পড়েন। এরপর খুশি মনে ইসলাম গ্রহণ করেন । নবী (সাঃ)-র জীবদ্দশায় তার মৃত্যু হয়।

সাহাবী দিহয়া কালবি(রাঃ)-কে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের দরবারে পাঠানো হয়। অকাট্য দলিল ও পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবের সাক্ষ্য দ্বারা তার কাছে প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল যে, নবীজি সত্য রাসূল । তাই তিনি ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছা করেন। তবে তার ইচ্ছার কথা শুনে দরবারের নেতৃবৃন্দ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে । তার প্রবল ধারণা হয়, ইসলাম গ্রহণ করলে প্রজারা তাকে ক্ষমতাচ্যুত করবে । এজন্য তিনি বিরত থাকেন।

আব্দুল্লাহ বিন হুজাইফা (রাঃ)-কে ইরান সম্রাট খসরু পারভেজ - এর কাছে পাঠানো হয় । এই হতভাগা নবীজির পত্রের সাথে বেয়াদবি করে। পত্রটি ছিড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে। এই সংবাদ পেয়ে নবী (সাঃ)বলেন, আল্লাহ তা'আলা তার সাম্রাজ্যকে এভাবে খন্ড-বিখন্ড করুন, যেভাবে সে আমার পত্রকে করেছে। নবীদের সরদারের দোয়া কিভাবে বিফলে যাবে! কিছুদিনের মধ্যেই খসরু পারভেজ আপন পুত্র শেরওয়াইহের হাতে নির্মমভাবে নিহত হয়।

হাতিব দিন আবু বালতাআকে মিশর ও আলেকজান্দ্রিয়াযর শাসক মুকাওকিসের কাছে প্রেরণ করা হয়। তার অন্তরেও আল্লাহ তায়ালা ইসলামের সত্যতার বিষয়টি ঢেলে দেন। তিনি নবীজির দুতের সাথে অনেক ভালো ব্যবহার করেন। নবীজির জন্য কিছু উপঢৌকোন পাঠান।

যার মধ্যে মারিয়া কিবতিয়া নামক একজন দাসী ছিলেন এবং দুলদুল নামক একটি সাদা খচ্চর ছিল । এক বর্ণনায় আছেন উপহারের মধ্যে এক হাজার দিনার এবং ২০ জোড়া পোশাকও ছিল।
আমর বিন আস(রাঃ)-কে পাঠানো হয় ওমানের শাসকদ্বয় জাইফার ও আব্দুল্লাহ এর কাছে। ব্যক্তিগত গবেষণা ও পূর্ববর্তী কিতাবের মাধ্যমে এ দুজনও নবীজির সত্যতার ব্যাপারে বিশ্বাস হয়ে যায় এবং তারা ইসলাম গ্রহণ করেন। তখনই প্রজাদের থেকে যাকাত আদায় শুরু করেন এবং আমর বিন আসের হাতে তুলে দেন।

খাইবারের যুদ্ধ

মদিনাতে বসবাসকারী বনু নাজির গোত্র আশ্রয় নিয়েছিল খাইবারে। তখন থেকেই ইহুদীরা মুসলমানদের সাথে বিদ্বেষ দেখাতে শুরু করেন। বনু নাজিরের বিভিন্ন নেতা যেমন সালাম ইবনে আবির আল হুকাইক, কিনানা ইবনে আবির আল হুকাইক, হুয়াই ইবনে আকতাব - তারাই খাইবারের ইহুদিদেরকে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)- এর সাথে যুদ্ধ করার জন্য উসকে দেয়।

মুসলমানদের খাইবারের পথে যাত্রা

খাইবারের যুদ্ধ সংঘটিত হয় হিজরী সপ্তম বর্ষে। হুদাইবিয়া থেকে ফেরার পর মহররম মাসের শেষভাগের তারা খাইবারের দিকে যাত্রা করে। নবী (সাঃ)-র সাথে ছিল বাইয়াতে রিদওয়ানে অংশ নেয়া ১৪০০ জন সাহাবী। খাইবার ছিল এক বিশাল এলাকা জুড়ে অনেকগুলো দুর্গের সমারোহ। অনেকগুলো দুর্গ থাকার কারণে ইহুদিদের সাথে আগের যুদ্ধগুলোর তুলনায় এই যুদ্ধ জটিল ছিল। নবি(সাঃ) একে একে সকল দুর্গ জয় করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন। শুরু হলো নাঈম দুর্গ দিয়ে। যুদ্ধ শুরু হলে ইহুদিদের এক সাহসী যোদ্ধা বের হয়ে আসলো যার নাম মারহাব। তার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হল আমির ইবনে আল আকওয়া (রাঃ)। কিছুক্ষণ পর তিনি শহীদ হয়ে গেলে তার জায়গায় আসে আলী(রাঃ)। তিনি এসেই মারহাবকে হত্যা করেন। মতান্তরে মারহাবকে হত্যা করে মুহাম্মদ ইবনে মাসয়ালামাহ(রাঃ)।
১০দিনের মাথায় আলী(রাঃ)- এর নেতৃত্বে নাঈম দুর্গ জয় হয়। এভাবেই একের পর এক দুর্গ জয় করতে থাকেন। এই যুদ্ধে আলী (রাঃ) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তিনি একাই খাইবারের দুর্গের ফটক উপরে ফেলেন। সমগ্র খাইবার বিজয়ের পর ইহুদিরা সন্ধি আলোচনার জন্য নেমে আসে।

সাফিয়া (রাঃ)-এর সাথে বিয়ে

উম্মুল মুমিনীন সাফিয়া (রাঃ)-এর স্বামী ছিলেন কিনানা বিন আবুল হুকাইক, যাকে অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে হত্যা করা হয়েছিল এবং তার স্ত্রীকে বন্দী করা হয়। রাসূল (সাঃ) সাফিয়া (রাঃ)-কে ইসলামের দাওয়াত দেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করলে তাকে মুক্ত করে নবী (সাঃ) তাকে বিয়ে করেন । নবি(সাঃ)তাকে ফিরে যাওয়ার প্রস্তাবও দেন কিন্তু তিনি নবী (সাঃ)-র স্ত্রী হওয়াকেই বেশি পছন্দ করেন।

বাইয়াতুর রিদওয়ান

ইবনে ইসহাক বলেন: আবদুল্লাহ ইবনে আবু বকর (রাঃ)আমাকে জানিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ

(সাঃ) যে মুহূর্তে শুনলেন যে, উসমান (রাঃ) নিহত হয়েছেন, সে মুহুর্তেই বললেন, কুরাইশদের সাথে লড়াই না করে স্থান ত্যাগ করবো না|” তিনি মুসলমানদেরকে লড়াইয়ের জন্য প্রতিজ্ঞা করালেন| এটাই বাই’আতুর রিদওয়ান| এ বাই’আত সম্প ন্ন হয়েছিল একটি বৃক্ষের নীচে| সাধারণ মুসলমানরা বলতেন, “ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জান কুরবানী করা শপথ গ্রহণ করেছিলেন|” তবে জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলতেন যে, এটা জান কুরবানীর বাই’আত ছিল না| তবে আমরা যেন পালিয়ে না যাই সেজন্য বাই’আত গ্রহণ করা হয়েছিল|” [ইবনে হিশাম উল্লেখ করেছেন যে, আবু সিনান আল আসাদী (রাঃ) সর্বপ্রথম বাই’আত করেন|] রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সকল মুসলমানকে শপথ গ্রহণ করান| এক ব্যক্তি ছাড়া কেউ এ বাই’আত থেকে বাদ পড়েনি| বাদপড়া এই ব্যক্তির নাম জাদ্দ ইবনে কায়েস| সে ছিল বনু সালামা গোত্রের লোক| জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলতেন, ‘উটের বগলের ভিতর লুকিয়ে এই ব্যক্তি বাই’আত থেকে বাদ থাকে| তার সেই লুকানোর দৃশ্য আমার চোখে এখনো ভাসছে|” অবশেষে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নিশ্চিতভাবে জানলেন যে, উসমানের (রাঃ) নিহত হওয়ার খবর ভুল|

শান্তিচুক্তি বা হুদায়বিয়ার সন্ধি

কুরাইশগণ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-র কাছে সুহাইল ইবনে আমরকে পাঠালো| তারা তাকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-র সাথে আপোষ করার নির্দেশ দিয়ে পাঠালো| এই আপোষরফার একমাত্র লক্ষ্য হবে মুহাম্মাদ (সাঃ) যেন অবশ্যই এ বছরের মত মক্কায় প্রবেশ না করে ফিরে যায়| আরবরা যেন কখনো বলতে না পারে যে, মুহাম্মাদ (সাঃ) কুরাইশদের ওপর শক্তিপ্রয়োগ করে মক্কায় প্রবেশ করেছে|

সুহাইল ইবেন আমর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-র কাছে এলো| তাকে আসতে দেখে তিনি বললেন, “ এ লোকটিকে তখনই পাঠানো হয়েছে যখন কুরাইশরা নিশ্চয়ই সন্ধি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে|” সুহাইল এসে খুব লম্বা আলাপ জুড়ে দিল| তারপর সন্ধির ব্যাপারে উভয়পক্ষে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হলো|

সন্ধি চুক্তির সিদ্ধান্ত পাকাপাকি হয়ে লিখিত রুপ নিতে শুধু বাকী, এই সময় উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) আবু বকরের (রাঃ) নিকট ছুটে গিয়ে বললেন, “ হে আবু বকর, তিনি কি আল্লাহর রাসূল নন?” আবু বকর (রাঃ) বললেন “হ্যা|” উমার (রাঃ) বললেন, “আমরা কি

মুসলমান নই?” আবু বকর (রাঃ) বললেন, “অবশ্যই|” উমার (রাঃ) বললেন, “কুরাইশরা কি মুশরিক নয়?” আবু বকর (রাঃ) বললেন, “হ্যা|” উমার (রাঃ) আবারো বললেন, “তাহলে কিসের জন্য আমরা আমাদের দীনের ব্যাপারে এভাবে নতিস্বীকার করতে যাচ্ছি?” আবু বকর (রাঃ) বললেন “উমার, তার আনুগত্য কর| আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহর রাসূল|” উমার (রাঃ) বললেন “আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর রাসূল|”

তারপর তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-র কাছে এসে বললেন, “হে আল্লাহর রাসূল, আপনি কি আল্লাহর রাসূল নন? ” তিনি বললেন “হ্যাঁ|” উমার (রাঃ) বললেন, “ওরা কি মুশরিক নয়?” তিনি বললেন, “হ্যাঁ|” উমার (রাঃ) আবারো বললেন “তাহলে কি কারণে আমরা আমাদের দ্বীনের প্রশ্নে এই অবমাননা বরদাশত করতে যাচ্ছি?” রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, “আমি আল্লাহর বান্দা এবং রাসূল| তার নির্দেশ আমি কখনো লংঘন করবো না| আর তিনি আমাকে কখনো বিপথগামী করনে না|” পরবর্তীকালে উমার (রাঃ) বলতেন, “আমি সেদিনের সেই ভ্রান্ত আচরণের জন্য সারাজীবন সাদকা, নামায রোযা ও গোলাম আযাদ করার মাধ্যমে কাফফারা দেয়ার চেষ্টা চালিয়েছি| আমার কথাগুলোর খারাপ পরিণতি থেকে বাঁচার জন্য আমি এসব করেছি| অবশেষে আমার আশার সঞ্চার হয়েছে যে, আমি ভাল ফল পাবো|”

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আলী ইবনে আবু তালিবকে (রাঃ) ডেকে বললেন “লেখ, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম|” সুহাইল বললো, “এটা আমার অজানা কথা| তুমি বরং লেখ, বিসমিকা আল্লাহুম্মা|” (হে আল্লাহ, তোমার নামে|) অতঃপর তিনি বললেন “লেখ, আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ (সাঃ) সুহাইল ইবনে আমরের সাথে নিম্নলিখিত মর্মে সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছেন|” একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সুহাইল ইবনে আমর বলে উঠলো “আমি যদি তোমাকে আল্লাহর রাসূল বলেই মানতাম তাহলে তো তোমার সাথে যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হতাম না| শুধু তোমার নাম ও পিতার নাম লেখ|” রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, “বেশ, তাই লেখ| আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ নিম্নলিখিত মর্মে আমরের পুত্র সুহাইলের সাথে সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছেন| তারা উভয়ে একমত হয়েছে যে, দশ বছরের জন্য যুদ্ধ বন্ধ থাকবে| এই দশ বছর জনগণ পূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তা ভোগ করবে এবং পরস্প রের বিরুদ্ধে সব রকমের আক্রমণ থেকে বিরত থাকবে| কুরাইশদের কোন লোক তার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া মুহাম্মাদের নিকট এলে তিনি তাকে ফেরত পাঠাবেন| আর মুহাম্মাদের সাহাবাদের কেউ কুরাইশদের কাছে আসলে

কুরাইশরা তাকে ফেরত পাঠাবে না| আমাদের এই চুক্তি কখনো লংঘিত হবে না| উভয় পক্ষ আন্তরিকভাবে ও পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে তা মেনে চলবে| কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, কেউ গোপন পাচারের কাজে লিপ্ত হবে না| মুহাম্মাদ অথবা কুরাইশ যে কোন পক্ষের সাথে যে কেউ এ চুক্তিতে অংশগ্রহন বা নতুন চুক্তি করতে চাইলে অবাধে তা করতে পারবে|" এই ধারা ঘেষিত হওয়া মাত্র বনু খাযরা গোত্র রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-র সাথে এবং বনু বাকর কুরাইশদের সাথে তৎক্ষনাৎ মৈত্রীচুক্তি সম্পাদন করলো| সন্ধি চুক্তিতে আরো লিপিবদ্ধ করা হলো, "তুমি (মুহাম্মদ) এ বছর আমাদের শহর মক্কায় প্রবেশ না করে ফিরে যাবে| আগামী বছর আমরা তোমার জন্য মক্কার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়ে অন্যত্র চলে যাবো| তুমি অবাধে প্রবেশ করবে এবং তোমার সাথীদের নিয়ে তিনদিন মক্কায় অবস্থান করবে| কোষবদ্ধ তরবারী সঙ্গে নিতে পারবে| তরবারী ছাড়া ঢুকবার বাধ্যবাধকতা থাকবে না|"

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও সুহাইল ইবনে আমরের তত্ত্বাবধানে যখন এই সন্ধিচুক্তি লিপিবদ্ধি করা হচ্ছিল ঠিক সেই সময় সুহাইল ইবনে আমরের পুত্র আবু জানদাল শৃংখলিত অবস্থায় সেখানে এসে হাজির হলো| তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-র নিকট পালিয়ে এসেছেন| এ সময় ঐ স্থানে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-র সাহাবীগণ উপস্থিত ছিলেন না| ইতিপূর্বে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-র দেখা স্বপ্নে যে বিজয়ের ইংগিত ছিল সে ব্যাপারে তারা সংশয়বিষ্ট হয়ে পড়ছিলেন| তাই তারা সন্ধি চুক্তিতে এ বছর (উমরা ছাড়াই) ফিরে যাওয়ার ধারা সন্নিবেশিত হতে দেখে এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে তা বরদাশত করতে ও মেনে নিতে দেখে মহা বিপাকে পড়ে যান এবং প্রায় পথভ্রষ্ট হবার উপক্রম হন| ওদিকে আবু জানদালকে দেখে সুহাইল ইবনে আমর বেসামাল হয়ে তার মুখে প্রচন্ড এক চপেটাঘাত করলো এবং তার বুকের কাপড় টেনে ধরলো| সে তখন বলছিল, "হে মুহাম্মাদ, আবু জানদাল আসার আগেই তোমার ও আমার মধ্যে চুক্তি চূড়ান্ত হয়ে গেছে|" রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, "সে কথা সত্য|" অতঃপর সে আবু জানদালকে বুকের কাপড় ধরে প্রবল জোড়ে টানতে লাগলো মক্কায় ফেরত পাঠানোর জন্য| আর আবু জানদাল উচ্চস্বরে চিৎকার করে বলতে লাগলো "হে মুসলমানগণ, আমাকে ইসলাম গ্রহণ করার কারণে যারা নির্যাতন করছে সেই কুরাইশদের কাছেই কি আমাকে য়েরত পাঠানো হবে?" তার এ আর্তচিৎকারে মুসলসমানদের ক্ষোভ আরো বেড়ে গেল| রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন "হ আবু জানদাল, তুমি সবর কর এবং নিজের অবস্থার ওপর সন্তুষ্ট থাক| তুমি ও তোমার মত যেসব

অসহায় ও নির্যাতিত মুসলমান তোমার সাথে মক্কায় রয়েছে, আল্লাহ তাদের মুক্তির জন্য একটা ব্যবস্থা করে দিবেন| আমরা কুরাইশদের সাথে একটা সন্ধি ও শান্তিচুক্তি সম্প াদন করেছি| এ ব্যাপারে আল্লাহকে সাক্ষী মেনে আমরা পরস্প রকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি| আমরা তাদেরকে দেয়া এ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবো না|”

উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) আবু জানদালের কাছে ছুটে গিয়ে বললেন “হে আবু জানদাল, সবর কর| ওরাতো মুশরিক| ওদের সবার রক্ত কুকুরের রক্তের সমতুল্য|” উমার (রাঃ) একথা বলার পাশাপাশি আবু জানদালের কাছে নিজের তরবারী এগিয়ে দিচ্ছিলেন| তিনি বলেন আমি আশা করছিলাম যে, আবু জানদাল তরবারী নিয়ে তার পিতাকে হত্যা করে ফেলুক| কিন্তু সে শেষ পর্যন্ত তার পিতার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ব্যাপারটা ওখানেই থেকে যায়| দলীলটি লেখার কাজ শেষ হলে মুসলমান ও মুশরিক উভয় পক্ষের অনেকে এর সাক্ষী হলেন| সাক্ষীদের মধ্যে উলেস্নখযোগ্য ছিলেন আবু বকর সিদ্দিকী (রাঃ), উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ), আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ), আবদুল্লাহ ইবনে সুহাইল ইবনে আমর, সা’দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, মাহমুদ ইবনে মাসলাম, মিকরায ইবনে হাফস ও আলি ইবনে আবু তালিব (রাঃ)| মিকরায তখনো মুশরিক ছিল| আর আলী (রাঃ) ছিলেন দলীলের লেখক|

কুরবানীর উটগুলোকে কিভাবে কুরবানী করে ইহরাম মুক্ত হওয়া যায় সে মস্প র্কে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) চিন্তিত ছিলেন| তখনো তিনি ইহরাম অবস্থায় নামায আদায় করছিলেন| চুক্তি সই হয়ে গেলে তিনি নিজের কুরবানীর পশুটা কুরবানী করে মাথা মুন্ডন করলেন| সঙ্গে সঙ্গে সব সাহাবীও কুরবানী করে মাথা মুন্ডন করলেন| এরপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মদীনা অভিমুখে যাত্রা করলেন| মক্কা ও মদীনার মাঝখানে থাকতেই সূরা আল ফাতহ্ নাযিল হলোঃ

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ○لِّيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا○) سورة الفتح-١~ ٢(

অর্থঃ “হে নবী, আমি তোমার জন্য সুস্প ষ্ট বিজয়ের উদ্বোধন করেছি, যেন আল্লাহ তোমার আগের ও পেছনের সকল গুনাহ মাফ করে দেন তোমার ওপর তার নিয়ামত পূর্ণ করেন এবং তোমাকে নির্ভুল পথে চালিত করেন|” (সূরা আল ফাতহঃ ১~২)

আল্লাহ আরো বলেন “ আল্লাহ তাঁর রাসূলের স্বাপ্নকে সত্যে পরিণত করেছেন| তিনি স্বাপ্নে দেখেছিলেন যে, তিনি শীঘ্রই নিরাপদে ও নির্ভয়ে মক্কায় প্রবেশ করবেন| আল্লাহ ইচ্ছায় তোমরা অবশ্যই মসজিদুল হারামে নিরাপদে মাথার চুল মুন্ডিয়ে ও ছেঁটে নির্ভিকচিত্তে প্রবেশ

করবে| সে (আল্লাহ রাসূল) সেই জিনিস অবগত হয়েছে যা তোমরা অবগত হওনি| ঐ ঘটনার (হুদাইবয়ার সন্ধির) পরেই নির্ধারিত রেখেছেন আসন্ন বিজয়|”

জিরানা থেকে রাসুল (সাঃ)-র উমরা পালন

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আত্তাব ইবনে উসাইদকে সাময়িকভাবে মক্কার শাসনকর্তা নিয়োগ করেন এবং আত্তাব মুসলমানদের সাথে নিয়ে ৮ম হিজরী সনে হজ্জ পালন করেন|

ইবনে ইসহাক বলেনঃ

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জি'রানা থেকে উমরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন| মাররুয যাহরানের নিকটবর্তী মাজান্নাতে বিজয়লব্ধ অবশিষ্ট সম্প দ সংরক্ষণ করার নির্দেশ দিলেন| উমরা সমাপন করে তিনি মদীনা চলে গেলেন এবং আত্তাব ইবনে উসাইদকে (রাঃ) সাময়িকভাবে মক্কার শাসনকর্তা নিয়োগ করলেন| মুসলিম জনগণকে ইসলামের বিস্তারিত বিধান ও কুরআন শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে আত্তাবের সাথে মুয়ায ইবনে জাবালকে (রাঃ)-ও রেখে গেলেন| রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বিজয়লব্ধ অবশিষ্ট সম্প দ সাথে করে মদীনায় নিয়ে গেলেন| তিনি এই উমরা সম্প ন্ন করেন যুলকাদা মাসে| তাই তাঁর মদীনা গমন সংঘটিত হয়েছিল যুলকা'দার শেষাংশে অথবা যুল-হাজ্জের প্রথমাংশে| ইবনে ইসহাক বলেন, আরবদের প্রচলিত নিয়মেই সে বছরের হজ্জ সম্প ন্ন হয়| আত্তাব (রাঃ) মুসলমানদের সঙ্গে হজ্জ পালন করেন| [ইবনে হিশাম বলেন, যায়িদ ইবনে আসলাম থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (সাঃ) আত্তাবকে মক্কার শাসক হিসেবে নিয়োগ করার পর তাকে দৈনিক এক দিরহাম করে ভাতা দেন| তিনি একদিন মুসলমানদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন, “এক দিরহাম ভাতা পেয়েও যার তৃপ্তি হয় না আল্লাহ তাকে কখনো তৃপ্ত করবেন না| রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে দৈনিক এক দিরহাম করে ভাতা ঠিক করে দিয়েছেন| আমি এখন কারো মুখাপেক্ষী নই|”] এটা ছিল ৮ম হিজরী সন| রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-র তায়েফ ত্যাগের পর থেকে তথা যুলকা'দা মাস থেকে নিয়ে নবম হিজরী সনের রমযান পর্যন্ত তায়েফবাসী শিরক ও ইসলাম বিরোধিতায় অবিচল থাকে|

মুয়ায ইবনে জাবালকে ইয়ামানে পাঠানোর সময় রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-র উপদেশ

ইবনে ইসহাক বলেন: আবদুল্লাহ ইবনে আবু বকর (রাঃ) আমাকে জানিয়েছেন যে, তাঁর কাছে এ মর্মে বর্ণনা করা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন মুয়াযকে (রাঃ) দূত হিসেবে পাঠান, তখন কতিপয় উপদেশ দেন ও তাঁর অঙ্গীকার গ্রহণ করেন| তিনি বলেন, “সহজভাবে ইসরামের দাওয়াত পেশ করবে, কঠিনভাবে নয়| তাদের মনে আশার আলো জাগাবে,

বীতশ্রদ্ধ করে দেবে না| তাহলে কিতাবের একি গোষ্ঠির সাক্ষাত পাবে| ওরা জিজ্ঞেস করবে যে, জান্নাতের চাবিকাঠি কি? তাদের বলবে, আল্লাহ এক ও তাঁর কোন শরীক নেই-এই সাক্ষ্য প্রদানই জান্নাতের চাবি|”

মায়মুনা বিনতে হারিস (রাঃ)-র সাথে বিবাহ বন্ধন

ওমরাহ পালন করার সময় রাসূল (সাঃ)মাইমুনা বিনতে হারিস (রাঃ)-কে বিয়ে করেন। মাইমুনার স্বামী আবু রাহোম ইবনে আবুল উজ্জা মারা যাওয়ার পর তিনি বিধবা হয়ে গিয়েছিলেন । তার দায়িত্ব নেওয়ার মতো মক্কায় কেউ ছিলেন না। এই খবর জানার পর রাসূল (সাঃ) মাইমুনাকে বিয়ে করতে সম্মত হন।

মুতাহ যুদ্ধ ও মুতাহ যুদ্ধের কারণ

রাসূল (সাঃ) হারিস বিন উমাইর আযদী (রাঃ)-কে বুসরার শাসকের নিকট দাওয়াতি চিঠি দিয়ে পাঠান। রোম সম্রাটের গভর্নর সুরাহবিল ইবনে আমর গাসসানী রাসুল(সাঃ)-এর দূতকে বন্দী করার পর শক্ত করে বেঁধে হত্যা করে। ওই সময়ে সংবাদ বাহকদেরকে হত্যা করা ছিল একটি নিকৃষ্ট অপরাধ এবং যুদ্ধ ঘোষণার শামিল। রাসুল (সাঃ) যখন জানতে পারলেন যে তার পত্রবাহককে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে তখন তিনি ৩০০০ সৈন্যের একটি বাহিনী প্রস্তুত করে যুদ্ধের জন্য রওনা হলেন।

মুসলিম বাহিনীর পরামর্শ সভা

মুসলিম বাহিনী মাআন নামক জায়গায় তাঁবু খাটায়। তারা জানতে পারে যে রোমানরা এক লাখ সৈন্য নিয়ে অবস্থান করছে। সুরাহবিল বিন আমর-এর নেতৃত্বে অতিরিক্ত এক লাখ সৈন্য সমবেত হয়েছে। তারা ভাবতে লাগলো দুই লাখ সেনার সাথে মাত্র তিন হাজার সৈন্য নিয়ে তারা মোকাবেলা করবেন কিভাবে। আবদুল্লাহ বিন রাওআহা(রাঃ) সবাইকে মনে করিয়ে দেয় , তারা আল্লাহর জন্য যুদ্ধ করছে। শাহাদত বরণ করার মধ্যে তারা আরো বেশি মর্যাদাবান হবে। তার কথা শুনে সবাই সাহস পায়।

মুখোমুখি সংঘর্ষ

মুসলিম বাহিনীর সাথে শত্রুদের মুখোমুখি সংঘর্ষ শুরু হয়। এক পাশে ছিল অস্ত্রে সজ্জিত তিন হাজার মুসলিম সৈন্য আর অন্য পাশে ছিল উন্নত যুদ্ধ সরঞ্জামসহ রোমান ও মিত্র বাহিনীর দুই লাখ সেনা। জায়েদ বিন হারিসা সর্বপ্রথম যুদ্ধের পতাকা ধারণ করেন এবং অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করেন। এক পর্যায়ে তিনি শহীদ হয়ে যান। তারপর সেনাপতির দায়িত্ব নেন জাফর বিন আবি তালিব। তিনি যুদ্ধ শুরু করেন। একপর্যায়ে তার ডান হাত কাটা পড়ে। তিনি তার বাঁ হাত দিয়ে পতাকা তুলে ধরেন। এরপর তার বাঁ হাতও কাটা পড়ে। অবশিষ্ট উভয় হাতের অংশ দিয়ে পতাকা বুকে জড়িয়ে ধরে রাখেন। একপর্যায়ে তিনি শহীদ হয়ে যান । এরপর আব্দুল্লাহ বিন রাওআহা(রাঃ) পতাকা উঠিয়ে নিয়ে যুদ্ধ শুরু

করেন। এবং তিনিও শহীদ হয়ে যান। তিনজন সেনাপতি শহীদ হয়ে যাওয়ার পর সাহাবীগণ খালিদ বিন ওয়ালিদকে সেনাপতি নির্বাচন করেন। তিনি এই যুদ্ধে নয়টি তলোয়ার ভেঙে ছিলেন এবং ইয়েমেনের তৈরি ছোট্ট একটি তলোয়ার তার কাছে অবশিষ্ট ছিল। খালিদ বিন ওয়ালিদের মাধ্যমে ইসলামের ইতিহাসে এই যুদ্ধ স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। তারা ধীরে ধীরে পিছিয়ে মদিনাতে ফিরে আসে। এই যুদ্ধে সরাসরি নবী(সাঃ) অংশ নেননি , কিন্তু এই যুদ্ধ এত বিশাল এবং এত বেশি ভয়াবহ ছিল যে একে গাজওয়া বলে অবহিত করা হয়।

মক্কা বিজয়

অভিযানের কারণ

হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তির অন্যতম শর্ত ছিল, কেউ যদি চায় তবে মুসলিমদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হতে পারবে, আবার কেউ চাইলেই কুরাইশদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হতে পারবে। এবং এই বিষয়ে সকল গোত্রের স্বাধীনতা ছিল। এই শর্তে খুযাআ গোত্র মুসলিমদের সাথে এবং বনু বকর গোত্র কুরাইশদের সাথে মিত্রতা করে। কিন্তু জাহেলী যুগ থেকেই তাদের মাঝে চলে আসা শত্রুতার কারণে বনু বকর একপর্যায়ে এই চুক্তি লঙ্ঘন করে ফেলে। অষ্টম হিজরির শাবান মাসে বনু বকরের নওফেল ইবনে মুয়াবিয়া নামের এক ব্যক্তি কিছু মানুষ নিয়ে রাতের অন্ধকারে বনু খুযাআ গোত্রের উপর আক্রমণ করে বসে। খুযাআ গোত্রের লোকেরা মক্কায় পৌঁছে বুদাইল বিন ওয়ারাকা খুযায়ী এবং নিজেদের মুক্ত করা দাস রাফির ঘরে আশ্রয় নেয়। আমর বিন সালিম সেখান থেকে বের হয়ে মদিনার দিকে রওনা দেন এবং রাসুল (সাঃ)-র কাছে এসে তাকে সবকিছু জানান।

কুরাইশদের আতঙ্ক:-কুরাইশরা চুক্তি ভঙ্গ করায় তাদের মধ্যে এই ভয় কাজ করে যে, মুসলমানরা যদি শুনতে পায় তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছেন, এর ফলাফল ভালো হবে না। সর্বসম্মতিক্রমে তারা তাদের অঙ্গীকার নবায়ন করার জন্য আবু সুফিয়ানকে মদিনায় পাঠান। তিনি মদিনায় এসে তার কন্যা উম্মে হাবিবার ঘরে পৌঁছান। তাকে দেখে তার কন্যা বিছানা উঠিয়ে ফেলেন এবং তাকে বলেন আপনি অপবিত্র। আর এটি রাসুল(সাঃ)-র বিছানা। তাই অপবিত্র কেউ এখানে বসতে পারবে না। অতঃপর আবু সুফিয়ান রাসুল(সাঃ)-র নিকট যায় এবং বিভিন্ন কথা বলেন। নবি(সাঃ) কোন কথার উত্তর দেন না। সাহাবীদের সাথে কথা বলে তিনি বুঝতে পারেন, তাদের আর কোন উপায় নেই। কোনোভাবেই এই অঙ্গীকার নতুন করে বলবৎ করা হবে না।

মক্কা অভিযানের প্রস্তুতি

নবি(সাঃ) অঙ্গীকার ভঙ্গের তিন দিন আগেই আয়েশা(রাঃ)-কে সফরের জন্য যাবতীয় প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আবু সুফিয়ান ফিরে যাওয়ার পর রাসূল (সাঃ) সবাইকে প্রস্তুত হতে নির্দেশ দেন। এরপর অত্যন্ত গোপনে অষ্টম হিজরীর রমজান মাসের প্রথম ভাগে আবু

কাতাদাহের নেতৃত্বে ৮ জন মুজাহিদ নিয়ে গঠিত ছোট্ট একটি বাহিনী মদিনা থেকে ৩৬ মাইল দূরে বা তুমি ইজাম নামক স্থানে প্রেরণ করেন। সাধারণ মানুষকে বুঝতে না দেয়ার জন্য এই ব্যবস্থা নেয়া হয় । পরবর্তীতে তারা রাসূল (সাঃ)-র কাছে মক্কার দিকে রওনা হয়।

এদিকে হাতিব বিনআবি বালতায়া(রাঃ) কুরাইশদের নিকট চিঠি লিখে পাঠালেন, নবী(সাঃ)-র মক্কা আক্রমণের খবর। তিনি এক মহিলার খোপার মধ্যে করে সেই চিঠি পাঠানোর ব্যবস্থা করেন । আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় রাসূল(সাঃ)-কে এই খবর জানিয়ে দেন। হযরত আলী (রাঃ) জুবায়ের(রাঃ) মিকদাত(রাঃ) এবং আবু মারসাদ(রাঃ)-কে সেই চিঠি উদ্ধার করতে পাঠান।

মক্কার দিকে রাসুল(সাঃ) ও তার সেনাগণ

অষ্টম হিজরির ১০ই রমজান রাসূল (সাঃ) তার বাহিনী নিয়ে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করেন। বাহিনীতে ছিল ১০০০০ সাহাবী। মদিনার প্রশাসনিক দায়িত্ব আবুল রূহম কুলসুম ইবনুল হুসাইন আল গিফারী (রাঃ)-এর উপর দিয়ে যান। পথিমধ্যে নবীজির চাচা আব্বাস (রাঃ) ও তার পরিবারের সাথে দেখা হয়। তারা ছিল সর্বশেষ মুহাজির।

রাসূল (সাঃ) সফর অব্যাহত রাখেন এই সফরকালে রাসুল (সাঃ)-র এবং সাহাবীগণ রোজাদার অবস্থায় ছিলেন । আসফান এবং কুদাইদ নামক জলাশয়ের নিকট পৌঁছে রাসূল (সাঃ) এবং সাহাবীগণ রোজা ভঙ্গ করেন। এরপর আবার সফর অব্যাহত রাখেন । এভাবে একসময় তারা মাররুয যাহরান উপত্যকায় পৌঁছে শিবির স্থাপন করেন। সেখানে নবী (সাঃ)-র নির্দেশক্রমে লোকেরা পৃথক পৃথক আগুন জ্বালান। এভাবে ১০০০০ স্থানে আগুন জ্বালানো হয়। রাসূল (সাঃ) হযরত ওমর(রাঃ)-কে পাহারার কাজে নিযুক্ত করেন। এর মধ্যে আব্বাস(রাঃ) আবু সুফিয়ানকে নবী (সাঃ)-র কাছে নিয়ে আসেন। আবু সুফিয়ান বুঝতে পারে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। এবং নবী (সাঃ)-র ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

মক্কায় প্রবেশের সময় মুহাজির এবং আনসারদের দ্বারা বেষ্টিত নবী(সাঃ)- কে দেখে আবু সুফিয়ান অবাক হয়ে যান। এই জাঁকজপূর্ণ অবস্থা দেখে তিনি বলতে থাকেন , এদের সাথে পারবে এমন কেউ নেই । আব্বাস (রাঃ) তাকে বলেন, এটাই নবুওয়াত। পদাতিক সৈন্যদের নেতৃত্বে ছিলেন আবু উবাইদা । নবি(সাঃ) তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তিনি যেন বাতনে ওয়াদির প্রান্তসীমা ধরে অগ্রসর হয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন। এরপর বিভিন্ন বাহিনী তাদের নির্ধারিত স্থানে চলে গেল। খালিদ বিন ওয়ালিদের পথে যে সব কাফির এসেছিল তাদের সকলকে হত্যা করা হলো। খালিদের বন্ধু কুরয ইবনে জাবির এবং খুনাইস বিন খালিদ বিন রাবিয়া(রাঃ) এ সময় শাহাদত বরণ করেন। এর কারণ ছিল এই দুইজন সেনাবাহিনী থেকে বিক্ষিপ্ত হয়ে অবস্থান করছিলেন সেই অবস্থায় তাদের হত্যা করা হয়। খান্দামায় পৌঁছানোর পর খালিদ এবং তার সঙ্গীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয় । এতে ১২ জন নিহত হয় এরপর তারা

পালিয়ে যায়। হাম্মাস বিন কাইস মুসলিমদের সাথে যুদ্ধের জন্য অস্ত্র ঠিক করে রেখেছিল। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গিয়ে নিজ গৃহে প্রবেশ করলো এবং তার স্ত্রীকে বলল, "দরজা বন্ধ করে দাও।" তার স্ত্রী কথাটি শুনে বলল ,"আপনার সেই বাগাড়ম্বর গেল কোথায়?" সে বলল ,"হায়রে তুমি যদি খান্দামার যুদ্ধের অবস্থা দেখতে তবে এমন কথা বলতে না। তোমাকে কি আর বলবো, সাফওয়ান আর ইকরিমা ছুটে পালালো। নাঙ্গা তলোয়ার দিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা করা হলো। সেই তলোয়ার গলা এবং মাথা এমন ভাবে কাটছিল যে নিহতিদের হৃদয়বিদারক চিৎকার এবং হৈহল্লা ছাড়া কিছুই শোনা যাচ্ছিল না।'

মক্কা বিজয় ও নবী (সাঃ)-র হারামে প্রবেশ

রাসূল (সাঃ) তার সামনে ও পেছনে এবং ডানে ও বামে আনসার ও মুহাজির সাহাবীদের পরিবেষ্টিত অবস্থায় অত্যন্ত জাঁকজমক অথচ বিনয়ের সাথে মসজিদুল হারামে আগমন করলেন। দিনটি ছিল অষ্টম হিজরির ২০ রমজান। মসজিদুল হারামে আগমনের পর সর্বপ্রথম তিনি হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করলেন এবং আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করলেন। তাওয়াফের সময় হাজরে আসওয়াদ অতিক্রমকালে সর্বদা তিনি তার লাঠি/ ছড়ি দিয়ে হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করছিলেন। ওই সময় রাসূলের হাতে একটি ধনুক ছিল । আল্লাহর ঘরের আশেপাশে ও ছাদের উপরে ৩৬০ টি মূর্তি ছিল। রাসুল (সাঃ) মূর্তিগুলোকে আঘাত করছিলেন। রাসূলের আঘাতে মূর্তিগুলো ভেঙ্গে পড়ছিল। আঘাত করতে করতে তিনি বলছিলেন সত্য এসেছে , বাতিল বিলুপ্ত হয়েছে । নিশ্চয়ই বাতিল বিলুপ্ত হবেই ।(সূরা ইসরা ,১৭:৮১)

কাবাঘরের ভিতরে রাসুল (সাঃ)-র সালাত আদায় এবং কুরাইশদের উদ্দেশ্যে ভাষণ:-

রাসূল(সাঃ) ভিতর থেকে কাবা ঘরের দরজা বন্ধ করে দেন । উসামা ও বিলাল ভিতরেই ছিলেন। তিনি দরজার সামনের দেয়ালের অভিমুখী হন এবং দেয়াল থেকে মাত্র তিন হাত দূরত্বে থেমে যান। এই অবস্থায় রাসুল (সাঃ)-র বাম পাশে দুটি স্তম্ভ, ডান পাশে একটি এবং পিছনে তিনটি স্তম্ভ ছিল। ওই সময়ে কাবা ঘরে ছিল ছয়টি খাম্বা বা খুঁটি ।এরপর সেখানে তিনি সালাত আদায় করেন। সালাত আদায় শেষে আল্লাহর ঘরের ভিতরের অংশ তিনি ঘুরেফিরে দেখতে থাকেন এবং তাওহীদের আয়াতগুলো তিলাওয়াত করতে থাকেন । এরপর পুনরায় কাবা ঘরের দরজা খুলে দেন। রাসূল (সাঃ) কি করছেন তা দেখার জন্য বিশাল সংখ্যাক কুরাইশ কাবাঘরের সামনে কাতার বন্দী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই সময়ে দুহাতে দরজার দুই পাল্লা ধরে নিম্নভাগে দন্ডায়মান কুরাইশদের সম্বন্ধে রাসূল (সাঃ) তার ঐতিহাসিক ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন:-

"আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনি তার অঙ্গীকার পূরণ করে দেখিয়েছেন । তার বান্দাদের সাহায্য করেছেন এবং তিনি এককভাবে সমস্ত দলকে পরাজিত করেছেন। শুনে রাখ, আল্লাহর ঘরের চাবি সংরক্ষণ এবং হাজীদের পানি পান করানোর সম্মান ছাড়া সমস্ত সম্মান অথবা পূর্ণতা অথবা রক্ত প্রবাহিত করা আমার এই দুই পদতলে রইল। ভুলবশত

হত্যা, যা লাঠি দ্বারা করা হয়ে থাকে, তা ইচ্ছাকৃত হত্যা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবে এবং তার জন্য রক্তপাতের খেসারত দিতে হবে অর্থাৎ একশত উট যার মধ্যে ৪০টি হতে হবে গর্ভবতী। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের থেকে জাহেলিয়াতের যুগের অহংকার এবং পূর্ব পুরুষদের গৌরব খতম করে দিয়েছেন। সমস্ত মানুষ আদম (আঃ)-র সন্তান এবং তিনি ছিলেন মাটির তৈরি। সালাতের সময় হলে তিনি বিলাল(রাঃ)-কে আযান দেয়ার নির্দেশ দেন। বিলাল(রাঃ) কাবার ছাদে উঠে আযান দেয়া শুরু করেন । পুরুষ ও নারীরা নবী (সাঃ)-র কাছে বাইয়াত গ্রহণ করেন। রাসূল (সাঃ)মদিনায় ফিরে আসেন।

হুনাইনের যুদ্ধ

মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। আরবেরা দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে চলে আসে। অবশিষ্ট আরবদের ইসলামের বিরোধিতা করার কোন সাহস ছিল না। তবে হাওয়াযিন এবং ,সাকিফ গোত্র অহংকারবশত যুদ্ধের উদ্দেশ্যে মক্কার দিকে রওনা দেয়। নবি(সাঃ)-র কানে এই খবর আসামাত্র তিনি ১২০০০ সৈন্যের সমাবেশ ঘটান যাদের মধ্যে ১০০০০ছিল মদিনা থেকে আগত আর ২০০০ ছিল নওমুসলিম। মুসলমানদের সবচেয়ে বড় বাহিনী ছিল এটা। অষ্টম হিজরীর ৬ই শাওয়াল এই বাহিনী রওনা দেয়। হুনাইন নামক পর্বতে শত্রুরা পাহাড়ের ঘাঁটিতে লুকিয়ে ছিল। মুসলমানরা সেখানে পৌঁছানো মাত্র তারা আক্রমণ শুরু করে। অতর্কিত হামলায় মুসলিম বাহিনী পিছাতে শুরু করে। এই ঘটনার ইঙ্গিত কুরআনের ছিল। সংখ্যাধিক্য ও সাজ সরঞ্জামের কারণে তাদের মধ্যে অহমিকা চলে আসে, যা আল্লাহ সুবহানাতায়ালার পছন্দ হয়নি। এবং এই পরিস্থিতি তৈরি করেন যাতে তারা বুঝতে পারে জয় পরাজয় সৈন্য বা যুদ্ধের উপর নির্ভরশীল নয়। রবের উপর তাওয়াক্কুল তাদেরকে সফল করবে। সেনাদের পিছিয়ে পড়তে দেখে নবী(সাঃ)-র আদেশে আব্বাস (রাঃ) উচ্চস্বরে দৃঢ় থাকার আহ্বান জানায় এবং পুনরায় যুদ্ধ করার আদেশ দেন।

এক মুঠো মাটির মুজাযা

নবি(সাঃ) জমিন থেকে এক মুঠো মাটি নিয়ে শত্রুপক্ষের দিকে নিক্ষেপ করেন। আল্লাহর কুদরতে এই মাটি প্রত্যেকের চোখে পৌঁছে যায় এবং তারা পরাজিত হয়ে ভয়ে পালিয়ে যায়।

তাবুক যুদ্ধ

নবম হিজরির মধ্যভাগে রাসূল (সাঃ) মদিনায় অবস্থান করেন। এ সময় তিনি সংবাদ পান মুতার যুদ্ধে পরাজিত রোমানরা তাবুকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। ফলে নবী(সাঃ) জিহাদের প্রস্তুতি নিতে আরম্ভ করেন। তখন দুর্ভিক্ষের কারণে মুসলমানরা অত্যন্ত নিঃস্ব ও দরিদ্র অবস্থায় ছিলেন। তাছাড়া ওই সময় ছিল তীব্র গরম । এরপরও ইসলামের জন্য প্রাণ উৎসর্গকারী সাহাবীরা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকেন। যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের জন্য চাঁদা তোলা হয়। আবু বকর(রাঃ) তার বাড়ির সমস্ত জিনিস এনে দেন। উসমান(রাঃ) বিপুল পরিমাণ অনুদান দেন, যার মধ্যে ছিল ৯০০ উট ও ১০০ ঘোড়া। রজব মাসের ৩ তারিখ

বৃহস্পতিবার ৩০ হাজার সাহাবীর বাহিনী নিয়ে নবি(সাঃ) তাবুকের উদ্দেশ্যে রওনা হন। মুসলিম বাহিনী তাবুকে পৌঁছে দেখে সেখানে কেউ নেই । সকলে ময়দান ছেড়ে চলে গিয়েছেন। খালিদ বিন ওয়ালিদকে নবী(সাঃ) খ্রিস্টান নেতা উকাইদিরের কাছে পাঠান এবং ভবিষ্যৎ বাণী হিসেবে বলে দেন, তুমি রাতের বেলা তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে যখন সে শিকারে ব্যস্ত থাকবে। খালিদ বিন ওয়ালিদ(রাঃ) সেখানে গিয়ে তাকে ঐ অবস্থাতেই পায় এবং তাকে ধরে নবী (সাঃ)-র কাছে নিয়ে আসে। মুসলিম বাহিনী সেখানে প্রায় ১৫ থেকে ২০ দিন অপেক্ষা করে, কিন্তু কেউ আসে না । রমজান মাসে তারা মদিনায় ফিরে আসে।

মসজিদে যিরারে অগ্নিসংযোগ

মদিনায় ফিরে আসার পর নবি(সাঃ) ওই স্থান আগুনে পুড়িয়ে দেওয়ার আদেশ দেন, যেখানে বসে মুনাফিকরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে পরামর্শ করতো। মুসলমানদের ধোঁকা দিতে তারা এর নাম দিয়েছিল মসজিদ। বোঝা গেল মসজিদে যিরার মুলত মসজিদ ছিল না।

প্রতিনিধি দলের আগমন এবং দলে দলে ইসলাম গ্রহণ:-

হুদায়বিয়ার সন্ধির পর যখন রাস্তা নিরাপদ হয়ে যায়, তখন বিস্তৃত আকারে ইসলাম প্রচার-প্রসার লাভ করে। এরপরও কিছু লোক কুরাইশদের ভয়ে ইসলাম গ্রহণ করতে পারছিল না। মক্কা বিজয়ের পর এই সমস্যাও কেটে যায়। তখন তারা ইসলামের ছায়ায় চলে আসে।

প্রতিনিধি দলসমূহ:-

১. সাকিফ গোত্রের প্রতিনিধি দল

২. বনু ফাজারার প্রতিনিধি দল

৩. বনু তামিমের প্রতিনিধি দল

৪. বনু সাদ বিন বকরের প্রতিনিধি দল

৫. কিন্দার প্রতিনিধি দল

৬ বনু আব্দে কায়েসের দল

৭.বনু হানিফার প্রতিনিধি দল

এরকম আরো বহু প্রতিনিধি দল নিয়মিত আসতে থাকে, যার সংখ্যা ৭০ টির মত।

বিদায় হজ্জ

অতঃপর যুলকা'দা মাস শুরু হলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হাজ্জের জন্য প্রস্তত হলেন এবং মুসলমানদের প্রস্তুত হতে নির্দেশ দিলেন| যুলকা'দা মাসের পাঁচ দিন অবশিষ্ট থাকতে তিনি হজ্জ উপলক্ষে রওন হলেন| হজ্জের প্রক্কালে তিনি জনগণকে হজ্জের নিয়মকানুন শিক্ষা দিলেন| তারপর তিনি সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন| আল্লাহর প্রশংসার পর তিনি বললেন,

"হে জনগণ, আমার কথা শোন| আমি সম্ভবতঃ এই স্থানে এ বছরের পর আর কখনো তোমাদের সাথে মিলিত হতে পরবো না| হে জনতা, আজকের দিনে ও এই মাসে যেমন অন্যের জ্ঞান মালের ক্ষতি সাধন তোমাদের ওপর হারাম তেমনি কিয়ামত পর্যন্ত তা হারাম হয়ে গেল| তোমরা শীঘ্রই আল্লাহর কাছে হাযির হবে এবং নিজেদের কৃতকর্মের জন্য তোমাদের জবাবদিহি করতে হবে| তোমাদের কাছে (আল্লাহর বানী) পৌছিয়ে দেয়ার দায়িত্ব আমি পালন করেছি| যার কাছে কারো গচ্ছিত জিনিস রয়েছে সে যেন মালিকের কাছে তা ফেরত দেয়| সকল সুদ রহিত করা হলো| [সব রকমের ঋণ, খুন ও জখমের প্রতিশোধ রহিত করা হয়|] তোমরা শুধু মূলধন পাবে| তোমরা কারো ওপর যুলুম করবে না, যুলুমের শিকারও হবে না| আল্লাহর চূড়ান্ত ফায়সালা যে, কোন সুদ চলবে না| আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের সমস্ত সুদ রহিত করা হলো| জাহিলী যুগে সংঘটিত সকল খুন জখমের শাস্তি বা প্রতিশোধ গ্রহণ রহিত করা হলো| সর্বপ্রথম আমি হারিস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের পৌত্র ইবনে রাবীয়ার হত্যার শাস্তি বা প্রতিশোধ রহিত করছি| ইবনে রাবীয়া বনু লাইস গোত্রে দুগ্ধপোষ্য ছিল| বনু হুযাইল তাকে হত্যা করে| সেই হত্যাকান্ড দিয়েই আমি জাহিলী যুগের সকল হত্যাকান্ড ক্ষমা করার কাজ শুরু করছি|

অতঃপর হে জনতা, তোমাদের এই ভূখন্ডে শয়তানের আর কখনো পূজা অর্চণা প্রাপ্তির সম্ভাবনা নেই| সে এ ব্যাপারে নিরাশ হয়েছে| তবে তোমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজে যাকে তোমরা তুচ্ছ ও নগণ্য মনে করে থাক, শয়তানের আনুগত্য করলে তাতেই সে খুশী হবে| অতএব তোমদের দ্বীনের ব্যাপারে শয়তান সম্প র্কে সাবধান থেকো|

হে জনগণ, নিষিদ্ধ মাসগুলোকে পরবর্তী বছরের জন্য মুলতবী রাখা আরো জঘন্য কুফরী কর্ম| কাফিররা এই প্রথা দ্বারা গুমরাহীর পথে চালিত হয়| এর মাধ্যমে তারা রক্তপাতকে এক বছর বৈধ আর এক বছর অবৈধ করে নেয| এভাবে তারা আল্লাহর নিষিদ্ধ দিনগুলোকে ফাঁকি

দেয়ার চক্রান্ত করে| এভাবে কার্যতঃ তারা আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজকে বৈধ এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে বৈধ কাজকে অবৈধ করে নেয়| আকাশ ও পৃথিবীর প্রথম সৃষ্টিলগ্ন থেকেই সময় তার নিজস্ব নিয়মে গড়িয়ে চলেছে| আল্লাহর কাছে মাস হলো বারোটা| তার মধ্যে চারটা হলো নিষিদ্ধ| তিনটা মাস এক নাগড়ে আর একটা মুদার গোত্রের রজব মাস|

সে মাসটা শা'বান ও জামাদিউস সানীর মাঝখানে অবস্থিত| [রজব মাসকে 'মুদার গোত্রের রজব' বলার তাৎপর্য এই যে, এই মাসটাকে মুদার গোত্রই গুরুত্ব দিত| আরবের কোন গোত্র এ মাস নিষিদ্ধ মাস হিসেবে আমল দিত না|]

তোমাদের নারীদের প্রতি তোমাদের কিছু কর্তব্য এবং অধিকার রয়েছে| নারীরা তোমাদের বিছানায় অন্য কাউকে শোয়বে না| এবং নিষিদ্ধ ঘোষিত অশ্লীল কর্মকান্ডে লিপ্ত হবে না- এটা তাদের কর্তব্য| কেননা এটা তোমাদের ঘৃণার উদ্রেক করে থাকে| আর তা যদি করেই বসে তবে তাদের থেকে আলাদা বিছানায় শোয়া এবং মৃদু প্রহার করার অধিকার আল্লাহ তোমাদেরকে দিয়েছেন| তবে যদি পরিশুদ্ধ হয় তাহলে তাদের স্বাভাবিকভাবে খাদ্য ও পোশাক-পরিচ্ছদ দেয়া তোমাদের কর্তব্য| নারীদের প্রতি শুভকামী থাক| কেননা তারা তোমাদের কাছে অক্ষম বন্দীস্বরূপ| আল্লাহর আমানত হিসেবে তাদেরকে গ্রহণ করেছো| আল্লাহর বিধান অনুসারেই তোমরা তাদেরকে বৈধ করে নিয়েছো|

হে মানব সকল, তোমরা আমার কথা হৃদয়ঙ্গম কর| আল্লাহর বাণী মানুষের কাছে পৌছে দেয়ার কাজ আমি সম্প ন্ন করেছি| আর তোমাদের কাছে এমন জিনিস রেখে যাচ্ছি যা দৃঢ়ভাবে ধারণ করলে তোমরা কখনো বিপথগামী হবে না| প্রকাশ্য সুস্প ষ্ট জিনিস আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহ| হে জনগণ- আমার কথা শোনো ও হৃদয়ঙ্গম কর| জেনে রাখ, প্রত্যেক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই| মুসলমানরা ভাই ভাই| কাজেই নিজের ভাইয়ের কোন জিনিস তার খুশী মনে দান করা ছাড়া নেয়া অবৈধ| তোমরা লোকদের ওপর যুলুম করো না| হে আল্লাহ, আমি কি তোমার দ্বীন মানুষের কাছে পৌছিয়ে দিয়েছি?"

লোকেরা বললো, "হে আল্লাহ, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের কাছে তোমার দ্বীন পৌছিয়ে দিয়েছেন|" তিনি বললেন, "হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক|"

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর রোগ সংক্রান্ত অবশিষ্ট বিবরণ

ইবনে ইসহাক বলেনঃ

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-র স্ত্রী আয়িশা (রাঃ) থেকে উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উতবাহ, তাঁর থেকে মুহাম্মাদ ইবনে মুসলিম যুহরী এবং তাঁর থেকে ইয়াকুব ইবনে উতবা আমাকে জানিয়েছেন যে, আয়িশা (রাঃ) বলেছেন, "(অন্যান্য স্ত্রীদের কাছ থেকে আমার ঘরে পরিচর্যার জন্য অবস্থানের অনুমতি লাভের পর) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজ পরিবারভূক্ত দুই ব্যাক্তি ফযল ইবলে আব্বাস (রাঃ) ও অন্য একজনের কাঁধে ভর করে মাথায় পট্টি বাঁধা অবস্থায় পা টেনে হাঁটতে হাঁটতে আমার ঘরে প্রবেশ করলেন| আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের মতে অপর ব্যক্তিটি ছিলেন আলী ইবনে আবু তালিব (রাঃ)|

কিছুক্ষণের মধ্যেই রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-র যন্ত্রণা বেড়ে গেল এবং তিনি কাতর হয়ে বললেন, "বিভিন্ন কুয়া থেকে সাত মশক পানি এনে আমার মাথায় ঢাল যাতে আমি জনগণের কাছে গিয়ে অঙ্গীকার আদায় করে আসতে পারি|" আমরা তাঁকে হাফসা বিনতে (রাঃ) একটি বড় কাপড় ধোয় পাত্রের কাছে বসিয়ে তার মাথায় প্রচুর পরিমাণে পানি ঢাললাম| অবশেষে তিনি বললেন, "যথেষ্ট হয়েছে| যথেষ্ট হয়েছে|"

যুহরী বলেন: আইয়ুব ইবনে বাশীর আমাকে জানিয়েছেন যে, মাথায় ব্যন্ডেজ বাঁধা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বেরিয়ে এসে মসজিদের মিম্বারে বসলেন| অতঃপর তিনি মুখ খুলেই সর্বপ্রথম উহুদ যুদ্ধের শহীদদের জন্য রহমত কামনা করলেন ও তাঁদের জন্য ক্ষমা চাইলেন| তাঁদের জন্য রহমত কামনা করে তিনি অনেক দোয়া করলেন| অতঃপর বললেন, "এক বান্দাকে আল্লাহ দুনিয়ার সম্প দ ও আল্লাহর নিকট যে নিয়ামত রয়েছে তার মধ্যে যে কোন একটি বেছে নিতে বললেন| সেই বান্দা আল্লাহর কাছে যে নিয়ামত রয়েছে তা-ই বেছে নিল|" এ কথার মর্ম উপলব্ধি করেছিলেন আবু বকর সিদ্দিকী (রাঃ)| তিনি বুঝেছিলেন যে, এই বান্দা খোদ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ছাড়া আর কেউ নন| তাই তিনি কাঁদতে কাঁদতে বললেন, "আমাদের নিজেদেরকে আর আমাদের সন্তান সন্ততিকে বরং আপনার জানের বদলায় কুরবানী করে দিই|" রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, "হে আবু বকর একে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ কর|" অতঃপর বললেন, "মসজিদের এই উন্মুক্ত দরজাগুলো বন্ধ করে দাও| তবে আবু বকরের ঘরের সাথে সংলগ্ন দরাজা বন্ধ করো না| কেননা আমার সহচর্যে যত লোক এসেছে তার মধ্যে আবু বকরকেই আমি সর্বাধিক নির্ভযোগ্য সহযোগী পেয়েছি|"

আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ আমাকে জানিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এই সাথে একথাও বলেছিলেন, "আল্লাহর বান্দাদের ভেতর থেকে কাউকে যদি আমি নিজের অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহন করতাম তাহলে আবু বকরকে গ্রহণ করতাম| কিন্তু যদ্দিন আমরা আল্লাহর কাছে সম্মিলিত না হই ততদিন শুধু সাহচর্য, ভ্রাতৃত্ব ও ঈমানই আমাদের পারস্প রিক বন্ধনের যোগসূত্র হয়ে থাকবে|"

উরওয়া ইবনে যুবাইর প্রমুখ বিজ্ঞ ব্যক্তির সূত্র উল্লেখ করে আমাকে মুহাম্মাদ ইবনে যুবাইর জানিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর রোগাবস্থায় থাকা সত্ত্বেও উসামা (রাঃ) বাহিনী প্রেরণে বিলম্ব হওয়ায় অস্থিরতা প্রকাশ করেন| ওদিকে কেউ কেউ প্রবীণ মুহাজির ও আনসারগণ থাকতে অল্পবয়স্ক তরুণ উসামা (রাঃ) অধিনায়ক মনোনীত হওয়ায় মৃদু আপত্তি প্রকাশ করছিলেন| একথা জেনে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আবার মাথায় ব্যন্ডেজ বাঁধা অবস্থায় মিম্বারে এসে বসলেন|

আল্লাহর যথোচিত প্রশংসা করার পর বললেন, "হে জনগন, উসামার বাহিনী তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দাও| তার অধিনায়কত্ব নিয়ে যদি তোমাদের মধ্যে কথা উঠে থাকে তবে এ ধরনের কথা তোমরা তার পিতার অধিনায়কত্ব নিয়েও তুলেছিলে| অথচ প্রকৃত ব্যাপার এই যে, উসামা এ কাজের যোগ্য আর তাঁর পিতাও এ কাজের যোগ্য ছিল|" এরপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মিম্বার থেকে নেমে এলেন| মুসলমানগণ উসামার বাহিনী প্রেরণের আয়োজন করতে লাগলেন| সঙ্গে সঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-র রোগযন্ত্রণাও প্রবল হতে লাগলো| উসামা (রাঃ) বাহিনী নিয়ে যখন মদীনা থেকে এক ফারসাখ দূরে অবস্থিত নিম্নভূমিতে পৌছেছেন, সেখানে তাঁর সেনাবাহিনীও পৌছেছে এবং অন্যান্য মুসলমানগণও তাঁর সাথে গিয়ে মিলিত হয়েছে, ঠিক তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-র অবস্থা কি দাঁড়ায় দেখার জন্য অপেক্ষা করছিল| যুহরী বলেন: আবদুল্লাহ ইবনে কা'ব ইবনে মালিক আমাকে জানিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সেদিন তাঁর ভাষণে উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের জন্য দোয়া এবং মুসলমানদের করণীয় সম্প র্কে যা কিছু বলেছিলেন তার সাথে এ কথাও বলেছিলেন, "হে মুহাজিরগণ, তোমরা আনাসারদের দিকে ভালভাবে লক্ষ্য রেখ| অন্যান্য লোকদের তো ক্রমেই আর্থিক সচ্ছলতা এসে থাকে| কিন্তু আনসারদের বর্তমান অবস্থার আলোকে সে অবকাশ নেই| তারা আমার গোপনীয়তার সংরক্ষক ও আশ্রয়দাতা ছিল| সুতরাং ভাল ব্যবহারের বদলায় তাদের সাথে ভাল ব্যবহার

করবে| আর তাদের থেকে কোন মন্দ ব্যবহার পেলে মাফ করে দিও|”

তারপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মিম্বার থেকে নেমে বাড়ীর মধ্যে প্রবশে করলেন| সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রোগযন্ত্রণা বৃদ্ধি পেল| কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললেন| এই সময় উম্মে সালামা (রাঃ) ও মাইমুনা (রাঃ) সহ তাঁর কতিপয় স্ত্রী এবং আসমা বিনতে উমাইস (রাঃ) সহ মুসলমানদের কতিপয় স্ত্রীলোক তাঁর কাছে জমায়েত হলেন| তাঁর কাছে তাঁর চাচা আব্বাস (রাঃ) আগেই উপস্থিত ছিলেন|

সবাই রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে ‘লাদুদ’ নমাক ওষুধ খাওয়ানোর সিদ্ধান্ত নিল| আর আব্বাস (রাঃ) বললেন, “আমি তাঁকে অবশ্যই ‘লাদুদ’ খাওয়াবো|” শেষ পর্যন্ত তাঁকে লাদুদ খাওয়ানো হলো এবং তিনি সংজ্ঞা ফিরে পেলেন| সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, “আমাকে এ জিনিস কে খাইয়েছে?” সবাই বললো, “ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার চাচা খাইয়েছেন|” তিনি বললেন, “এটা হাবশার দিক থেকে আগত কিছু সংখ্যক মহিলার আনীত এক ধরনের ওষুধ| তোমরা কেন এটা প্রয়োগ করলে?” আব্বাস (রাঃ) বললেন, “ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমরা আশংকা করেছিলাম যে, আপনি ফুসফুস প্রদাহে আক্রান্ত হয়েছেন|” রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, “ঐ রোগে আল্লাহ আমাকে কখনো আক্রান্ত করবেন না| আমার পরিবার-পরিজনের মধ্যে আমার চাচা ছাড়া আর কেউ এই ‘লাদুদ’ থেকে অব্যাহতি পাবে না|” মাইমুনা (রাঃ) কে রোযা অবস্থায় লাদুদ সেবন করতে হয়েছিল| এভাবে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর পরিবার-পরিজনকে ঐ ভুল কর্মের জন্য শাস্তি দোবর ব্যবস্থা করেছিলেন|

উসামা ইবনে যায়িদ (রাঃ) বলেছেন: রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-র অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়লে আমি এবং আমার সহগামী বাহিনী ও মুসলমানগণ মদীনায় ফিরে গেলাম এবং পরে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে দেখতে গেলাম| গিয়ে দেখি, তিনি বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন| কথা বলতে পারছেন না| আমাকে দেখে, তিনি আকাশের দিকে হাত তুলতে লাগলেন এবং হাত নামিয়ে আমার গায়ে রাখতে লাগলেন| এতে বুঝলাম যে, তিনি আমার জন্য দোয় করছেন|

আয়িশা (রাঃ) বলেনঃ

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-র শেষ মুহুর্তে উপস্থিত হলে তাঁর শেষ যে কথাটা উচ্চারিত হতে শুনেছি তা

ছিল এই: “বরং জান্নাতের চেয়েও শ্রেষ্ঠ যে বন্ধু, তাঁকে আমি চাই|” আমি তা শুনে মনে মনে বললাম: তিনি আমাদেরকে অগ্রাধিকার দেন না| এই সময় আমি বুঝতে পারলাম তিনি যে বলতেন “কোন নবীকে জীবন ও মৃত্যুর ইখতিয়ার না দিয়ে মৃত্যু দেয়া হয়নি”-তার মনোনীত সেই প্রয়তম বস্তুই তাঁর এই উক্তিতে বিঘোষিত হয়েছে-“বরং জান্নাতের চেয়েও শ্রেষ্ঠ যে বন্ধু তাঁকে আমি চাই|”

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-র কাফন দাফন

ইবনে ইসহাক বলেন: আবু বকরের (রাঃ) বাইয়াত সুসম্প ন্ন হওয়ার পর মঙ্গলবার দিন জনগণ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দাফনের আয়োজন করলো|

আবদুল্লাহ ইবনে আবু বকর ও হুসাইন ইবনে আবদুল্লাহ প্রমুখ আমাকে বলেছেন, আলী ইবনে আবু তালিব, আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব, ফযল ইবনে আব্বাস, কুসাম ইবনে আব্বাস, উসামা ইবনে যায়িদ ও রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-র মুক্ত গোলাম শাকরান (রাঃ) তাঁকে গোসল দেয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত হলেন| বনু খাযরাজ গোত্রের বনু আওফ পরিবারের আওস ইবনে খাওলী (রাঃ) আলী ইবনে আবু তালিবকে (রাঃ) বললেন, “হে আলী, আল্লাহর দোহাই| রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-র কাফন-দাফনে আমাদের অংশ নিতে দেয়ার ব্যবস্থা করুন|” আওস (রাঃ) বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাব ছিলেন| আরী (রাঃ) বললেন, “এসো|” তিনি এসে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-র গোসলে অংশগ্রহণ করলেন| আলী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে নিজের বুকের সাথে হেলান দিয়ে ধরে রাখলেন| আর আব্বাস, ফযল ও কুসাম (রাঃ) তাঁকে আলীর (রাঃ) সাথে সাথে প্রয়োজন মত ঘুরাতে লাগলেন| উসামা ইবনে যায়িত ও শাকরান (রাঃ) তাঁর ওপর পানি ঢালতে লাগলেন আর আলী (রাঃ) নিজের বুকের ওপর হেলান দিয়ে তাঁকে ধোয়াতে লাগলেন| রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-র জামা গায়েই ছিল| সেই জামার ওপর দিয়েই মৃদুভাবে কচলিয়ে ধুয়ে দিতে লাগলেন আলী (রাঃ)| সরাসরি গায়ের চামড়ায় হাত লাগাননি| ধোয়ার সময় আলী (রাঃ) বলছিলেন, “আমার মাতাপিতা আপনার ওপর কুরবান হোক| জীবিত বা মৃত উভয় অবস্থাতেই আপনার গায়ে কত সুগন্ধ|” গোসলের সময় অন্যান্য মৃতের দেহ থেকে যেসব নাপাক বস্তু বের হয় রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-র দেহ থেকে তার কিছুই বের হয়নি|

আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত: গোসলের আয়োজন করতে গিয়ে গোসলের দায়িত্বে নিয়োজিত

লোকেরা মতবিরোধের শিকার হলেন| প্রশ্ন ছিল এই যে, অন্যান্য মৃতের মত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-র কাপড় খুলে ফেলে গোসল দেয়া হবে, না কাপড় গায়ে রেখেই গোসল দেয়া হবে| এই মতভেদ চলাকালে সহসা আল্লাহ তাদের ওপর ঘুম চাপিয়ে দিলেন| ঘুমের কারণে সকলেরই মুখ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-র বুকের ওপর এসে পড়লো| সেই অবস্থায় ঘরের একপাশ থেকে এক অচেনা ব্যক্তি তাদেরকে বললো, “নবী (সাঃ)-কে কাপড় গায়ে রেখেই গোসল দাও|” অতঃপর জামা গায়ে রেখেই রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে গোসল দেয়া হলো এবং কাপড়ের ওপর দিয়েই গা কচলানো হলো|

ইবনে ইসহাক বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-র গোসল সম্প ন্ন হলে তিনটি কাপড় দিয়ে কাফন পরানো হলো, দুইখানা সুহারী এবং একখানা ইয়ামনী চাদর যা কয়েক ভাঁজ দিয়ে পরানো হলো|

ইবনে আব্বাস (রাঃ): যখন কবর খননের প্রস্তুতি শুরু হলো তখন জানা গেল যে, আবু উবাইদা ইবনুল জারারাহ (রাঃ) মাক্কাবাসীদের মত ‘দারীহ’ কবর খননে পারদর্শী, আর আবু তালহা মদীনা ‘লাহাদ’ কবর খননে পটু| আব্বাস (রাঃ) দু’জনাকেই ডেকে পাঠালেন| বললেন, “ইয়া আল্লাহ, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-র জন্য যেটা ভাল হয় তার ব্যবস্থা করে দাও|” শেষ পর্যন্ত আবু তালহাকেই পাওয়া গেল এবং তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-ও জন্য লাহাদ কবর খনন করে দিলেন|

মঙ্গলবার রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে কাফন ও গোসল দিয়ে তাঁর বাড়ীতে তাঁর খাটে শুইয়ে রাখা হলো| এরপর দাফন নিয়ে সাহাবীদের মধ্যে আবার মাতান্তর ঘটলো| কেউ বললেন, “মসজিদে নববীতে দাফন করবো|” কেউ বললেন, “অন্যান্য সাহাবীদের কবরের পার্শ্বে দাফন করবো|” আবু বকর (রাঃ) মীমাংসা করে দিলেন এই বলে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে আমি বলতে শুনেছি যে, প্রত্যেক নবীকে তার ইনতিকালের জায়গাতে দাফন করা হয়েছে|

তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যে বিছানার শুয়ে ইনতিকাল করেছিলেন তা তুলে ফেলে তার নীচেই কবর খনন করে হলো| লোকজন দলে দলে এসে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-র জানাযা পড়তে লাগলো| পুরুষদের পড়া শেষ হলে মহিলার পড়লেন| তারপরে শিশু কিশোররা| অতঃপর বুধবারের মধ্যরাতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে দাফন করা হলো|

আয়িশা (রাঃ) বলেন: বুধবারের মধ্যরাতে কোদাল মারার শব্দ শুনেই আমরা জানতে পেরেছিলাম যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে দাফন করা হচ্ছে|

ইবনে ইসহাক বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে শোয়ানের জন্য কবরে নেমেছিলেন আলী, ফযল, কুসাম ও শাকরান (রাঃ)|

আওস ইবনে খাওলী এবারও আলীর (রাঃ) নিকট রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে কবরস্থ করার কাজে আনসারদের অংশ দেয়ার দাবী জানালে আলী (রাঃ) তাঁকে কবরে নামতে বললেন এবং তিনি সকলের সাথে নেমে ঐ কাজে অংশ নিলেন|

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যে কম্বলটি ব্যবহার করতেন শাকরান (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে কবরে শোয়ানের সময় সেটিও তাঁর সাথেই দাফন করে দিয়েছিলেন| সেই সময় তিনি বলেন, "আপনার পরে এ কম্বল আর কাউকে ব্যবহার করতে দেয়া হবে না|"

মুগীরা ইবনে শু'বা (রাঃ) দাবী করতেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সর্বশেষ সাহচর্য লাভ করেছেন| কেননা তিনি তাঁর আংটিটি ইচ্ছা করে কবরে ফেলে রেখে উঠে আসেন| তারপর আংটি পড়ে গেছে এই অজুহাত দিয়ে সবার শেষে কবরে নেমে আংটি তুলে আনেন এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সর্বশেষে স্প র্শ করেন| এভাবে তিনি সর্বশেষ সাহচর্যের দাবীদার হন|

আবদুল্লাহ ইবনে হারিসের (রাঃ) মুক্ত গোলাম মুকাসসাম আবুল কাসিম (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, উমার (রাঃ) কিংবা উসমানের (রাঃ) খিলাফতকালে আমি আলীর (রাঃ) সাথে উমরাহ করি| তিনি তাঁর বোন উম্মে হানীর বাড়ীতে থাকেন| উমরাহ শেষে যখন গোসল সম্প ন্ন করলেন তখন ইরাক থেকে একদল মুসলমান তাঁর সাথে এসে দেখা করেন| তাঁরা জিজ্ঞেস করেন যে, মুগীরা ইবনে শু'বার এ দাবী সত্য কিনা যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-র সর্বশেষ সাহচর্য লাভ করেছেণ| আলী (রাঃ) বললেন, "সর্বশেষ সাহচর্য লাভ করেছেন কুসাম ইবনে আব্বাস (রাঃ)|"

উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উতবা (রাঃ) জানান যে, আয়িশা (রাঃ) তাঁকে বলেছেন: রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-র রোগ বৃদ্ধির সময় তাঁর গায়ে একটি চতুস্কোণ কালো কম্বল ছিল| সেটা দিয়ে তিনি একবার মুখ ঢাকছিলেন আর একবার খুলছিলেন| আর বলছিলেন, "সেই জাতির ওপর আলস্নাহর অভিশাপ যারা নবীর কবরকে সিজদার জায়গায় পরিণত করে|" এ কথা বলে তিনি নিজের উম্মাতকে সাবধান করে দিচ্ছিলেন|

আয়িশা (রাঃ) বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-র সর্বশেষ অছীয়ত ছিল এই, “আরব উপদ্বীপে যেন ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দীন না থাকে৷”

ইবনে ইসহাক বলেন:

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-র ইন্তিকালের অব্যবহিত পর মুসলমানদেরকে ভয়াবহ দুর্যোগ ঘিরে ধরে৷ আয়িশা (রাঃ) জানান যে, এই সময় আরবরা মুরতাদ হতে আরম্ভ করে, ইহুদী ও খৃস্টানরা মাথা তুলতে আরম্ভ করে এবং মুনাফেকী ব্যাপক আকার ধারণ করে৷ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে হারানোর দরুন মুসলমানদের অবস্থা হয়ে দাঁড়ায় শীতের রাতে বর্ষণসিক্ত মেষ পালের মত৷ আবু বকরের (রাঃ) নেতৃত্বে সংগঠিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এই অবস্থা অব্যাহত থাকে৷ ইবনে হিশাম বলেন: আবু উবাইদা প্রমুখ বিজ্ঞ লোকেরা আমাকে জানিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-র ইন্তিকালের সঙ্গে সঙ্গে অধিকাংশ মক্কাবাসী ইসলাম ত্যাগ করার মনোভাব গ্রহণ করে৷ তা দেখে মক্কার তৎকালীন শাসনকর্তা আত্তাব ইবনে উসাইদ (রাঃ) ভয়ে আত্মগোপন করেন৷ এরপর সুহাইল ইবনে আমের (রাঃ) মক্কাবীদেরকে সমবেত করে ভাষণ দেন৷ তিনি আল্লাহর প্রশংসা করার পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-র ইন্তিকালের কথা জানিয়ে বলেন, “তাঁর ইন্তিকালে ইসলাম আরো শক্তিশালী হয়েছে৷ যে ব্যক্তি সংশয় ও বিভ্রান্তি ছড়াবে আমরা তার শিরচ্ছেদ করবো৷”

তথ্যসূত্র

1. আর রাহীকুল মাখতুম - আলস্নামা সফিউর রহমান মুবারকপুরী (রহ.)
2. সীরাতে ইবনে হিশাম - মুলঃ ইবনে হিশাম (অনুবাদ- আকরাম ফারুক)
3. https://icsbook.info
4. https://hadithbd.com
5. chatgpt 3.5